টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ

পিএইচ. ডি. গবেষক

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং: ১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জসীম উদ্দিন
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০২০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ

পিএইচ. ডি. গবেষক

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং: ১, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জসীম উদ্দিন
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০২০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি আমার পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে উল্লিখিত ও স্বীকৃত হয়েছে। আমি এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করিনি।

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং : ১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

তারিখ : মার্চ, ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ দাউদ খাঁন কর্তৃক উপস্থাপিত "টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের একক মৌলিক গবেষণার ফল। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং এর মৌলিকত্ব বিচার করে অভিসন্দর্ভটিকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তারিখ : মার্চ, ২০২০

অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন
তত্ত্বাবধায়ক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা ও মরহুম শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি

আমার স্ত্রী শামীমা নাসরিন

আমার পরম কন্যাদ্বয় দাহেকা আঞ্জুম হানি, দাহেকা ইফাত হাবীবা ও পুত্র খাঁন মোহাম্মদ আয়ান আব্দুল্লাহ

এবং

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন

তাঁদের অশেষ স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা আমার জীবন চলার পাথেয়

মুখবন্ধ

দর্শনের ছাত্র ও অনুরাগী সকলেই জানেন যে, এ বিষয়ের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এ সকল শাখার মধ্যে অন্যতম হলো নীতিবিদ্যা। কালের বিবর্তনে নীতিবিদ্যারও অনেক ব্যাপ্তি ঘটেছে। এ সকল ব্যাপ্তির অন্যতম প্রকাশ হলো ফলিত নীতিবিদ্যা। ফলিত নীতিবিদ্যার অনেক শাখা রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যবসায় নীতিবিদ্যা। ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আচরণের কারণে যে সকল নৈতিক সংকট সৃষ্টি করে তা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যবসায়ে নৈতিকতার ভূমিকা কেন প্রয়োজন অথবা ব্যবসায় ও নৈতিকতার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি নেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময় অবগত হই এবং সম্প্রতি উক্ত বিষয়ের কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ায় এই সম্পর্কে আমি আকৃষ্ট হই। এ বিষয়ের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনিই প্রথম আমার গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন এবং "টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ" নামক অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্বাচন করে দেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তার ব্যাপকতা এবং সৃজনশীল জ্ঞানের কারণেই ব্যবসায় নীতিবিদ্যার ন্যায় একটি বহুশাস্ত্রীয় বিষয় যা দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, জননীতি ইত্যাদির বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করতে চাই যে, অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন-এর সার্বিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এরূপ একটি মৌলিক ও জটিল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। শুধু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নয়, সকল প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি সরবরাহ করে আমার এই কাজটিকে তরান্বিত করে একটি সমন্বিতরূপ প্রদানের জন্য আমি তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আমি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনায় এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজটি শুরু করি, যার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের এই অভিসন্দর্ভটি। তাঁর সুচিন্তিত মতামত, সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও সহযোগিতা, আন্তরিকতা ভাষায় প্রকাশের ঊর্ধ্বে এবং তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত থেকে আমাকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন তা আমার গবেষণাকর্মকে আরো সমৃদ্ধ করতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে। আমার গবেষণা কর্মকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য যিনি পুস্তক-পুস্তিকা দিয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. এম মতিউর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান। আমি মুক্ত ও উদারচিত্তে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা-ম্যাগাজিন ও বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেট লিংক ব্যবহার করেছি। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়া আমি হৃষ্টচিত্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুবর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলামের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ অভিসন্দর্ভটির গঠন ও রচনাশৈলী শ্রীবৃদ্ধিতে তিনি মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এছাড়াও আমার অনুজ হওয়া সত্ত্বেও যারা তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে আমার গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন আমার ভাগ্নে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরী, দর্শন বিভাগের সম্মানিত সহকর্মী জনাব আহম্মদ উল্লাহ্, জনাব কাজী এ, এস, এম, নুরুল হুদা, জনাব বেল্লাল আহমেদ ভূঞা ও জনাব খন্দকার তোফায়েল আহমেদ। উক্ত ব্যক্তিবর্গ আমাকে যে মানসিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা আমার গবেষণাকর্মকে আরো গতিশীল করেছে। তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমার সহধর্মনী মিসেস শামীমা নাসরিনের অবদান ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই অভিসন্দর্ভ রচনার সময় তাঁর সার্বিক সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এটি রচনায় সফলকাম হওয়া সম্ভব হতো না। আমার দুই কন্যা দাহেকা আঞ্জুম হানি নুহা, দাহেকা ইফাত হাবীবা ও আমার পুত্র খাঁন মোহাম্মদ আয়ান আব্দুল্লাহ আমাকে সবসময় প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত রেখেছে যা আমার গবেষণাকর্মটিকে দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এরা সকলেই আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে।

পরিশেষে দর্শন বিভাগের সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা শ্রী পানু গোপাল পাল একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে দেয়ার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ দাউদ খাঁন

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০
তারিখ : মার্চ, ২০২০
email: daud94@du.ac.bd

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা--১-৪

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড: একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ------------------------৫-৩৯

১.১ ভূমিকা--৫

১.২ নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা--৬

১.৩ বিভিন্ন প্রকার নৈতিক মানদণ্ড---৯

১.৩.১ আপেক্ষিকতাবাদ---১০

১.৩.২ আত্মস্বার্থবাদ---১৩

১.৩.৩ উপযোগবাদ---১৬

১.৩.৪ অধিকার--২৩

১.৩.৪.১ নেতিবাচক অধিকার---২৫

১.৩.৪.২ ইতিবাচক অধিকার---২৬

১.৩.৪.৩ চুক্তিভিত্তিক অধিকার---২৬

১.৩.৪.৪ নৈতিক অধিকার---২৭

১.৩.৫ কান্টের নীতিতত্ত্ব---২৮

১.৩.৫.১ সত্য জানার অধিকার---২৯

১.৩.৫.২ গোপনীয়তার অধিকার---৩০

১.৩.৫.৩ হতাহত না হওয়ার অধিকার-------------------------------------৩০

১.৩.৫.৪ পূর্বে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ের উপর অধিকার----------------------------৩১

১.৩.৬ ন্যায়পরতা---৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয়ের জন্যই লাভজনক--------------৪০-৯৯

২.১ ভূমিকা--৪০

২.২ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-----------------------------৪১

২.২.১ ১৯৫০-এর দশকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা--------------------------------৪১

২.২.২ ১৯৬০-এর দশকে মানবকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা---৪২

২.২.৩ ১৯৭০-এর দশকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার দ্রুতবর্ধনশীলতা---------৪৩

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৪ ১৯৮০-এর দশকে অংশিজন তত্ত্ব ও ব্যবসায়িক নীতি হিসেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা----৪৭

২.২.৫ ১৯৯০-এর দশকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলন------৪৯

২.২.৬ একবিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে গবেষণা---------------৪৯

২.৩ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে সিএসআর--৫২

২.৪ সিএসআর-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য---৫৩

২.৪.১ সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের উদাহরণ----------------------------------৫৬

২.৪.২ কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা--৫৯

২.৪.৩ কর্পোরেট নাগরিকত্ব--৫৯

২.৪.৪ কর্পোরেট গভর্নেন্স--৬০

২.৫ কর্পোরেশনের মূল বৈশিষ্ট্য---৬১

২.৬ সিএসআর-এর আদর্শনিষ্ঠ ধারণা---৬২

২.৭ সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ---------------------------------৬৪

২.৭.১ সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে যুক্তিসমূহ--৬৪

২.৭.১.১ ব্যবসায় সম্পর্কে পরিবর্তিত জনপ্রত্যাশা----------------------------------৬৪

২.৭.১.২ সিএসআর সম্পর্কে নৈতিক যুক্তি---৬৫

২.৭.১.৩ সরকারি নিয়ন্ত্রণ পরিহার ---৬৭

২.৭.১.৪ সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শ---৬৮

২.৭.১.৫ ব্যবসায়ের জন্য উন্নত পরিবেশ---৬৮

২.৭.১.৬ ক্ষমতার সাথে দায়বদ্ধতার ভারসাম্যতা----------------------------------৬৯

২.৭.১.৭ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য সামাজিক সচেতনতা--------------------৭০

২.৭.১.৮ জনসাধারণের নিকট ভাবমূর্তি --৭১

২.৭.১.৯ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের প্রতুলতা ------------------------------৭২

২.৭.১.১০ সমস্যাকে মুনাফায় রূপান্তর ---৭২

২.৭.১.১১ বাজারের ন্যূনতম নৈতিক দায়বদ্ধতা ---------------------------------৭২

২.৭.১.১২ সমাজের নাগরিক হিসেবে সিএসআর ---------------------------------৭৩

২.৭.১.১৩ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম-------------------------------------৭৩

২.৭.২ সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ--৭৪

২.৭.২.১ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন--৭৪

২.৭.২.১.১ অদৃশ্য হাত---৭৫

২.৭.২.১.১.১ নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি-----------------------৭৬

২.৭.২.১.১.২ পজিটিভ এক্সটার্নালিটি-----------------------৭৭

২.৭.২.২ সিএসআর যথার্থ নয়---৭৮

২.৭.২.২.১ সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যান------------------------৭৯

২.৭.২.২.২ সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যানের মত প্রত্যাখান---------৮২

২.৭.২.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে সমাজের ব্যয়------------------------------৮৫

২.৭.২.৪ বৃহৎ পরিসরে সহযোগিতার অভাব-----------------------------------৮৬

২.৭.২.৫ সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি---৮৬

২.৭.২.৬ সামাজিক সম্পৃক্ততায় ব্যবসায়িক ব্যয়---------------------------------৮৭

২.৭.২.৭ ব্যবসায়ের প্রাথমিক লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা--------------------------------৮৭

২.৭.২.৮ ব্যবসায় সংগঠনগুলোর ক্ষমতা ভোগ-----------------------------------৮৭

২.৭.২.৯ ক্ষমতার আর্ন্তজাতিক ভারসাম্যের দুর্বলতা-------------------------------৮৮

২.৭.২.১০ জবাবদিহিতার অভাব---৮৮

২.৮ ব্যবসায়ের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক---৮৯

২.৮.১ শেয়ারমালিকানা তত্ত্ব---৯০

২.৮.২ অংশিজন তত্ত্ব---৯০

২.৮.২.১ বিভিন্ন প্রকার অংশিজন--৯২

২.৮.২.১.১ বাজার অংশিজন--৯২

২.৮.২.১.২ বাজারবহির্ভূত অংশিজন-----------------------------------৯৩

২.৮.২.১.৩ অভ্যন্তরীণ অংশিজন---------------------------------------৯৩

২.৮.২.১.৪ বহিস্থ অংশিজন---৯৪

২.৮.২.১.৫ মুখ্য ও গৌণ অংশিজন-----------------------------------৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মচারী ও নিয়োগকারীর অধিকার ও কর্তব্য: পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক--------------১০০-১৫১

৩.১ ভূমিকা--১০০

৩.২ অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক---১০১

৩.৩ কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার অধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-----------------------------১০৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ কর্মচারীর অধিকারের নৈতিক ভিত্তি--১১১

৩.৫ কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব -----------------------------১১৩

৩.৫.১. কর্মচারীর অধিকার---১১৪

৩.৫.১.১ কাজের অধিকার--১১৪

৩.৫.১.২ যথার্থ কাজ পাওয়ার অধিকার---১১৫

৩.৫.১.৩ ন্যায্য মজুরি---১১৬

৩.৫.১.৪ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশের অধিকার-----------------------১১৮

৩.৫.১.৫ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ---১২২

৩.৫.১.৬ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত চাকুরিচ্যুত না হওয়ার অধিকার--------------১২৩

৩.৫.১.৭ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসৃত হওয়ার অধিকার-----------------------------১২৩

৩.৫.১.৮ সমান সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকার---------------------------------১২৪

৩.৫.১.৯ গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার---১২৫

৩.৫.১.৯.১ প্রযুক্তি এবং কর্মচারীর গোপনীয়তা----------------------১২৬

৩.৫.১.৯.২ পলিগ্রাফ এবং মানসিক পরীক্ষা-------------------------১২৭

৩.৫.১.৯.৩ কর্মক্ষেত্রে নজরদারি-----------------------------------১২৭

৩.৫.১.৯.৪ কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার---------------------------১২৮

৩.৫.১.৯.৫ মাদকাসক্তি পরীক্ষা এবং গোপনীয়তার অধিকার----------১২৯

৩.৫.১.১০ হয়রানির শিকার না হওয়ার অধিকার --------------------------------১৩০

৩.৫.১.১১ জেনেটিক বৈষম্য ---১৩১

৩.৫.১.১২ শ্রমিক সংগঠিত হওয়া এবং ইউনিয়ন করার অধিকার-----------------১৩২

৩.৫.১.১৩ প্রকল্প বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অধিকার----------------------১৩৪

৩.৫.১.১৪ ছুটি পাওয়ার অধিকার---১৩৫

৩.৫.২ নিয়োগকর্তার অধিকার--১৩৭

৩.৫.২.১ নিয়োগকর্তার প্রতি কর্মচারীর দায়বদ্ধতা------------------------------১৩৮

৩.৫.২.২ ব্যবসায়ের গোপনীয়তা--১৩৯

৩.৫.২.৩ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য--১৪০

৩.৫.২.৪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব---১৪২

৩.৫.২.৪.১ বস্তুনিষ্ঠ এবং আত্মবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব-------------------১৪৩

৩.৫.২.৪.২ সম্ভাব্য এবং প্রকৃত স্বার্থের দ্বন্দ্ব-----------------------১৪৩

৩.৫.২.৫ চুরি এবং কম্পিউটার--১৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

হুইসল্ ব্লোয়িং: পেশাগত দায়িত্ব ও অধিকার---------------------------------------১৫২-১৯১

৪.১ ভূমিকা--১৫২

৪.২ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি---১৫২

৪.৩ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বৈশিষ্ট্য---১৫৬

৪.৪ হুইসল্ ব্লোয়ার--১৫৮

৪.৫ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের উপায়সমূহ---১৬০

৪.৫.১ অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িং---১৬০

৪.৫.২ বহিঃস্থ হুইসল্ ব্লোয়িং---১৬১

৪.৫.৩ পরিচয় প্রকাশপূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং---১৬১

৪.৫.৪ পরিচয় প্রকাশহীন হুইসল্ ব্লোয়িং--১৬১

৪.৫.৫ আংশিক প্রকাশ এবং আংশিক গোপন পূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং---------------------১৬২

৪.৫.৬ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক হুইসল্ ব্লোয়িং---------------------------------১৬২

৪.৫.৭ প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে হুইসল্ ব্লোয়িং------------------------------১৬২

৪.৫.৮ ব্যক্তিগত হুইসল্ ব্লোয়িং---১৬৩

৪.৫.৯ সরকারি হুইসল্ ব্লোয়িং--১৬৩

৪.৬ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের শর্তসমূহ---১৬৪

৪.৬.১ তথ্য প্রকাশে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে-------------------------------------১৬৪

৪.৬.২ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে---১৬৫

৪.৬.৩ পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণ থাকতে হবে--১৬৬

৪.৬.৪ যেকোন অনৈতিক কাজ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের আওতাভুক্ত নয়----------------------১৬৭

৪.৬.৫ হুইসল্ ব্লোয়িং একটি নৈতিক দায়িত্ব যা সম্পাদন করা অপরিহার্য-----------------১৬৮

৪.৬.৬ সম্ভাব্য পরিণতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে-------------------------------------১৬৮

৪.৭ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত-----------------------------১৬৯

৪.৮ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ন্যায্যতা---১৭২

৪.৮.১ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি--১৭২

৪.৮.১.১ অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির পক্ষে যুক্তি--------------------------১৭৩
৪.৮.২ হুইসল্ ব্লোয়িং সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি--------------------------------------১৭৫
৪.৮.২.১ অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি-------------------------১৭৫
৪.৮.২.২ হুইসল্ ব্লোয়িং সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণ---------------------------১৭৭
৪.৯ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন কি?--১৮১
৪.৯.১ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা আইনের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ---------------------------১৮১
৪.৯.২ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা আইনের পক্ষে যুক্তিসমূহ-----------------------------১৮২
৪.১০ বিশ্বজুড়ে হুইসল্ ব্লোয়ারদের জন্য বিদ্যমান আইনি সুরক্ষা-------------------------------১৮৪
৪.১১ হুইসল্ ব্লোয়ারদের কখন সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়-------------------------------------১৮৫
পঞ্চম অধ্যায়
চাকুরি বৈষম্য ও প্রতিকার--১৯২-২৪৪
৫.১ ভূমিকা--১৯২
৫.২ চাকুরি বৈষম্য---১৯২
৫.২.১ অসম আচরণ--১৯৪
৫.২.২ প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারকদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত---------------------------------১৯৫
৫.২.৩ পূর্ব ধারণা প্রসূত---১৯৫
৫.২.৪ লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য---১৯৬
৫.২.৫ ধর্মভিত্তিক বৈষম্য--১৯৬
৫.২.৬ জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্য--১৯৭
৫.২.৭ বয়স বৈষম্য---১৯৭
৫.২.৮ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য---১৯৭
৫.৩ আন্তর্জাতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে বৈষম্য--১৯৯
৫.৩.১ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকৃত বৈষম্য---১৯৯
৫.৩.২ ব্যক্তিগত অনিচ্ছাকৃত বৈষম্য--২০০
৫.৩.৩ ইচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য---২০০
৫.৩.৪ অনিচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য---২০১
৫.৪ বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিধি---২০২
৫.৫ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি---২১২

৫.৫.১ উপযোগবাদী যুক্তি---২১৩

৫.৫.২ অধিকার বিষয়ক যুক্তি---২১৪

৫.৫.৩ ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি---২১৫

৫.৬ চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য অনুশীলন---২১৮

৫.৬.১ যৌন হয়রানি---২১৮

৫.৬.২ পদোন্নতির ক্ষেত্রে--২২১

৫.৬.৩ প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে---২২১

৫.৬.৪ চাকুরিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে--২২২

৫.৬.৫ জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে--২২২

৫.৬.৬ চাকুরি সংক্রান্ত শর্তের ক্ষেত্রে---২২৩

৫.৬.৭ বর্ণ ও লিঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য গোষ্ঠির ক্ষেত্রে বৈষম্য---------------------------২২৩

৫.৭ ইতিবাচক পদক্ষেপ---২২৫

৫.৮ ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ-------------------------------------২৩১

৫.৮.১ ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তিসমূহ--২৩১

৫.৮.১.১ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপ-------------------------------------২৩১

৫.৮.১.২ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ইতিবাচক কর্মসূচী-২৩৩

৫.৮.২ ইতিবাচক পদক্ষেপের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ---২৩৮

৫.৯ ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন--২৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন: একটি ব্যবহারিক বিশ্লেষণ----------------------------------২৪৫-২৮৩

৬.১ ভূমিকা---২৪৫

৬.২ টেকসই ধারণার যৌক্তিক ভিত্তি---২৪৫

৬.৩ টেকসই ধারণার নৈতিক ভিত্তি---২৪৮

৬.৪ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি---------------------------------------২৪৯

৬.৪.১ টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা--২৫০

৬.৪.২ টেকসই উন্নয়ন---২৫১

৬.৪.৩ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন--২৫৫

৬.৫ টেকসই ব্যবসায় অনুশীলন এবং কৌশল বাস্তবায়ন ------------------------------------২৫৯

৬.৫.১ উদ্যোগ ভাবনা--২৫৯
৬.৫.২ কৌশল ভাবনা ও ব্যবসায় সমন্বয়--২৫৯
৬.৫.৩ স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব---২৬০
৬.৫.৪ নতুনত্বের মাধ্যমে পরিবর্তন---২৬১
৬.৫.৫ পণ্যের উৎপাদন মূল্য হ্রাস--২৬১
৬.৫.৬ জনসংযোগ--২৬১
৬.৫.৭ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তুষ্টি---২৬২
৬.৫.৮ ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি---২৬২
৬.৬ ত্রি ভিত্তি রেখা--২৬৩
৬.৬.১ পরিবেশ এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত---------------২৬৪
৬.৬.১.১ জনসংখ্যা ও ভোগ--২৬৬
৬.৬.১.২ জলবায়ু পরিবর্তন--২৬৭
৬.৬.১.৩ খনিজ সম্পদ নিঃশেষকরণ--২৬৯
৬.৬.১.৪ জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি---২৭০
৬.৬.১.৫ মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য নিধন---২৭১
৬.৬.১.৬ মরুকরণ ও পরিবেশ---২৭২
৬.৬.২ অর্থনীতি এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত----------------২৭৪
৬.৬.৩ সমাজ এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত------------------২৭৭
৬.৭ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি---------------------------------২৮০

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ২৮৪-৩০০

গ্রন্থপঞ্জি ৩০১-৩১১

ভূমিকা

আমরা সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভূতপূর্ব নাটকীয় পরিবর্তনে আমরা অভিভূত হই। এই অভূতপূর্ব নাটকীয় পরিবর্তন সমাজের যে সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো অর্থনীতি যা সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ অনেকাংশে পরিচালিত হয়ে থাকে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে ব্যবসায়ের উপর। তাই ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এসব আচরণ নিয়ে ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। বিষয়টিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও দেখানো যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল সেটির পেছনে বিশেষ ভূমিকা ছিল বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, গ্লোবাল ক্রসিং, এনরন, আলডেলফিয়া, ওয়ার্ল্ডকম, টাইকো, ক্রেডিট সুইস ফার্স্ট বস্টন, মার্শ এণ্ড ম্যাকক্লিনেন ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশের শেয়ার বাজার সহ বিভিন্ন ব্যাংকিং খাতে যে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের অসাধু কর্মকাণ্ডকেই অনেকাংশে দায়ী করা হয়। এসকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ ছাড়াও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয় যার মধ্যে বিসমিল্লাহ গ্রুপ, যুবক, হলমার্ক, বিডি ফুডস, ডেসটিনি ২০০০ প্রভৃতি অন্যতম। এসকল উদাহরণ এটাই ইঙ্গিত করে যে, অনৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেটি কোনভাবেই কাম্য নয়। আলোচনার ধারাবহিকতায় আমি বলতে পারি যে, অনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় কখনো দীর্ঘস্থায়ী ও লাভজনক হয় না বরং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জশ, খ্যাতি ও অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। তাই ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত এসকল সমস্যাবলী মূল্যায়ন ও সমাধানের জন্য ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা অপরিহার্য। অন্যভাবে বলা যায় ব্যবসায়ের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমি এ অভিসন্দর্ভে এটিই দেখানোর চেষ্টা করবো যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যার পরিপালন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকলের জন্যই কল্যাণকর ও অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই এ অভিসন্দর্ভে ভূমিকা

ও উপসংহার ব্যতীত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হবে এবং টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতা অনুশীলনের অপরিহার্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

- প্রথম অধ্যায়ে ব্যবসায় নীতিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড যেমন আপেক্ষিকতাবাদ, আত্মস্বার্থবাদ, উপযোগবাদ, কান্টের নীতিতত্ত্ব, অধিকার তত্ত্ব, ন্যায়পরতার ধারণা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হবে। প্রচলিত এসব মানদণ্ড ব্যবসায়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও সব মানদণ্ডই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং কতিপয় মানদণ্ড যে বিভিন্নভাবে ত্রুটিযুক্ত তা আলোচনা করে দেখানো হবে। এ অধ্যায়ে ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আচরণকে এসব মানদণ্ডের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করা হবে।

- দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্ট করা হবে যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ, ব্যবসায়ের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয় পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে যা উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক অবস্থা (Win-win situation) তৈরি করে। এ অধ্যায়ে এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে অর্থ ব্যয়ের কারণে শেয়ারমালিকগণ আপাতঃদৃষ্টিতে প্রত্যাশিত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হলেও টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লাভবানই হবেন।

- তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মচারী ও নিয়োগকারীর বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হবে যা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কের সূত্রে গাঁথা। এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অধিকারের প্রকৃতি, কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার অধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ‘কর্মসংস্থানের ইচ্ছা’ (‘Employment-at-Will’- EAW), কর্মচারীর অধিকারের নৈতিক ভিত্তি, কর্মচারীর অধিকার ও দায়িত্ব, নিয়োগকর্তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, কর্মচারীর ও নিয়োগকর্তার পারস্পরিক দায়িত্ব পালন ও বিনিময় সম্পর্কের উপর ব্যবসায়ের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

- চতুর্থ অধ্যায়ে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পেশাগত দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যবহারিক অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করা হবে। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের প্রকৃতি, প্রকারভেদ, শর্তসমূহ, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের

ন্যায্যতা, হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়ার পক্ষে ও বিপক্ষ যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখানো হবে যে, রাষ্ট্র বা জনগণের বৃহত্তর ক্ষতির আশংকা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তথ্য প্রকাশকারীকে তথ্য প্রকাশের অধিকার ও সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যতীত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করে অনৈতিক তথ্য প্রকাশে উৎসাহী হবেন না।

- পঞ্চম অধ্যায়ে চাকুরি বৈষম্য ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে। চাকুরি বৈষম্যের ধরন ও প্রকৃতি, বাংলদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় চাকুরিক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে সেদিকটির বিভিন্ন যুক্তি যেমন উপযোগবাদী যুক্তি, অধিকার ভিত্তিক যুক্তি এবং ন্যায় ভিত্তিক যুক্তি – এই তিনটি যুক্তির ন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিকারে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োগকৃত ইতিবাচক পদক্ষেপটির কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হবে। অধিকন্তু এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবেন এবং প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

- ষষ্ঠ অধ্যায়ে টেকসহিতার পটভূমি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, টেকসহিতার যৌক্তিকতা ও টেকসই ব্যবসায় এবং নৈতিকতার সম্পর্ককে ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ – এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল যা প্রতিষ্ঠা করা যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যক। এ অধ্যায়ে এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিকতা চর্চা অপরিহার্য যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলেই তাদের ঈপ্সিত ফলাফল লাভে সক্ষম হবে।

উপসংহারে দেখানো হবে যে ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে উপযোগবাদ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। কারণ উপযোগবাদে বিশ্বাসী ব্যবসায়ী মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে সততা, অধিকার তত্ত্ব, ন্যায়পরতার ধারণা সম্পর্কিত নৈতিক মত দ্বারা প্রভাবিত হবেন। কারণ তিনি জানেন উক্ত নৈতিক মতের সংমিশ্রণ ব্যতীত ব্যবসায় যেমন দীর্ঘমেয়াদী বা টেকসই হবে না তেমনি ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করাও সম্ভব হবে না। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বর্তমান বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত

সন্নিবেশিত করে এগুলোকে বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আচরণের ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব, ঔচিত্য-অনুচিত্য, ভালত্ব-মন্দত্ব সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে এটাই দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে নৈতিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই ব্যবসায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসায়ের টেকসহিতার জন্য শুধু মুনাফা অর্জনই নয় নৈতিকতা অনুশীলনও অপরিহার্য। নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই যেমন লাভবান হবেন তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড: একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

১.১ ভূমিকা: ব্যবসায় নীতিবিদ্যা হলো প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা যেখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব, ভালত্ব-মন্দত্ব প্রভৃতি মূল্যায়ন করা হয়। এখানে ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ও তাদের আচরণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, ক্রেতা ও ভোক্তা সাধারণের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, কাঁচামাল সরবরাহকারীর সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, শ্রমিকের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ইত্যাদি। বর্তমানে এ ধরনের সম্পর্কের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কার্যকারিতা, উপযোগিতা, সততা, ন্যায়পরতা, পুণ্যনীতি, অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়ে থাকে। ফলে ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাদের হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, আইন, জননীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষা ও ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি নীতিবিদ্যার ভাষা ও ধারণার সাথেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাই টেকসই ব্যবসায়ের জন্য নীতিবিদ্যার ভাষা ও ধারণার জ্ঞান থাকা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। সাধারণত আমরা যখন কোন বাস্তব ঘটনাকে জানি তখন তার প্রকৃতি কি তা প্রকাশ করে, কোনটি করা উচিত বা অনুচিত তা নিয়ে মূল্যায়ন করি না বিধায় এ ধরনের বক্তব্য বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কোন ঘটনা ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় এরূপ সম্পর্কে বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। উদাহরণস্বরূপ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান হলো এরূপ নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কারণ উক্ত দুই বিজ্ঞানই বিশেষ কোন রাষ্ট্র বা সমাজ বা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি নিয়ে একটা ব্যাখ্যা বা অবকাঠামোগত বর্ণনা দিয়ে থাকে। এ কারণে বলা হয় যে, কেবল ঘটনা জানাই যথেষ্ট নয় – ঘটনাকে মূল্যায়ন করার অবকাশও রয়েছে। এ মূল্যায়নের কাজটি সম্পাদন করে থাকে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা। ফলে নীতিবিদ্যা হলো মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। যেমন আমাদের কীভাবে জীবন যাপন করা উচিত? অবশ্য এটা কোন নতুন প্রশ্ন নয়। কারণ মানব ইতিহাসের সকল দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলেই এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই আলোকে বলা যায় যে, আমরা যদি টেকসই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই রীতি-নীতিকে গুরুত্বহীন বলে মনে করি তাহলে সেটা হবে মারাত্মক ভ্রান্ত পদক্ষেপ। ফলে উপরে উল্লিখিত প্রশ্নের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের

জন্য নীতিবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে উক্ত প্রশ্নের একটি দার্শনিক ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা নির্ণয় করে থাকে যা এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা: ব্যবসায় নীতিবিদ্যা তার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের আচরণ বা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথার্থ-অযথার্থ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে ও এ সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের যে সকল আচরণ বিভিন্ন প্রকার নৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে তা নির্ধারণে ব্যবসায় নীতিবিদ্যা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখন প্রশ্ন হলো– ব্যবসায় অনৈতিকভাবে পরিচালিত হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে? সাধারণ পর্যবেক্ষণে বলা যায় যে, অনৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালিত হলে সে ব্যবসায় যেমন আইনগত ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে তেমনি অর্থনৈতিক ঝুঁকিরও সম্ভাবনা থাকে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার সুনাম হারানোর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার সম্ভাবনাকে ম্লান করে দেয়। সাম্প্রতিক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন নাইক, ম্যাকডোনাল্ডস, হোম ডিপোট, গ্যাপ, শেল অয়েল, লেভি স্ট্রস, ডোনা ক্যারেন, কে-মার্ট, ওয়াল-মার্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভোক্তারা কোম্পানিগুলোকে অনৈতিক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রত্যাখান করতে প্রয়াসী হন। ১৯৬০ সালে আমেরিকায় কর্পোরেট প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তার কর কর্তনের পর গড় ভাতা ছিল কারখানার শ্রমিকদের উপার্জিত গড় ভাতার বারো গুণ। ১৯৭৪ সালে এই গড় ভাতা পঁয়ত্রিশ গুণে উন্নীত হয়। ১৯৯৫ সালে 'বিজনেজ উইক'এর তথ্যানুযায়ী এই গড় ভাতা একশত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কারখানার শ্রমিকদের গড় ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল পঁয়ত্রিশ গুণ। ১৯৯৮ সালে ''ফরচুন মেগাজিন" এর নিবন্ধের তথ্য মতে প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তার গড় ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল একশত বিরাশি গুণ।"[১] আবার ২০০৩ সালে ডিলয়েট (Deloitte) সাময়ীকির একটি জরিপের প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৪,০০০ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ৫০০০ পরিচালকের মধ্যে ৯৮ শতাংশ পরিচালক মনে করেন কর্পোরেট গর্ভন্যান্সের (Corporate governance) ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও আইন সম্মত কার্যাবলী মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করা অত্যাবশ্যকীয়। এসব উদাহরণের আলোকে বলা যায় যে, অনৈতিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেটি কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই এ সকল আচরণ মূল্যায়নের জন্য ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। কারণ নৈতিক মানদণ্ডের আলোকেই আমরা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট মানুষের আচরণ যা

ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, যথার্থ-অযথার্থ, ভাল-মন্দ, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় প্রভৃতি মূল্যায়ন করে থাকি যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আলোচনার ধারাবহিকতায় আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত এসব সমস্যাবলী মূল্যায়ন ও সমাধানের জন্য ব্যবসায় নৈতিক মানদণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক উদাহরণঃ আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পপতি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন গুডরিচ (Benjamin Franklin Goodrich) ১৮৭০ সালে যানবাহনের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার লক্ষ্য নিয়ে নিজের নামানুসারে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যা বি. এফ. গুডরিচ নামে পরিচিত। ১৯৬৭ সালের ১৮ জুন, উক্ত কোম্পানি প্রতিযোগিতাপূর্ণ নিলামের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে এ৭ডি নামক নতুন মডেলের বিমানের ব্রেক প্রস্তুত, পরীক্ষা ও নক্সা করার জন্য আমেরিকার বিমান বাহিনীর সঙ্গে একটি চুক্তিবদ্ধ হয়। উক্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী বিমানের ব্রেকটি ১০৬ পাউন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। উক্ত ব্রেকটিতে ৪ এর অধিক ব্রেকিং ডিস্ক বা রটার ধারণ করতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে যেন বিমানটির গতি প্রতিরোধ করা যায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই চুক্তিটি যেহেতু প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল তাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বিমান বাহিনীর চাহিদানুযায়ী (চুক্তিতে উল্লিখিত) বিমানের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। উল্লিখিত শর্তানুযায়ী যন্ত্রপাতির বিক্রয়োত্তর প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য বি. এফ. গুডরিচের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন শাখা ব্যবস্থাপক রাসেল ভেন হর্ণ, এবং রাসেল লাইন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক রবার্ট সিন্‌ক, গবেষণাগার অভীক্ষক রাফ গ্রেটজিনজার, নক্সা প্রকৌশলী জন ওয়ারেণ, গবেষণাগার প্রকৌশলী অভীক্ষক রবার্ট গ্লোর, নক্সা প্রকৌশলী সার্লে লসন, এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকারক কেরমিট ভেন্ডিভিয়ার। নক্সা প্রকৌশলী জন ওয়ারেণ বিমানের ব্রেক নক্সা করেছিলেন এবং উক্ত নক্সা যাচাই করার জন্য বি. এফ. গুডরিচ ২০ বছর বয়সের সার্লে লসন নামক একজন প্রকৌশলীকে নিয়োগ করেছিলেন এই শর্তে যে বিমানের ব্রেক প্রস্তুত করতে মানসম্পন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা তিনি নিশ্চিত করবেন। লসন প্রথম যাচাই-বাচাই করে দেখতে পেলেন যে, ব্রেকটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে। তিনি আরও দেখলেন যে, নির্দিষ্ট দূরত্বে বিমানটি থামার জন্য ব্রেকটির উপরিভাগে যথেষ্ট জায়গা নেই। এই সমস্যাটি তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী ওয়ারেণকে অবহিত করে বলেছিলেন যে, বিমানের পাইলট ও যাত্রী উভয়েরই জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ওয়ারেণ উক্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখান করায় শেষ পর্যন্ত লসন হতাশ হলেন এবং একটি নৈতিক সংকটের মধ্যে পতিত হন। অর্থাৎ লসন যদি নিয়োগকর্তার আদেশ অমান্য করেন তাহলে তাঁকে চাকুরিচ্যুত হতে হবে এবং তিনি যদি প্রতিবেদনটি লিখতে অপারগ হন তাহলে উক্ত

প্রতিবেদনটি অন্য কেউ লিখবেন। তাই প্রথম দিকে লসন প্রতিবেদনটি লিখার বিপক্ষে অবস্থান নিলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এই প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের সর্বশেষ প্রতিবেদক হলেন কেরমিট ভেন্ডিভিয়ার। তিনিও ব্রেক যাচাই-বাচাই করার ক্ষেত্রে লসনের মত একই সমস্যার সম্মুখীন হন। কেরমিট ভেন্ডিভিয়ার তাঁর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপককে বিষয়টি অবহিত করলে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক বলেন, 'এটি তোমার কাজ নয় এবং আমি (জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক) যা বলছি তুমি (কেরমিট ভেন্ডিভিয়ার) তাই কর।' পরবর্তীতে লসন এবং ভেন্ডিভিয়ার উভয়েই ইতিবাচক প্রতিবেদন জমা দিতে বাধ্য হন। এই মিথ্যা প্রতিবেদনের কারণে পরবর্তীতে ৫ জন পাইলটের মৃত্যু হয় এবং অনেক বছর পর ভেন্ডিভিয়ার তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কংগ্রেসের সামনে তাঁর ভুল স্বীকার করেন। ভেন্ডিভিয়ার মূলতঃ সে মুহূর্তে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বড় অংকের দায় থাকার কারণে চাকুরিচ্যুত হতে চাননি এবং বি. এফ. গুডরিচের সুনাম বা খ্যাতি এতই প্রবল ছিল যে সরকারও এর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। তাই ভেন্ডিভিয়ার তাঁর নিজ স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন।[২]

পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত গল্পটি ছিল ভেন্ডিভিয়ারের অনুশোচনার ফল। কারণ পূবেই উল্লেখ করেছি যে, ভেন্ডিভিয়ার তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং লসনও বিশ্বাস করতেন একজন প্রকৌশলী হিসেবে যেকোন মূল্যেই হোক সর্বোত্তম কাজটি করা উচিত। উভয়ের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো: সর্বদা সত্য কথা বলা উচিত, নির্দোষ ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করা অন্যায়, মানুষের জীবনকে বিপন্ন করা, অন্যায় ও অনৈতিক, সততাই উত্তম এবং অন্যায় বা ন্যায়বিরুদ্ধতা খারাপ। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির আচরণ ও কার্যাবলী যখন কোন আদর্শের আলোকে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি নৈতিক পদের মূল্যায়ন করা হয় তখন সেটি নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। নৈতিক মানদণ্ডের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৩]

- নৈতিক মানদণ্ড মারাত্মকভাবে অন্যায় বা সুবিধাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন হত্যা, আইন ভঙ্গকরা, চুরি করা, কুৎসা রটনা, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা, শিশু নির্যাতন, দাসত্ব প্রভৃতি অনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এসব বিষয় মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার, উপরে উল্লিখিত উদাহরণে ভেন্ডিভিয়ার ও লসনের প্রতিবেদনের কারণে ৫ জন পাইলটের মৃত্যু বা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছে যা কোনভাবেই কাম্য ছিল না এবং নৈতিকভাবেও ছিল অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া যেসব বিষয় মারাত্মকভাবে মানুষের জীবনের ভাল, মন্দ, অন্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তা নৈতিক বিবেচনার

বিষয় নয়। যেমন 'ক' ভাল পত্র লিখতে পারে অথবা 'খ' নামক ব্যক্তির হৃদযন্ত্র ভাল ইত্যাদি বিষয়গুলো নৈতিক নয়। কেননা এসব উক্তির সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

- নৈতিক মানদণ্ড কোন বিশেষ সংস্থার অথবা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রণীত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। আমরা জানি, আইন বা আইনসংক্রান্ত বিষয়সমূহ আইন সভা বা ভোটারদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রণীত হয়ে থাকে। কিন্তু নৈতিক মানদণ্ডের ক্ষেত্রে এরূপ কোন প্রক্রিয়া নেই। তবে যুক্তির পর্যাপ্ততা থাকলে নৈতিক মানদণ্ড বৈধ বলে বিবেচিত হবে নতুবা অবৈধ হবে। এক কথায় যুক্তির ক্ষেত্রে সার্বজননীতা ও নৈতিকতা থাকতে হবে।
- নৈতিক মূল্যকে অন্যান্য মূল্যের বিশেষতঃ আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে বিবেচনা করা উচিত।
- নৈতিক মানদণ্ড নিরপেক্ষ বিবেচনা থেকে প্রতিষ্ঠিত। যেমন মিথ্যা বললে 'ক' নামক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সুবিধাপ্রাপ্ত হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এরূপ বিষয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক। কারণ মিথ্যা বলাই তো নৈতিকভাবে অন্যায়। ভেন্ডিভিয়ার স্বীয় স্বার্থ বিবেচনা করে কাজটি করেছেন বলে তা নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। তাই সম্প্রতি নীতিদার্শনিকগণ মনে করেন, নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ পর্যবেক্ষক ও নিরপেক্ষ দর্শক কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে বিশেষ আবেগের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অনুশোচনা, কৃতজ্ঞতাবোধ, লজ্জাবোধ, ঘৃণা করা প্রভৃতি অনুভূতি থাকতে হবে। আমরা যদি নৈতিক আদর্শের পরিপন্থী কোন কাজ করি তাহলে আমাদেরকে উক্ত কাজের জন্য নিজেকে অনুতপ্ত হতে হবে, লজ্জা পেতে হবে এবং নিজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মিথ্যা প্রতিবেদন প্রদানের জন্য পরবর্তিতে ভেন্ডিভিয়ার কংগ্রেসের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন, লজ্জিত হয়েছিলেন, অনুশোচিত হয়েছিলেন।

১.৩ বিভিন্ন প্রকার নৈতিক মানদণ্ডঃ পূবেই আমি ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আচরণের মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতাকে উল্লেখ করেছি। এখন প্রশ্ন হলো: ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব আচরণকে নীতিবিদ্যার কোন নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় কেবলমাত্র একটি মাত্র মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে এসব ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আচরণের মূল্যায়ন করা সমীচীন নয়। তাই ব্যবসায়ের এসব আচরণ মূল্যায়নের জন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রকম মানদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। নীতি দার্শনিকগণ ব্যবসায় নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে সকল মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আপেক্ষিকতাবাদ, আত্মস্বার্থবাদ,

উপযোগবাদ, অধিকার তত্ত্ব, কান্টের নীতিতত্ত্ব, ন্যায় তত্ত্ব ইত্যাদি। ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট উক্ত নৈতিক মানদণ্ডসমূহ নিম্নে আলোচনা কর হলো:

১.৩.১ আপেক্ষিকতাবাদ: আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, কোন কাজের নৈতিক মূল্যায়নের জন্য সার্বজনীন কোন নীতি, আদর্শ বা আইন নেই। এই মতবাদ বস্তুনিষ্ঠ সত্যকে অস্বীকার করে এবং ব্যক্তি বিশেষের সত্য বা বিশেষ সমাজের বিশ্বাসকে সত্য বলে দাবি করে। এ কারণে এই মতের প্রবর্তকগণ মনে করেন, কোন ব্যক্তির জন্য কোন বিষয় সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও সেটি অন্য কোন ব্যক্তির জন্য তা অনুরূপ নাও হতে পারে যা বিপরীতভাবেও প্রযোজ্য। এখানে ব্যক্তি মানুষই তার আচরণ মূল্যায়নের জন্য নিজেই নিজের নীতি নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মূল্যবোধকেই আচরণ মূল্যায়নের জন্য একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণে বলা যায় যে, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে নৈতিক অবধারণগুলো হলো ব্যক্তি, সংস্কৃতি, স্থান, কাল ভেদে পরিবর্তনশীল। আমেরিকার বিখ্যাত সেইন্ট জন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও সোসাইটি ফর বিজনেস এথিক্সের (Society for Business Ethics) পরিচালক যোসেফ ডেসজার্ডিন্স তাঁর *An Introduction to Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, “Ethical relativism is a view that believes that all ethical judgments are relative to the person or culture that makes them.”[8] এ বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ এমন একটি মত যেটি বিশ্বাস করে যেসব নৈতিক অবধারণগুলো ঐ ব্যক্তি ও সংস্কৃতির সাপেক্ষিক যারা এদের তৈরি করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ বৌদ্ধিক বা নৈর্ব্যক্তিক অবধারণ গঠন স্বীকার করে না এবং নৈতিক অবধারণগুলোকে একজন ব্যক্তির নিজের সমাজের, সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুভূতির উপর নির্ভর করে। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ হলো একটি মত যেটি নৈতিক বা আদর্শনিষ্ঠ অবধারণগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ এটি স্বীকার করে যে নৈতিক বা আদর্শনিষ্ঠ অবধারণগুলো ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ অনুযায়ী গঠিত। অন্যকথায় বলতে গেলে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ছাড়া কোন ন্যায়-অন্যায়, ন্যায্য-অন্যায্য, যথার্থ-অযথার্থ বলে কিছু নেই। এ কারণে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদকে বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ মতের বিশ্বাসীরা মনে করেন নৈতিক কাজের সার্বজনীন বা স্থায়ী কোন মানদণ্ড নেই। অর্থাৎ নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে অনেকেই বলেন যে নৈতিকতা হলো যেকোন ব্যক্তির সংস্কৃতির সাপেক্ষক এবং কোন সমাজের নৈতিকতা অনুশীলনের উপরই নির্ভর করে কোন্ কাজটি ন্যায় বা অন্যায়। এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় দুই ধরনের নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো ব্যক্তিগত নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ এবং অপরটি হলো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৈতিক

আপেক্ষিকতাবাদ। নৈতিক অবধারণ বা বচন হলো ব্যক্তি সাপেক্ষক। অর্থাৎ আমার যেমন একটি নৈতিক মত রয়েছে তেমনি অন্যেরও একটি নৈতিক মত রয়েছে। তবে দুই জনের কেউই তার নিজের মতকে অধিকতর সঠিক বা ভাল বলে দাবি করতে পারবে না। আমরা উভয়ে যে সত্যই বিশ্বাস করি না কেন যতদূর সম্ভব আমরা উভয়ই একে অপরকে সদর্থকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। ব্যক্তিগত নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ এ দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক বিষয়ীগত মতবাদ হিসেবেও পরিচিত। অন্যদিকে, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে নৈতিকতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। অর্থাৎ নৈতিকতা একটি সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে ভিন্ন। একই প্রকৃতির অনুশীলন কোন একটি সমাজের ক্ষেত্রে যেমন সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে তেমনি অন্য একটি সমাজের জন্য সেটি ভিন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সম্ভাব্যতাকে নিষিদ্ধ করে না। উদাহরণ হিসেবে দাস প্রথার কথা বলা যেতে পারে। আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বে আমেরিকায় দাস প্রথাকে নৈতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল যা বর্তমানে নেই। সুতরাং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী নৈতিক অবধারণ হলো সমাজ বা সংস্কৃতি নির্ভর। অর্থাৎ কোন একটি সমাজের সংস্কৃতি এবং পরিবেশের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায় বা অন্যায় বিবেচনা হয়ে থাকে।

নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এটি হলো এমন একটি মতবাদ যেটি বিশ্বাস বা স্বীকার করে যে, বিভিন্ন সমাজের মানুষের নিকট সত্য ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয় এবং যেটির স্থায়ী বা চিরন্তন কোন মানদণ্ড নেই। এক কথায় বলা যায় যে, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ হলো এমন একটি মত যা নৈতিক বা আদর্শনিষ্ঠ অবধারণগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ এটি স্বীকার করে যে, নৈতিক বা আদর্শনিষ্ঠ অবধারণগুলো ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ অনুযায়ী গঠিত বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত ছাড়া কোন ন্যায়-অন্যায়, যথার্থ-অযথার্থ বলে কিছু নেই। সুতরাং নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ নির্দেশ করে যে, ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের ব্যক্তি ও সমাজ বা সংস্কৃতির স্বীকৃতি বা অনুমোদন। নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো:

বিভিন্ন দেশে যা নৈতিক	**বিভিন্ন দেশে যা অনৈতিক**
বাংলাদেশে গরুর মাংস	ভারতে গরুর মাংস
আমেরিকায় এলকোহল গ্রহণ ও জুয়া খেলা	মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে এলকোহল গ্রহণ ও জুয়া খেলা
বাংলাদেশে শিক্ষা, ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ	আফগানিস্তানে শিক্ষা, ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ
ইউরোপ, আমেরিকায় শর্টস, মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা সংক্রান্ত বস্ত্র পরিধান	ইরান, সুদান, সৌদি আরব শর্টস, মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখা সংক্রান্ত বস্ত্র পরিধান

উক্ত টেবিল বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, বাংলাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকার সমাজের সঙ্গে অন্য কয়েকটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের সমাজে যেসব বিষয় অনুমোদন করেছে তা কিন্তু অন্যান্য সমাজ অনুমোদন করেনি। এ কারণে আমেরিকার বিখ্যাত আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জেমস র‍্যাচেল তাঁর *The Elements of Moral Philosophy* গ্রন্থে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যে নৈতিক নীতি ভিন্ন হয়ে থাকে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়:[৫]

- তাঁদের মতে, বিভিন্ন সমাজের স্বতন্ত্র নৈতিক নীতি রয়েছে;
- কোন একটি সমাজের ন্যায়, অন্যায়, ভাল, মন্দ প্রভৃতির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ঐ সমাজের নৈতিক নীতিমালা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যদি কোন সমাজের নৈতিক নীতি মনে করে যে নির্দিষ্ট কোন কাজ যথার্থ তাহলে ঐ সমাজের জন্য উক্ত কাজটি যথার্থ বা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত। যেমন প্রাচীন গ্রীসে এক সময় নারী ও দাসদের ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় উক্ত সমাজেই এই সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে;
- একটি সমাজের নীতি যে অন্য একটি সমাজের নীতির তুলনায় ভাল বা মন্দ তা বিবেচনা করার জন্য এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই;
- আমাদের স্বীয় সমাজের নৈতিক নীতির বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। কারণ এটি অন্যান্য সমাজের নীতির মতই এবং
- মানুষ সর্বাবস্থায় এ ধারণ পোষণ করে যে, নীতিবিদ্যায় সার্বজনীন সত্য বলে কিছু নেই বিধায় নৈতিক সত্য বলেও কিছু নেই।

নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে, এটি ব্যবসায় নীতিবিদ্যাসহ, নীতিবিদ্যার প্রতি একটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া। কারণ এটি যদি আমরা মেনে নেই তাহলে নৈতিক শিক্ষার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। যদি সকল মতই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে টেকসই ব্যবসায়কে নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। তাই আপেক্ষিকতাবাদকে যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে ব্যবসায় নীতিবিদ্যা বড়জোর আমাদের নৈতিক অবধারণের অন্তর্গত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যগুলোকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারে – কিন্তু তাদের মূল্যায়ন করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ একটি ত্রুটিযুক্ত মতবাদ। কিন্তু নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের সদর্থক দিকও রয়েছে। যেমন এ মতবাদ অন্যের মতের প্রতি সহনশীলতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিপরীত মতের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব হয়।

১.৩.২ আত্মস্বার্থবাদ: এ মতবাদ মনে করে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আত্মস্বার্থবাদ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব দার্শনিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বৃটিশ দার্শনিক থমাস হবস, ফরাসি দার্শনিক ম্যান্ডেভিল ও হেলভেটিয়াস। হবস বলেন ব্যক্তি নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসে না। ম্যান্ডেভিল মনে করেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বীয় স্বার্থকেন্দ্রিক এবং নিজ স্বার্থের উর্ধ্বে কাউকে ভালোবাসে না বা ঘৃণাও করে না। এখানে ব্যক্তি স্বীয় বিলাসিতা, অহংকার, ইন্দ্রিয়সুখ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি গ্রহণীয় বলে সমর্থন করে। হেলভেটিয়াসও মনে করেন, আমাদের প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ এবং বন্ধুত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবর্তিত হচ্ছে। তাই এ মতবাদ মনে করে যে, ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রক্ষা করবে যা নৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য।

আত্মস্বার্থবাদ স্বীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে বিধায় আমেরিকার বিখ্যাত ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যায়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যারল্ড ডি. কুঞ্জ এবং সাইরিল জে. ও'ডোনেল তাঁদের *Principles of Management* গ্রন্থে বলেন, “The business of business is business.”[৬] অর্থাৎ মুনাফা অর্জনই হলো ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য (তাঁদের উক্ত বক্তব্য দ্বিতীয় অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে)। মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে স্বীয় কল্যাণ সাধন হয় বলে এই মতবাদ ব্যবসায়ীদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু আত্মস্বার্থ দ্বারা সমাজের বস্তুনিষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হয় না বরং এটি সমষ্টির ক্ষতি সাধন করে যা আমেরিকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান R&D (Research AND Development) এর দুই জন বিজ্ঞানী মেরিল ফ্লাড এবং মেলভিন ড্রেশার ১৯৫০ সালে প্রথম একটি গেম থিওরির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে গেম থিওরিকে আরো বিকশিত করার ক্ষেত্রে যিনি অবদান রেখেছেন তিনি হলেন আলবার্ট ডব্লিউ টাকার। গেম থিওরি Prisoner’s Dilemma নামেও পরিচিত। Prisoner’s Dilemma সম্পর্কে বলা হয়, “A prisoner’s dilemma is a situation in which two parties are each faced with a choice between two options: Either cooperate with other party or do not cooperate.”[৭] এখানে দুটি পক্ষ থাকবে এবং উভয় পক্ষ একে অপরকে সহযোগিতা করা বা না করার বিষয়টি পছন্দ করে নিতে পারে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যদি উভয় পক্ষ পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাহলে উভয় পক্ষই সুবিধা অর্জন করবে। যদি উভয় পক্ষ উভয়কে অসহযোগিতা করে তাহলে উভয় পক্ষই সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। যদি একজন সহযোগিতা করে এবং অন্যজন অসহযোগিতা করে তাহলে যে সহযোগিতা করবে

সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে অসহযোগিতা করে সে সুবিধা পাবে। প্রিজনার্স ডিলেমা অনুসারে সব থেকে ভাল ফল তখনই সম্ভব যখন একে অপরকে সহযোগিতা করে।

প্রিজনার্স ডিলেমাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক 'প' এবং 'ফ' নামক দু'জন ব্যক্তি মিলে কোন একটি অন্যায় কাজ সংঘটিত করে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু সরকারি আইনজীবীর নিকট যে তথ্য উপাত্ত রয়েছে তাতে উভয়কে সর্বনিম্ন ১ বছর শাস্তি প্রদান করতে হয়। তাই সরকারি আইনজীবী উক্ত ঘটনা প্রমাণের উদ্দেশ্যে একটি কৌশল অনুসরণ করেন। তিনি (সরকারি আইনজীবী) পৃথকভাবে উভয়কে বোঝাতে সক্ষম হন যে, যদি তাদের কোন একজন অপরের দোষ প্রমাণে সহায়তা করে তাহলে সে (দোষ প্রমাণে সহায়তাকারী) প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মুক্তি পাবে এবং অন্যজন সর্বোচ্চ শাস্তি ৩ বছর ভোগ করবে যা বিপরীতভাবে উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই তাদের সর্বোচ্চ স্বীয় স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করবে। অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে সরকারি আইনজীবীকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উভয়ই উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দোষ অস্বীকার করতো তাহলে ১ বছর শাস্তি ভোগ করতো যা তাদের জন্য সর্বনিম্ন। কিন্তু স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে (একে অপরকে অসহযোগিতার মাধ্যমে) উভয়েই সর্বোচ্চ শাস্তি ৩ বছর ভোগ করবে। এরূপক্ষেত্রে যে তিনটি বিকল্প অবস্থা লক্ষণীয় তা হলো-

- যদি 'প' ও 'ফ' উভয়ই দোষ স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরে প্রত্যেকেই ১ বছরের শাস্তি বা সাজা ভোগ করতে হবে যা সর্বনিম্ন শাস্তি।

- যদি 'প' এবং 'ফ' উভয়ই দোষ স্বীকার করে তাহলে প্রত্যেকের ২ বছরের শাস্তি বা সাজা ভোগ করতে হবে।

- যদি 'প' সরকারি আইনজীবীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ফ' কে সহযোগিতা না করে তাহলে 'প' মুক্তি পাবে এবং 'ফ'- এর ৩ বছরের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে যা বিপরীভাবেও প্রযোজ্য (যদি 'ফ' সরকারি আইনজীবীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'প' কে সহযোগিতা না করে তাহলে 'প'- এর ৩ বছরের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে এবং 'ফ' মুক্তি পাবে)। বিষয়টিকে নিন্মে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়:

	প্রিজনার 'ফ' প্রিজনার 'প' কে সহযোগিতা করে	প্রিজনার 'ফ' প্রিজনার 'প' কে সহযোগিতা করে না
প্রিজনার 'প' প্রিজনার 'ফ' কে সহযোগিতা করে	'প' ১ বছরের সাজা পাবে 'ফ' ১ বছরের সাজা পাবে	'প' ৩ বছরের সাজা পাবে 'ফ' মুক্তি পাবে
প্রিজনার 'প' প্রিজনার 'ফ' কে সহযোগিতা করে না	'প' মুক্তি পাবে 'ফ' ৩ বছরের সাজা পাবে	'প' ২ বছরের সাজা পাবে 'ফ' ২ বছরের সাজা পাবে

Source: Velasquez, Manuel G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 39.

উপরের গেম থিওরি থেকে দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের বিষয়টি সর্বোচ্চভাবে বিবেচনা করে তখন মূলত সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা অন্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় ব্যবসায়েও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রিজনার্স ডিলেমাতে নৈতিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিহিত রয়েছে। কারণ ব্যবসায় ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রেতা বা ভোক্তা, সরবরাহকারী, পাওনাদার যা চলমান ও পুনরাবৃত্তিমূলক। যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনৈতিক আচরণ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে উল্লিখিত অংশিজনেদের নিকট থেকে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে তাহলে তারা পুনরায় যখন মুখোমুখি হবে তখন তারা (অংশিজন) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধের প্রকৃতিটা কখনও কখনও খুবই সহজ ও সরল হতে পারে। যেমন যখন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেবে তখন অংশিজনেরা তাদের নিকট থেকে পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকবে বা পণ্য প্রত্যাখান করবে। আবার প্রতিশোধের প্রকৃতিটা কখনও কখনও জটিলও হতে পারে। যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ঘাত বা নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে, এই অনৈতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যাখান করার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আহবান করতে পারে ইত্যাদি। এ সকল উদাহরণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অনৈতিক ব্যবসায় কার্যক্রম ব্যবসায়ের ভিত্তিকে দুর্বল করে এবং নৈতিকতা অনুশীলন ব্যবসায়ের ভিত্তিকে টেকসই করে। কারণ নৈতিক ব্যবসায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায়কে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে উভয়ই লাভজনক অবস্থায় উপনিত হয়। তাই প্রিজনার্স ডিলেমা অনুসারে বলা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য ও ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা আবশ্যক।[৮] কারণ

মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজের সদস্য হিসেবে সে সমাজে বসবাসরত অন্যান্য মানুষকে নিয়েও চিন্তা করে। ফলে বৃহৎ অর্থে স্বীয় ও অপরের কল্যাণে ব্যবসায় নৈতিকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। পরবর্তীতে আমি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব যে, মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ প্রত্যেকে যদি স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন তাহলে সেখানে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় যা মানুষকে স্বার্থপর, সংকীর্ণ ও পশু প্রকৃতি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যেটির উদাহরণ হিসেবে আমরা ইংরেজ আধুনিক রাষ্ট্রদার্শনিক থমাস হব্‌সের *Leviathan* গ্রন্থে দেখতে পাই। তিনি বলেন যে স্বার্থপর মানুষের জীবন হয়ে উঠে "নিকৃষ্ট, বর্বর এবং সংক্ষিপ্ত।"[৯] তাঁর এই বক্তব্য ইঙ্গিত করছে যে, সমাজের সকল মানুষই যখন সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তখন প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ ধরনের অসম প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে যা প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করে মানুষকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।[১০]এ ধরনের বক্তব্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যদি স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হয় তাহলে এখানেও ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন ব্যবসায়ীরা যদি সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্যে ভেজাল মেশায়, ওজনে কম দেয়, ও ক্রেতা সাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করে তাহলে তা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করবে। আবার কর্মচারীরা যদি তাদের স্বীয় প্রতিষ্ঠানের মালিককে না জানিয়ে চুরি করে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রি করে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সুবিধা গ্রহণে সচেষ্ট হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক গতি হারাবে। এভাবে সবাই যখন অনৈতিক পন্থায় সর্বাধিক মুনাফার প্রত্যাশায় সক্রিয় হবে তখন প্রত্যেকেই প্রতারণার চক্রে আবদ্ধ হবে যার দ্বারা সমষ্টিগতভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, স্বীয় স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যবসায় সমাজের জন্য কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ মতবাদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ কারণে আত্মস্বার্থবাদ অনেক সময় ত্রুটিযুক্ত মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১.৩.৩ উপযোগবাদ: আধুনিক নীতিদর্শনে কাজের ফলাফলকে কেন্দ্র করে দুই ধরনের নৈতিক মতাদর্শ রয়েছে। একটি পরিণতিমূলক মতাদর্শ এবং অপরটি পরিণতিমুক্ত মতাদর্শ। পরিণতিমূলক মতাদর্শ অনুযায়ী কোন একটি কাজ সম্পাদিত হওয়ার পর আমরা তার মধ্য দিয়ে কি ফলাফল পাব তা মূল্যায়ন করা হয়। পরিণতিমুক্ত মতাদর্শ অনুযায়ী কোন একটি কাজ সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে ফলাফলের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করা হয় যা আমি

কান্টের নীতি তত্ত্ব অংশে সবিস্তারে আলোচনা করব। পরিণতিমূলক মতাদর্শে বিশ্বাসী কোন কোন দার্শনিকগণ মনে করেন, আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য হলো পরিণামে সুখী হওয়া যা নীতিদর্শনে সুখবাদ নামে পরিচিত। "সুখবাদ" শীর্ষক পরিণতিমূলক মতাদর্শকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে গড়ে তোলেন ইংরেজ দার্শনিক, বিচারপতি, সমাজ সংস্কারক ও আধুনিক উপযোগবাদের জনক জেরেমী বেন্থাম। বেন্থাম প্রচারিত "সুখবাদ" মতবাদটিই পরবর্তীতে উপযোগবাদ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এ মতবাদকে যিনি পূর্ণতা দিয়েছিলেন তিনি হলেন ইংরেজ দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও চিরায়ত উদারনৈতিক মতবাদের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ও উপযোগবাদী দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিদর্শনের অধ্যাপক হেনরী সিজউইক।[১১] তাঁদের মতের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতদ্বৈততা থাকলেও সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ভাল কাজের মূল্যায়নের একমাত্র নৈতিক মানদণ্ড হলো সমষ্টিগত সুখ বা আনন্দ। অর্থাৎ উপযোগবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করা। এ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উপযোগবাদীরা ব্যক্তিগত উপযোগিতার পরিবর্তে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের উপযোগিতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

জেরেমী বেন্থাম তাঁর *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* গ্রন্থে উপযোগবাদের ধারণা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, উপযোগবাদ হবে এমন একটি নীতি যা আমাদেরকে সুখ ও আনন্দ দেয়। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে সুখ-দুঃখের অধীন করেছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো সুখের সন্ধান করা ও দুঃখকে পরিহার করা। এ কারণে মানুষ নিজের সুখকে প্রাধান্য দেয়। মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বোচ্চকরণ করার জন্যই কদাচিৎ অপরের সুখের কথা ভাবে। এখন প্রশ্ন হলো: মানুষ যদি স্বভাবত নিজের সুখ কামনা করে তাহলে সে পরের সুখ চাইবে কেন? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই বেন্থাম নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কোন কর্মকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। আমরা সাধারণত চারটি উৎস থেকে সুখ ও আনন্দ পেয়ে থাকি। উৎস চারটি হলো দৈহিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্মীয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেমন আনন্দের সূত্রপাতহতে পারে তেমনি দুঃখেরও সূচনা হতে পারে। এসব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা নানা বাস্তবতা থেকে যে সুখ পাই তা সুখের অনুভূতি হিসেবে দৈহিক সুখ হিসেবে প্রকাশ পায় এবং তিনি দৈহিক সুখকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বেন্থাম সুখের উপযোগিতাকে পরিমাপ করার জন্য সাতটি মানদণ্ডের কথা বলেছেন। যেমন (ক) প্রগাঢ়তা; (খ) স্থায়িত্ব; (গ) নিশ্চয়তা; (ঘ) নৈকট্য; (ঙ) ফলপ্রসূতা; (চ) শুদ্ধতা এবং (ছ) ব্যাপকতা অর্থাৎ কত অধিক সংখ্যক মানুষের জন্যে তা প্রসারিত হয়। এসব মানদণ্ডের মাধ্যমে তিনি সুখের পরিমাণগত দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং

বলেন যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সুখই হবে কাম্য।[১২] তাই বেন্থাম মনে করেন নিজের সুখের পাশাপাশি অন্যের সুখ কামনা করতে হয় যেন ব্যক্তি স্বার্থের সমষ্টিই সামাজিক স্বার্থ সৃষ্টি করে। মিল তাঁর বিখ্যাত *Utilitarianism* গ্রন্থে উপযোগবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উপযোগবাদের বিরুদ্ধে পূর্বে উত্থাপিত অভিযোগগুলো খণ্ডনের মাধ্যমে এ মতবাদকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেন। মিল ও বেন্থামের মতের মূল পার্থক্য হলো বেন্থাম যেখানে সুখের পরিমাণগত দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু মিল সেখানে সুখের গুণগত দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মিল মনে করেন, সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য না করলে মানুষ জৈবিক সুখের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে সুখবাদকে বিতর্কিত মতবাদে পরিণত করবে। বিষয়টিকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য তিনি সুখী শুকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া ভাল এবং সুখী বোকা মানুষ হওয়ার চেয়ে অসুখী সক্রেটিস (জ্ঞানী) হওয়া ভাল। এভাবে সুখবাদকে তিনি অধিকতর সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।[১৩] মিল সুখের গুণগত দিককে প্রাধান্য দিয়ে উপযোগবাদের ভিত্তিকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

মিল মনে করেন, কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কর্তা সম্ভাব্য যেসব কাজ সম্পাদন করতে পারেন তন্মধ্যে যে কাজটির উপযোগ সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে তা-ই নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত। তিনি বলেন,

> "The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure."[১৪]

মিল সুখ ও শান্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। শান্তি বলতে মিল সুখের উপস্থিতি ও দুঃখের অনুপস্থিতিকে বোঝান। তিনি নৈতিক কাজ বলতে সেই কাজকে বুঝিয়েছেন, যে কাজ দ্বারা সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ভাল বা 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ ভালো' ('The greatest good for the greatest number') হিসেবে পরিচিত।

উপযোগবাদের বহুমাত্রিক প্রয়োগ রয়েছে। তার মধ্যে অর্থনীতিতে উপযোগবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের শুরু থেকে অর্থনীতিবীদগণ পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থার পক্ষে উপযোগবাদ তত্ত্বকে ব্যবহার করছেন। অর্থনীতির পরিভাষায় সমাজের সম্পদ সীমিত এবং এই সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার মাধ্যমে সমাজের উপযোগ বৃদ্ধিই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। অর্থনীতিবীদগণ পণ্যের উপযোগ পরিমাপের জন্য বলেন, ক্রেতারা কোন পণ্য ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ দিতে ইচ্ছুক সেটিই ঐ পণ্যের উপযোগ। এভাবে তাঁরা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য কিভাবে

ভারসাম্যাবস্থায় উপনীত হয় তা নির্ণয়ের জন্য অর্থনীতিবীদগণ চাহিদা ও যোগান রেখা সম্বলিত লেখচিত্র ব্যবহার করেন। পণ্যের মূল্য ভারসাম্যাবস্থায় উন্নীত হলেই কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উপযোগ সর্বোচ্চ হয়। অর্থাৎ সর্বোপরি সমাজের সার্বিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে উপযোগবাদের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবীদগণ পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। উপযোগবাদ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও মুনাফা বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে।[১৫] এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সমাজে প্রচলিত অথবা আরোপিত লাভ-ক্ষতির উপর ভিত্তি করেই উপযোগবাদ কোন কাজ বা নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন করে থাকে।

আইন প্রণেতা হিসেবে বেন্থাম ও মিল উভয়েই জনকল্যাণে নীতিমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে দেখতে পান যে, এমন কোন একক জননীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয় যা দিয়ে সবাইকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। অর্থাৎ কোন একটি নীতি প্রণয়ন করতে গেলে তার মাধ্যমে এক পক্ষের যেমন লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে তেমনি অন্য পক্ষের লাভবান না হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যেমন দুনীতিরোধে সরকার বা কোন একটি প্রতিষ্ঠান যদি তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে তাহলে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব বাজার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় যার পরিণতিতে বাজারে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা যদি একটু সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখি বাজারে সরকারি বা অন্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী ছাড়াও বেকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী, স্বল্প আয়ের মানুষও যাতায়ত করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি বা অন্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী ব্যতীত বেকার, স্বল্প আয়ের মানুষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাদের বেতন বৃদ্ধি পায়নি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এরূপ ক্ষেত্রে বেন্থাম ও মিল উভয়ই একটি নীতির কথা বলেন। নীতিটি হলো সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ অন্বেষণ করা। অর্থাৎ আমাদের কার্যক্রম যেন সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই কোন কাজের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা দেয়া সম্ভব নয় বলে উপযোগবাদীরা কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ অনুসরণের কথা বলেন। যেমন:[১৬]

- প্রথমত: নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন কোন বিকল্প কাজ আমাদের হাতে আছে তা নির্ণয় করা;
- দ্বিতীয়ত: প্রত্যেকটি বিকল্প কাজের জন্য কে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কোনটি থেকে কতটা সুবিধা বা ক্ষতি হবে তা প্রশ্ন করা এবং
- তৃতীয়ত: বিকল্প কাজগুলোর মধ্যে আমরা সে কাজটি নির্বাচন করবো যা সর্বোচ্চ পরিমাণ সুবিধা প্রদান করবে এবং একই সাথে কম ক্ষতি করবে।

এবার এ তিনটি ধাপ অনুসরণ করে একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যাক। যেমন একজন ব্যবসায়ী একটি কাজ করতে চান। কারণ কাজের মাধ্যমে সমাজের বেকারত্ব হ্রাস পায়, মানুষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি সমাজেরও ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর হাতে পাঁচটি বিকল্প রয়েছে যা টেবিলের মাধ্যমে নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়:

কাজের একক ও পরিমাণ নির্ধারণ	প	ফ	ব	ভ	ম
উপকৃত	২০%	৩০%	৪০%	৬৫%	৮৫%
ক্ষতিগ্রস্ত	৮০%	৭০%	৬০%	৩৫%	১৫%

উপরের টেবিলে পাঁচটি বিকল্প কাজ ও তাদের দ্বারা উৎপাদিত উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। যদি ব্যবসায়ী 'প' নামক কাজটি সম্পাদিত করেন তাহলে ঐ সমাজের কম সংখ্যক মানুষ উপকৃত হন যা টেবিলে ২০ শতাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন যা টেবিলে ৮০ শতাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফল উপযোগনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় ব্যবসায়ী কর্তৃক 'প' নামক কাজটি সম্পাদিত না করাই নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার ব্যবসায়ী যদি 'ফ' নামক কাজটি সম্পাদিত করেন তাহলে ঐ সমাজের কম সংখ্যক মানুষ উপকৃত হন এবং অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন যা হয়তো 'প' নামক কাজের তুলনায় কম। কিন্তু উক্ত বিকল্পটিও উপযোগনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। আবার ব্যবসায়ী যদি 'ব' নামক কাজটি সম্পাদিত করেন তাহলে দেখা যায় পূর্বের দুইটি বিকল্প কাজের তুলনায় 'ব' নামক কাজের মাধ্যমে সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন তাও উপযোগনীতির কাঙ্খিত ফল নয়। আবার যদি 'ভ' নামক কাজটি সম্পাদিত করেন তাহলে দেখা যায় পূর্বের তিনটি বিকল্প কাজের তুলনায় এর ('ভ' নামক কাজের) মাধ্যেমে সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ উপকৃত হন। কিন্তু এটিও উপযোগনীতির ইপ্সিত ফল নয়। কারণ ব্যবসায়ীর হাতে আরোও একটি বিকল্প কাজ রয়েছে যা যাচাই করা সাপেক্ষে ইপ্সিত ফল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এবার সর্বশেষ 'ম' নামক কাজটি যদি তিনি সম্পাদিত করেন তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ উপকৃত হন যা টেবিলে ৮৫ শতাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কম সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন যা টেবিলে ১৫ শতাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বিকল্প কাজের মধ্য থেকে কেবলমাত্র 'ম' নামক কাজটিই উপযোগবাদের তিনটি ধাপ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে যা উপযোগনীতির অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক। সুতরাং ব্যবসায়ী কর্তৃক 'ম' নামক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টি নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপযোগবাদ প্রধানত দুই প্রকার। একটি কার্য উপযোগবাদ এবং অপরটি নিয়ম উপযোগবাদ। কার্য উপযোগবাদ পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে করণীয় ঠিক করে থাকে। বেন্থাম এবং বর্তমানকালে অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দর্শনের এমেরিটাস অধ্যাপক জন জেমাইসন কার্সওয়েল স্মার্ট কার্য উপযোগবাদের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। জে. সি. স্মার্ট অবশ্য কার্য উপযোগবাদ না বলে একে পরিস্থিতি নীতিবিদ্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে নিয়ম উপযোগবাদ হলো কার্য উপযোগবাদের বিপরীত মতবাদ। অর্থাৎ কার্য উপযোগবাদ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ করে কার্য সম্পন্ন করে এবং নিয়ম উপযোগবাদ সর্বক্ষেত্রেই একইনীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে। মিল ও বর্তমানকালের আমেরিকার নীতিদার্শনিক রিচার্ড বুকার ব্রান্ট নিয়ম উপযোগবাদের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত।[১৭]এবার একটি উদাহরণের মাধ্যমে দুই ধরনের উপযোগবাদকে বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক একজন রোগীর জীবন বাঁচানের জন্য এম্বুল্যান্সের চালক রাষ্ট্রের দ্বারা প্রণিত ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে রোগীকে হাসপাতলে নিয়ে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তায় ব্যবহৃত ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে রাস্তা পারাপারের চেষ্টা করেছে। কার্য উপযোগবাদীরা বিষয়টিকে সমর্থন করবেন। কারণ নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি চালানোর কারণে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে হয়তো এক বা দুটো ঘটনা সমাজকে বিশৃঙ্খলিত করবে না কিন্তু সমাজে যদি একই সাথে অনেক রোগীর জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে নিয়ম ভঙ্গের কারণে কাউকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু নিয়ম উপযোগবাদীরা বলবেন সর্বক্ষেত্রে যদি একই নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হওয়া যায় তাহলে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ও উদ্ভূত পরিস্থিতি ঘটা ও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হবে।

উনিশ শতকের অনেক অর্থনীতিবিদ উপযোগবাদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। ফলে অর্থনীতির অনেক সম্প্রত্যয় উপযোগবাদকে আত্মিকরণ করেছে। অর্থনীতির এমনিই এক পদ্ধতি হলো বিনিয়োগ-লাভ বিশ্লেষণ (Cost-benefit analysis) পদ্ধতি যা উপযোগবাদে বহুলভাবে ব্যবহৃত। উৎপাদন খরচ বা বিনিয়োগ সবসময় সর্বনিম্ন হবে এবং মুনাফা সবসময় সর্বোচ্চ হবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সবসময় আয়-ব্যয় পরিমাপ করার বিষয়টি সম্ভব নয়। উপযোগের পরিমাপ করতে গেলে প্রায়ই আমাদেরকে যেসকল সমস্যায় পড়তে হয় তার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:[১৮]

প্রথমত: বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের উপযোগ পরিমাপ ও পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো নির্দিষ্ট চাকুরিতে যোগদানের জন্য দু'জন সমান যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী আবেদন করেছে। কারো পক্ষেই একজন মানুষ সম্পর্কে সবকিছু জানা সম্ভবপর

হয়ে উঠে না। তাই উক্ত দুই চাকুরিপ্রার্থীর মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করলে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

দ্বিতীয়ত: অনেক কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলে ঐ বিষয়ের উপযোগও অনির্ণেয় থাকে। যেমন মানুষের জীবন কিংবা সুস্বাস্থের মূল্য আর্থিক মূল্যে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ধরা যাক, কোনো শিল্প কারখানায় দূষিত পদার্থ নির্গমণ থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ব্যয়বহুল একটি প্রকল্প গ্রহণে ইচ্ছুক। আরো ধরা যাক, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ঐ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের গড় আয়ু ৫ বছর বৃদ্ধি পাবে। এখন কোম্পানি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয়ের সাথে শ্রমিকদের বাড়তি ৫ বছর আয়ুর উপযোগের তুলনা কিভাবে করবে? আমার দেখেছি যে, জাপানের ফোর্ড কর্তৃপক্ষ পিন্টু গাড়ি উৎপাদনের সময় ১৯৭০ সালের সূচক অনুযায়ী একজন মানুষের জীবনের মূল্য দুই লক্ষ (২০০০০০/=) ডলার নির্ধারণ করেছিল। আবার বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথাও আমরা জানি। যদিও আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অমীমাংসিত তবুও বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য দেড় থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করেছে। “একজন শ্রমিকের জীবনের মূল্য কত” শিরোনাম নিবন্ধে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির সুশাসনের জন্য নাগরিক তথা সুজনের কর্ণধার ড. বদিউল আলম মজুমদার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রস্তাবিত টাকার পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন? তিনি বলেন প্রস্তাবিত টাকা যথোপযুক্ত নয়। কারণ যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তিনি অনেকের পিতা, পুত্র, ভাই, স্বামী আবার অনেকের মাতা, কন্যা, বোন, স্ত্রী। সুতরাং এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ক্ষতি টাকার অঙ্ক দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।[১৯] অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই অর্থের মাধ্যমে মানুষের জীবনের মতো এমন অমূল্য সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত: অনেক কাজের সুর্দরপ্রসারী ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারণা পাওয়া যায় না। ফলে ওই কাজের উপযোগ সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করা যায়না। উদাহরণস্বরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা বলা যেতে পারে। ঐ গবেষণার মাধ্যমে আদৌ কোনো তথ্য আবিস্কৃত হবে কিনা কিংবা তথ্য আবিষ্কৃত হলেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব কেমন হবে তা বলা যায়না। যেমন গত শতাব্দীতে পরমাণু বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে যার ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। এসব তথ্যের অনেক ইতিবাচক প্রয়োগ থাকলেও হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে বিপর্যয় ঘটাতে এ তথ্য প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প আমাদের

শক্তির চাহিদা মেটালেও চেরনোবিল বিপর্যয়ের মতো ঘটনাগুলো মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করেছে।

চতুর্থতঃ উপযোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সুবিধাজনক আর কোন বিষয়টি অসুবিধাজনক হিসেবে পরিগণিত হবে তা স্পষ্ট থাকেনা। এটি বিশেষত সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি এলকোহল কোম্পানি কোনো ব্যাংকে ঋণ অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছে। ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ম্যানেজারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তে পারেন। কেননা সমাজের কেউ কেউ দাবি করেন এলকোহল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করে তাই এটি উপকারী। আবার সমাজের অনেকে দাবি করেন যে এলকোহল কোম্পানি অপকারী; কেননা তা প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় হবে এবং সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করবে। সুতরাং উপযোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্র হিসেবে এলকোহল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অমিমাংসিত থেকেই যায়।

পঞ্চমতঃ উপযোগবাদে সবকিছুরই অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে বলে স্বীকৃত। সব পণ্যই পারস্পরিক বিনিময় যোগ্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো বিষয়ের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণে অন্য কোনো বিষয় হস্তান্তর করা যেতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি দু'টি হেম বার্গার খাওয়ার পরিবর্তে আধঘন্টা প্রিয় গানের এ্যালবাম শোনার তৃপ্তি বিনিময় করতে পারেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে কিছু অ-অর্থনৈতিক বিষয়ও (non-economic goods) রয়েছে। যেমন মানবজীবন, সুস্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সৌন্দর্য, ইত্যাদি বিষয় মানুষের অমূল্য সম্পদ; কোনো কিছুর পরিবর্তে কেউ এগুলোর বিনিময় করতে চাইবেনা। এসব মৌলিক বিষয় বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই মতবাদের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, পেশা জীবন, ব্যবসায় পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে উক্ত মতবাদ বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেন্থাম ও মিল উভয়ই আইন প্রণেতা হিসেবে জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপযোগবাদকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাই এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, নীতিদার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে এ মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজও অনস্বীকার্য।

১.৩.৪ অধিকার : সাধারণত অধিকার বলতে কোনকিছুর সাথে ব্যক্তির সম্পৃক্ততাকে বোঝায়। কোন বিয়য়ের প্রতি ব্যক্তির অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ঐ বিষয়ের সাথে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকে। ব্যক্তির এই সম্পৃক্ততা একটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে যাকে আইনগত অধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্যবসায় কিভাবে ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং তা সংরক্ষণের জন্য কি করা

উচিত তা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় তৈরি পোষাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য মজুরির জন্য আন্দোলন করতে হয়। তাদের এই আন্দোলন প্রাপ্য মজুরির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কারখানার মালিকরা শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকে যা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা শ্রমিকরা যখন কারখানায় কাজ করার জন্য মালিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন মালিকরা শ্রমিকদেরকে তাদের সকল ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তীতে মালিকরা অর্থলোভের কারণে বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে আইন বহির্ভূতভাবে শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ফলশ্রুতিতে কারখানার শ্রমিকরা তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। ব্যবসায় অধিকারের বিষয়টি কেবল মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে উৎপাদিত পণ্যে ভোক্তার অধিকারও জড়িত। একজন ভোক্তা নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য যে পরিমান অর্থ পরিশোধ করে সেই নির্দিষ্ট পণ্য সরবরাহ করা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। কেননা ভোক্তা অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট পণ্যের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবসায় অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে নানা নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এর কোন সন্তোষজনক সমাধান আজও লক্ষ্য করা যায় না। তারপরও অধিকার নিশ্চিতকরণে বর্তমানে অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন চীনে ডিজনি (Disney) নামক প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপার নিয়ে ডিজনির কতিপয় শঙ্কিত অংশিজন সকল অংশিজনকে একটি ভোট গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল অধিকার নিশ্চিকরণে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতিমালা উল্লেখ করা হলো:[২০]

- প্রতিষ্ঠানের কারখানায় কিংবা সরবরাহকারীর কারখানায় কোনো পণ্য উৎপাদনে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- বন্দীশিবীর, সংশোধনাগার কিংবা কাজের মাধ্যমে পূর্ণশিক্ষা কার্যক্রম।
- চীনের জাতীয় শ্রম আইণ অনুযায়ী সকল শ্রমিককে ন্যায্য বেতন দিতে হবে যেন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশে নির্ধারিত কর্মঘন্টা পূরণে সক্ষম হয়।
- কোনো কর্মীকে শারীরিক, মানসিক, মৌখিক কিংবা যৌন নির্যাতন করা যাবে না।
- কর্মক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না যেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ।

- শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার পূরণ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে পুলিশ কিংবা সেনাবাহীনিকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।
- শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, দাবি আদায়ে আন্দোলনের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।

মালিক কিংবা শ্রমিক অথবা ভোক্তার অধিকারের প্রকৃতি থেকে এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন[২১]

- কোন কিছুর সাথে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকবে;
- অধিকার আইন থেকে নিঃসৃত হওয়ায় তা আইন দ্বারা বঞ্চিত হবে। আইন অধিকারকে সুসংগঠিত করে। ব্যক্তি যখন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে আইনের আশ্রয় নেয়। কারণ আইন অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার অধিকার ভোগ করার সুযোগ প্রদানের জন্য অধিকার হরণকারীকে বাধ্য করে।
- নৈতিক অধিকার নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত যা কখনোই আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। উল্লিখিত অপর দুটি আদর্শের চেয়ে এটি সঙ্গতকারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক অধিকারকে সার্বজনীন অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ প্রত্যেক জাতির সকল মানুষই এক অভিন্ন মানবসত্তার অধীন। নৈতিক অধিকার এক ব্যক্তিকে যে অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে তা অন্য ব্যক্তির জন্যও উন্মুক্ত রাখে। পরবর্তীতে আমি নৈতিক অধিকারের ভিত্তি নামক অংশে নৈতিক অধিকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

অধিকারের প্রকার বা শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তবে কিছু অধিকার রয়েছে যা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেন। এরূপ কয়েকটি অধিকার হলো নেতিবাচক অধিকার, ইতিবাচক অধিকার, চুক্তিমূলক অধিকার, নৈতিক অধিকার। নিম্নে এসব অধিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হলো:

১.৩.৪.১ নেতিবাচক অধিকার: অধিকারের একটি বড় অংশই হলো নেতিবাচক অধিকার। এই অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অন্য কারোর যেকোনো হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ যদি আমার গোপনীয়তা রক্ষা করার বা ভোগ করার অধিকার থাকে তাহলে আমার মালিকসহ অন্য সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে আমার ব্যক্তিগত কাজে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। যদি আমার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সম্পত্তি ব্যবহার, বিক্রি অথবা নষ্ট করার অধিকার থাকে তাহলে অন্য প্রত্যেক

ব্যক্তির দায়িত্ব হলো আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার, বিক্রি অথবা নষ্ট করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা।[২২] এই বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়েও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৩.৪.২ **ইতিবাচক অধিকার:** বাস্তব জীবনে নেতিবাচক অধিকারের চেয়ে ইতিবাচক অধিকারের গুরুত্ব অনেক বেশি। ইতিবাচক অর্থে অধিকার বলতে বোঝায় ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ অথবা ভোগি করার জন্য অন্য সকলের দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তিকে সেই সুযোগ প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ যদি আমার আদর্শ জীবন পরিচালনার অধিকার থাকে তাহলে এর অর্থ এই নয় যে অন্যরা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বরং আমি যদি আদর্শ জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম না হই তাহলে আমাকে অবশ্যই আদর্শ জীবন পরিচালনা করার সুযোগ দিতে হবে। একইভাবে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার এমনকি সামাজিক নিরাপত্তাসহ সকল মৌলিক অধিকার যেগুলো সংরক্ষণে ব্যক্তি অসমর্থ হবে সেগুলো সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করবে। সতের এবং আঠারো শতকে ইশতেহার লেখকরা নেতিবাচক অধিকারের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। কিন্তু বিশ শতকে মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, জীবনের জন্য প্রয়োজণীয় সকল কিছু একজন ব্যক্তির নিজের চেষ্টায় অর্জন করা সম্ভব নয় তখনই তারা ইতিবাচক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ধারা জাতিসংঘের ঘোষণাকে প্রভাবিত করে যখন এটি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার অধিকার প্রদান করে। ইতিবাচক অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো জীবনের অধিকার যদিও আঠারো শতকে জীবনের অধিকারকে নেতিবাচক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[২৩] এই অধিকারটি তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৩.৪.৩ **চুক্তিভিত্তিক অধিকার:** চুক্তিভিত্তিক অধিকার (বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব) বলতে কতিপয় নির্বাচিত অধিকার ও তদসংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়, যেগুলোর উৎপত্তি তখনই ঘটে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সাথে কোনোরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোনো ব্যক্তি (কর্মচারী) অন্যকোনো ব্যক্তির (নিয়োগকর্তা) হয়ে কোনো কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হলো। এরূপ ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা কর্মচারীর দায়িত্ব এবং যথাযথভাবে কাজটি সম্পাদিত অবস্থায় পাওয়া নিয়োগকর্তার অধিকার। আবার ঐ কাজের বিনিময়ে বেতন পাওয়া কর্মচারীর অধিকার এবং বেতন প্রদান করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের নিম্নোক্ত নীতিগুলো জানা আবশ্যক:[২৪]

- চুক্তির ধরন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষেরই স্পষ্ট ধারনা থাকা আবশ্যক;

- কোনোপক্ষই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অন্যপক্ষের নিকট চুক্তির কোনো অংশের অপব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে না;
- চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য কাউকে কোনোরূপ বল প্রয়োগ করা যাবে না। উভয়পক্ষ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হতে হবে এবং
- চুক্তিতে এমন কিছু থাকতে পারবে না যা কোনো পক্ষকে কোনো অনৈতিক কাজ করতে উৎসাহিত অথবা বাধ্য করবে।

চুক্তিবদ্ধ অধিকারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন[২৫] ক) দু'টি পক্ষ থাকবে এবং উভয় পক্ষই চুক্তির শর্তানুযায়ী অধিকারকে বাস্তবায়ন করবে; খ) চুক্তি অনুযায়ী অধিকারের দাবি জানাতে পারবে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন চুক্তির বাইরের কোন দাবি অধিকার হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং গ) চুক্তিভিত্তিক অধিকার ঐসব নিয়ম-নীতি ও বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা সাধারণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

১.৩.৪.৪ নৈতিক অধিকারঃ নৈতিক অধিকার উৎসারিত হয় সমাজ বা সম্প্রদায়ের চেতনা বা বিবেকের উপর ভিত্তি করে। ফলে আইনগত অধিকার ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আইনগত অধিকার লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত শাস্তি পেতে হয় কিন্তু নৈতিক অধিকার লঙ্ঘন করলে শাস্তির কোন সুযোগ নেই। আবার নৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। যেমন বড়দের সম্মান করা, শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা ইত্যাদি নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের পরিপন্থি কাজ করলে কাউকে শাস্তি পেতে হয় না। আবার কিছু কাজ রয়েছে যা আইনগত ও নৈতিক উভয় ধরনের অধিকারকেই লঙ্ঘন করে। যেমন অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা বা চুরি করা বা ডাকাতি করা। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পেঁয়াজের কথা ধরা যাক। বর্তমান বিশ্বে এর মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও বাংলাদেশে এর মূল্য বৃদ্ধিতে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা আইন ও নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভোক্তা সাধারণের অধিকারকে হরণ করেছে। আবার কিছু অধিকার রয়েছে যা নৈতিক বা আইনগত কোন অধিকারকেই লঙ্ঘন করে না। যেমন 'ক' ও 'খ' নামক দু'টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'প' নামক পণ্যটি সিন্ডিকেট করার চুক্তি করে একে অপরকে প্রতারণা করেছে। এক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতারিত হয়েছে তার অধিকার লঙ্ঘন হলেও তা নৈতিক বা আইনগত কোন অধিকারই নয়। আবার অনেক কাজ আছে যা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও নৈতিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি তাঁর স্বীয় প্রয়োজনে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু অর্থ উত্তোলন করে নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানের

কাউকে না জানিয়ে বা কোন কর্মকর্ত-কর্মচারীকে অবগত না করে অর্থ ফেরত দেয়। এখানে যদিও কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তথাপিও তা নৈতিক অধিকারের লঙ্ঘন। আবার অনেক সময় নৈতিক অধিকারও আইনি অধিকারে পরিণত হতে পারে। যেমন বাংলাদেশে সরকারি চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব কোটা প্রথা বিদ্যমান ছিল তা সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ ও চাকুরি প্রত্যাশীদের দীর্ঘদিনের নৈতিক দাবিটি স্বার্থশূন্য ও নিরপেক্ষ হওয়ায় তা পরিবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক নির্বাহী আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সব কোটা রহিত বা বাতিল করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিলের প্রসঙ্গটি নৈতিক হলেও তা আইনি বৈধতা দেয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজ স্বীকৃত দাবিসমূহ হলো নৈতিক অধিকার। এ অধিকার ভোগ করার জন্য আইনের দারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ যদি এ অধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে আমরা তাকে ঘৃণা বা নিন্দা করতে পারি কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারি না। কিন্তু আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার জন্য রাষ্ট্র নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। এতক্ষণের আলোচনা থেকে নৈতিক অধিকার সম্পর্কে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(ক) নৈতিক অধিকার কর্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন 'এ' নামক কোন ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে 'বি' নামক কোন ব্যক্তির স্বার্থ হানি ঘটাতে পারবে না। কারণ'এ' নামক কোন ব্যক্তির দায়িত্ব হলো 'বি' নামক কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

(খ) নৈতিক অধিকার ব্যক্তির স্বশাসন নিশ্চিত করে। অর্থাৎ কোন কাজ নির্বাচন করা ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করার বিষয়টিকে গুরুত্ত্ব দিয়ে থাকে। যেমন আমি প্রার্থনা করি বলার অর্থ হলো প্রার্থনা করার জন্য আমি স্বাধীন এবং তা পালনে কোন ধরনের অনুমোতির প্রয়োজন নেই। এবং

(গ) নৈতিক অধিকার ব্যক্তি বিশেষের কাজ সম্পন্ন করা বা অন্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন আমার যদি কোন কিছু করার অধিকার থাকে তাহলে অন্যের নৈতিক কর্তব্য হলো উক্ত কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা।

১.৩.৫ কান্টের নীতিতত্ত্ব: অধিকার প্রয়োগ বা প্রতিষ্ঠার পেছনে নৈতিক ভিত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে প্রত্যেক মানুষেরই কতিপয় নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। এই দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে এটি বিবেচ্য নয় যে এর পরিণতি কি হবে কিংবা এর দ্বারা অন্যরা কিভাবে উপকৃত হবে। কান্টের এই নৈতিক তত্ত্বটি পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এর সারকথা কথা হচ্ছে মানুষ কোনো পরিণতি বা সুখের জন্য তার কর্তব্য পালন করবে না বরং কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করবে (Duty for

duty's sake)। অর্থাৎ কান্ট মানুষকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য বলেছেন এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পৃক্ততাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বুদ্ধিবৃত্তি হলো মনুষ্যত্বের একমাত্র ভিত্তি যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। কান্ট আরো দেখিয়েছেন যে, আমাদের সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলেই কেবল আমরা নৈতিক জগতের বাসিন্দা হতে পারি। কেননা আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে আমাদের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতা, প্রলোভন, মানুষের মর্যাদা, নির্বাচনের স্বাধীনতা, অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি রয়েছে। এসব বিষয়ের সাথে কামনা বাসনারও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে উল্লিখিত কাজ সম্পন্ন করি তখন কামনা বাসনা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই কান্ট মনে করেন, নৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে নিঃশর্ত নৈতিক আদেশ। নিঃশর্ত নৈতিক আদেশানুযায়ী, সকল মানুষ এক অপরকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করবে। তাই এমন কোনো কাজ করা যাবে না যা মানুষের স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বকে বাধাগ্রস্ত করে। কান্টের ন্যায় আরেকজন অস্তিত্ববাদী ফরাসি দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, চিত্রনাট্যকার জ্যাঁ পল সার্ত্রে মনে করেন, ব্যক্তি সাধারণত নিজের জন্য ভাল বিষয় নির্বাচন করে। কিন্তু বিষয়টি ভাল হিসেবে বিবেচিত হবে না যদি না তা সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। সার্ত্রের এই বক্তব্য কান্টের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ উভয় দার্শনিকই মানুষের মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও সর্বোপরি সার্বজনীনতা প্রদানের চেষ্টা করেন। সুতরাং মানুষ কোন বস্তু নয় যে তাকে ইচ্ছা মত ব্যবহার করা যাবে। তাই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করি সেক্ষেত্রে যেন মানুষের মতামত, পছন্দ বা অপছন্দ, মর্যাদার বিষয়টিকে সার্বজনীনরূপে গ্রহণ করি। এ কারণে কান্ট মনে করেন মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে যা কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলেই নৈতিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাজ নির্বাচন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমেরিকার সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও দর্শন বিভাগের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজসহ অন্যান্যরা তাঁদের Thinking Ethically: A Framework for Moral Decision Making নামক প্রবন্ধে কান্টের অধিকার সংক্রান্ত ধারণা পর্যালোচনা করে চার ধরনের অধিকারের কথা বলেন যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[২৬]

১.৩.৫.১ সত্য জানার অধিকার: আমাদের জীবনকে সঠিক ও যথথার্থভাবে পরিচালনা করার জন্য সত্য জানার অধিকার আছে। কারণ তা আমাদের পছন্দের বা নির্বাচনের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। তাই একটু দেরিতে হলেও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকারও তথ্যকেন্দ্র চালু করেছেন যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সবার জন্য সুবিধা হয়। অর্থাৎ তথ্য গোপন থাকলে নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করা

যায় না। যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার সুবিধার্থে ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদান করে থাকে যেখানে কোন ধরণের লুকায়িত মাশুল পরিশোধের বিষয়টি উল্লেখ থাকে না। প্রকৃত পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রাহকদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে থাকে যা অপরাধ ও অনৈতিক। কারণ তথ্যগুলো ভালভাবে সবার জন্য উন্মোচিত হয়নি বলে সবারই প্রতারিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তথ্যটি সুন্দরভাবে দৃশ্যমান থাকলে ক্রেতাসাধারণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সুযোগ পেত এবং পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরাধ ও অনৈতিক অবস্থান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারত। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে পড়বে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য বা নিয়মাবলী প্রকাশ করতে হবে যেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীগণ সঠিক তথ্য জেনে সঠিট সিদ্ধান নিতে পারেন। সঠিক তথ্য অধিকার প্রাপ্ত হলে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ স্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচন করে নিজেদের জীবনকে সঠিক, সুন্দর ও স্বার্থকভাবে পরিচালন করে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। তাই সত্য জানার অধিকার মানুষের জন্য অপরিহার্য।

১.৩.৫.২ গোপনীয়তার অধিকারঃ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করা, স্বাধীনভাবে কথা বলা, কর্ম নির্বাচন করার স্বাধীনতা রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এসব বিষয়ের উপর চর্চা করতে গিয়ে কাউকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। অর্থাৎ আমরা নিজের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন হব তেমনি অন্যের অধিকারকে সম্মান করব। নিজের বিশ্বাসকে অন্যের বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা সমীচীন নয়। যেমন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে একজনের বিশ্বাসের মাধ্যমে যেন অন্যজনের বিশ্বাস বা ধর্মের উপর আঘাত না হানে সেজন্য আইন রয়েছে। পাকিস্তানে এইরূপ আইন ব্লাসফেমি (Blasphemy) আইন হিসেবে পরিচিত যা লঙ্ঘন করলে মৃত্যু দণ্ডের সম্ভাবনা থাকে।

১.৩.৫.৩ হতাহত না হওয়ার অধিকারঃ আমাদের অন্যের দ্বারা আহত না হওয়ার অধিকার রয়েছে। এর অর্থ হলো অন্যরা আমাকে আহত বা আঘাত দিবে না যা বিপরীভাবেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমিও কাউকে আঘাত দিব না। ফলে আমি এমনভাবে কাজ করব যেন কেউ আমাকে বাধ্যতামূলকভাবে আঘাত করতে না পারে। কিন্তু আমি যদি স্বেচ্ছায় এমন কিছু কাজ করি যার ফলশ্রুতিতে আঘাত প্রাপ্ত হই তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে কাউকে দায়ি করা যাবে না। যেমন কেউ যদি স্বেচ্ছায় আগুনে হাত দেন তাহলে তিনি হতাহত হওয়ার সুযোগ রয়েছে যা ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে উক্ত কাজটি নির্বাচন করায় এক্ষেত্রে কাউকে দায়ি করা যাবে না। আবার কেউ যদি স্বেচ্ছায় নদীর পানিতে ঝাঁপ দেন তাহলে তাঁরও হতাহত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তিনি কি করছেন এবং তা তিনি স্বেচ্ছায় করছেন। আবার ৫৯ বছর বয়সী স্টিফেন গোলাব নামক একজন পোলান্ডের

অধিবাসী যিনি ১৯৮১ সালে আমেরিকার অভিবাসী ছিলেন এবং ভিসার মেয়াদ উত্তর্ণী হওয়ার পরও অবৈধভাবে আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। তিনি Film Recovery Systems (FRS)র একজন কর্মচারী ছিলেন যার ইংরেজি ভাষায় কোন দক্ষতা ছিল না। সায়ানাইড সেদ্ধ করা চৌবাচ্চাটি পরিষ্কার করাই ছিল তাঁর কাজ। পরিষ্কার করার সময় সায়ানাইড সেদ্ধ করা চৌবাচ্চা থেকে বিষাক্ত বিষক্রিয়া প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছিলেন যার পরিণতিতে তিনি প্রায় ২ মাস চাকুরি করার পর তীব্র সায়ানাইড বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। কুক কান্ট্রির আদালত বলেন, প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহীগণ বিপজ্জনক ও নিরাপদহীন কাজের পরিবেশ বিদ্যমান রাখায় স্টিফেন গোলাবের ন্যায় কর্মচারীর মৃত্যু হয় যা একটি অনৈচ্ছিক হত্যাকাণ্ড বলে আদলতের রায় বলা হয়। আদালত FRS-এর প্রেসিডেন্ট স্টিভেন জে. ও'নেইল, প্ল্যান্ট সুপারভাইজার চার্লস ক্রিচবম, প্ল্যান্ট ফোরম্যান ড্যানিয়েল রুড্রিগকে স্টিফেন গোলাবের হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে। স্টিফেন গোলাবের মৃত্যুর জন্য প্রতিষ্ঠান এবং উপরে উল্লিখিত তিনজন নির্বাহীকে নৈতিকভাবেও দায়ি করা যায়। যার কারণগুলো হলো: (ক) এই কাজটি যে জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্টিফেন গোলাবকে জানানো হয়নি; (খ) স্টিফেন গোলাব ইংরেজি ভাষা বুঝতেন না এবং প্রতিষ্ঠানও তাঁকে অবহিত করার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি; (গ) স্টিফেন গোলাবের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া বা মৃত্যু সংঘটনে সহায়তা করা বা মৃত্যু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদাসীনতা প্রদর্শনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; (ঘ) উক্ত কাজটি যে জীবনের জন্য আশঙ্কাজনক তা প্রতিষ্ঠান ভালভাবেই অবহিত ছিল; এবং (ঙ) প্রতিষ্ঠানটি তার স্বীয় স্বার্থের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অধিক মুনাফা লাভের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্টিফেন গোলাবের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করেছে।[২৭] এসব বিষয় বিবেচনা করে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, স্টিফেন গোলাব হত্যায় প্রতিষ্ঠান ও তার ব্যবস্থপনা বিভাগ নৈতিকভাবে দায় এড়াতে পারে না যে কারণে উক্ত নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে বিজ্ঞ আদালত খুনি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

১.৩.৫.৪ পূর্বে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ের উপর অধিকার: পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমরা যদি সম্পূর্ণ অবগত হয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সম্মিলিতভাবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই তাহলে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক সদস্যের অধিকার বাস্তবায়নে অন্যের ভূমিকা অবশ্য পালনীয় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক সদস্যের অধিকার জন্মানোর কারণে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষ জাতি হিসেবে আমরা যেহেতু সবাই একই শ্রেণিভুক্ত তাই কোন ব্যক্তিকে যদি স্বার্থ সিদ্ধির ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে সমগ্র মানব জাতির মর্যাদাকেই বিনষ্ট করে এবং তা হবে অন্যায়, মন্দ, নিন্দনীয়, খারাপ ও দোষণীয়।

১.৩.৬ ন্যায়পরতা: ইংরেজি 'Justice' শব্দটিকে অনেকেই বাংলায় 'ন্যায়', 'ন্যায়পরতা', 'ন্যায়পরায়ণতা' হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবহারে শব্দগত পার্থক্য ছাড়া অন্যকোন মৌলিক পার্থক্য না থাকায় ভাষাকে সহজ, সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল করার নিমিত্তে এই অভিসন্দর্ভে ইংরেজি 'Justice' শব্দটির বাংলা হিসেবে 'ন্যায়', 'ন্যায়পরতা', 'ন্যায়পরায়ণতা' শব্দত্রয়কে ব্যবহারে সচেষ্ট হব। যেসব মানদণ্ডের আদর্শনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের মধ্যে ন্যায়পরতার ধারণা অন্যতম। আদর্শনিষ্ঠ হিসেবে এসব মানদণ্ড একটি আদর্শের আলোকে কোন বিষয়কে মূল্যায়ন বা অনুমোদন করে। ব্যবসায়ের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন প্রশ্ন হলো মানদণ্ড হিসেবে ন্যায়পরতা ব্যবসায়ের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত? একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কৌশলগতভাবে শ্রমিকদেরকে অধিক কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিকেরা এমন পরিবেশে কাজ করে যা তাদের জন্য কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু শ্রমিকেরা এসব কাজ করে থাকে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য। কিন্তু তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অমানবিক পরিশ্রম করতো না যদি তাদের জীবিকা অর্জনের বিকল্প পথ থাকতো। শ্রমিকদের এমন কাজের পক্ষে মালিকদের যুক্তি হলো যেহেতু তাদের কাজের ফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সুবিধা পায় তাই তাদের কাজ করানোর পক্ষে ন্যায্যতা রয়েছে। যুক্তিটি উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ। কিন্তু এখানে অন্যায্য বিষয়টি হলো কৌশলগতভাবে শ্রমিকদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা। শ্রমিকদের প্রতি আরেকটি অন্যায় আচরণ হলো শ্রমিকেরা কাজের বিনিময়ে যথার্থ পারিশ্রমিক পায় না। যেমন একজন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিতে কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে তার সব কিছু নির্ধারিত হবে। নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সে নির্দিষ্ট মজুরি পাবে। কাজ সম্পাদনের পর তাকে মজুরি প্রদান করাই হলো ন্যায়। কিন্তু কাজের পর যদি সে যথার্থ মজুরি না পায় তাহলে তা হবে অন্যায্য। বর্তমান সময়ে এমন ঘটনা আমাদের সমাজে প্রায়ই ঘটে থাকে। যেমন বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন প্রতিমাসের পনেরো তারিখের পর দেয়া হয়। অর্থাৎ এক মাস পরিপূর্ণভাবে কাজ করার পর পরবর্তী মাসের পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রদান করা হয়। এটি মালিকদের একটি কৌশল। কারণ এ সময় যদি কোন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে চায়

তাহলে তাকে পনেরো দিনের পারিশ্রমিক মালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হবে যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না বরং অন্যায্য ও অনৈতিক।

ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অথনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ন্যায়পরতার ধারণা হলো একটি আদর্শনিষ্ঠ ধারণা। এরূপ প্রকৃতির কারণে ন্যায়পরতাকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করাও কঠিন। কারণ ন্যায়পরতার বিষয়টি কখনো ন্যায়-অন্যায়, কখনো মঙ্গল-অমঙ্গল, কখনো সামাজিক নিয়মের সাথে, কখনো নৈতিক যুক্তির সাথে, কখনো আইনের সাথে জড়িত। এ দিক বিবেচনা করে স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড ডেইচেজ রাফায়েল তাঁর *Problems of Political Philosophy* গ্রন্থে বলেন, "Justice is a complex concept."[২৮] অর্থাৎ ন্যায়পরতার বহুবিধ অর্থের কারণে তিনি ন্যায়পরতাকে একটি জটিল ধারণা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ন্যায়পরতাকে ব্যাখ্যা করায় উক্ত ধারণাটি একটি জটিল ধারণা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই জটিলতার তিনটি কারণের কথা ভারতের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জগদিশ. সি. জোহারী তাঁর *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends* গ্রন্থে বলেছেন যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:[২৯]

- বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি এটাকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন কখনো ন্যায্যতা অর্থে, কখনো সমাজের রীতি-নীতি অর্থে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি;
- সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ন্যায়ের ধারণার অর্থও পরিবর্তিত হয়। যেমন- অতীতে যেটা ন্যায় বলে বিবেচিত হতো বর্তমানে সেটা অন্যায় বলে বিবেচিত হয় বা এর বিপরীত ধারণাও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন প্রাচীন গ্রিসে এক সময় নারী ও দাসদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার ছিল না যা ঐ সময়ের জন্য ন্যায় ছিল কিন্তু বর্তমানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাই হলো ন্যায় ;
- ন্যায়ের বিমূর্ত ধারণার সাথে এর মূর্ত প্রকাশের সমন্বয়ের জটিলতা।

অনেক দার্শনিক ন্যায়পরতার ধারণাকে 'গুণ' সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ন্যায়পরতা বলতে সাধরণত অন্যের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকা, নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা, সৎভাবে চলা, অপরের ঋণ পরিশোধ করা, দয়া দেখানো, প্রভৃতি গুণকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে ন্যায়পরতা হলো মহৎ এবং উত্তম গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি গুণ যা 'সততা' নামক গুণের মাধ্যমে পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া প্লেটো তাঁর *The Republic* গ্রন্থে ন্যায়পরতাকে ব্যক্তির সামাজিক ব্যবহারের ঔচিত্য, অনৌচিত্য নীতিবোধক বলে অভিহিত করেন।[৩০] গ্রিক দার্শনিক

এরিস্টটলও তাঁর *Nicomachean Ethics* গ্রন্থে ন্যায়পরতাকে সকল সদগুণের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করেন।[৩১] অর্থাৎ সদগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অন্যের অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে। এক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক নীতিদার্শনিক জন রলসও ন্যায়পরতাকে গুণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থে বলেন, "Justice is the first virtue of social institutions,…."[৩২] অর্থাৎ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম সদগুণ হলো ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতার ধারণা সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে আমরা দার্শনিক এরিস্টটলের কথা বলতে পারি। কারণ তিনি ন্যায়কে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করেছেন যা বণ্টনধর্মী বা বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই সম্পর্কে অধ্যাপক জোহারী বলেন, "… the idea of Aristotle came to lay down the foundation of, what is now called, the doctrine of distributive justice."[৩৩] অর্থাৎ ন্যায়পরতা সম্পর্কে এরিস্টটল থেকে যে ধারণাটি বিস্তৃত লাভ করেছিল তা ন্যায়পরতার বণ্টনমূলক মতবাদের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। কারণ এরিস্টটলের পূর্বে ন্যায়পরতার বণ্টন সংশ্লিষ্ট আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি বলে অনেকে তাঁকে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার জনক বলে অভিহিত করেন। বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা বলতে তিনি অর্জিত সুবিধাকে সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষম বণ্টন করাকে বুঝিয়েছেন।[৩৪] অর্থাৎ এরিস্টটল মনে করেন, সম্পদের বণ্টনের মধ্যে যদি অসমতা বিদ্যমান থাকে তাহলে সেখানে ন্যায়পরতা বিঘ্নিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে যা আমি আমার অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। জন রলসও বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তিনি বলেন, সমাজের চাহিদার সঙ্গে বণ্টনের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত[৩৫] যা আমি আমার অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষ যেমনভাবে সম্পদের বণ্টন নির্ধারণ করবে বণ্টন তেমন হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজে যেন বৈষম্য সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার ধারণাটির আবির্ভাব ঘটে।

বণ্টনমূলক ন্যায়পরতার ধারণাকে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কর হয়েছে। এসব ধারার মধ্যে অন্যতম হলো সমবণ্টনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন সমবন্টনবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের সাথে মানুষের এমন কোন প্রাসঙ্গিক পার্থক্য নেই যার উপর ভিত্তি করে অসম বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা যেতে পারে। এ কারণে সমবন্টনবাদীরা মনে করেন, সমাজের সকল সুবিধা বা কল্যাণ বা মঙ্গল এবং অসুবিধা বা অকল্যাণ বা অমঙ্গল সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সম পরিমাণে বণ্টন করা উচিত। অর্থাৎ সমবন্টনবাদীরা মনে করেন, কিছু মৌলিক বিষয়ে সকল মানুষ সমান এবং প্রত্যেকেরই সমাজের সম্পদে সমান দাবি রয়েছে।

ন্যায়পরতা সম্পর্কে পুঁজিবাদের মূলকথা হলো সমাজের সকল সম্পদ বণ্টন করা হবে ব্যক্তির অবদানের উপর ভিত্তি করে। এ কারণে ন্যায়পরতা সম্পর্কে পুঁজিবাদী মতকে অবদানের নীতিও বলা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি যে পরিমাণ কাজ করবে তাকে সেই পরিমাণেই পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। ন্যায়ের পুঁজিবাদী মত অনুসারে মানুষ যখন পণ্য বিনিময় করে তখন তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিনিময় করা পণ্যের মূল্যমান অবশ্যই সমান হবে। ন্যায়পরতা দাবি করে যে, একজন ব্যক্তি সেই পরিমাণেই গ্রহণ বা ভোগ করবে যে পরিমাণে সে অবদান রাখবে। এই নীতিটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তা মানুষের কাজকে তরান্বিত করতে উৎসাহিত করে এবং মানুষের মর্যাদা কর্মোদ্যম ও সৃশনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ মানুষ তখন অধিক প্রাপ্তির আশায় অধিক পরিমাণে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। ফলে অবদানের নীতি শ্রমিকদের মধ্যে একটি অসহযোগিতাপূর্ণ এমনকি প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে যেখানে সম্পদ এবং তথ্যের অংশীদারিত্ব খুব কমই হয় এবং ব্যক্তির একটি ভিন্ন মর্যদার সূচনা হয়।[৩৬]

ন্যায়পরতা সম্পর্কে আরেকটি মত হলো সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। অর্থাৎ পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়পরতা হলো অবদান ভিত্তিক যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে ন্যায়পরতা হলো প্রয়োজন ভিত্তিক। এই ধারণা সর্বপ্রথম প্রচার করেন ফরাসি রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তা লুইস জ্যাঁ যোসেফ চার্লস ব্ল্যাংক এবং পরবর্তীতে এই ধারণার বিকাশ ও অগ্রগতিতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও রাশিয়ার রাজনীতিবিদ ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাই লেনিন।[৩৭] ন্যায়ের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বলা হয়, “Work burdens should be distributed according to people’s abilities, and benefits should be distributed according to people’s needs.”[৩৮] অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজের দায়িত্ব তাঁর সামর্থ্যানুযায়ী বণ্টিত হবে এবং সুবিধা বণ্টিত হবে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে। এক কথায় ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুসারে কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সুবিধা পাবে। ন্যায়পরতার মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, বুর্জোয়াদের স্বার্থই রক্ষা করাই হলো পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ নয়। এ জন্য তিনি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিরা যে উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগ করে এটা এক ধরনের ডাকাতি তবে এটি অন্যায় নয়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোই এমন যে, এখানে যে উদ্বৃত্ত মূল্য থাকবে তা পুঁজিপতিরা ভোগ করবে যা শ্রেণির ধারণাকে বিকশিত করে সমাজে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে যথাযথ বা সুষম বণ্টনের মাধ্যমেই কেবল রাজনৈতিক বৈষম্য, অসমতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি দূর করে সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উপরে আলোচিত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ক্রুটিমুক্ত নয়। যেমন সমবণ্টবাদীদের বক্তব্য যদি মেনে নেই তাহলে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যহত হয়। কারণ তাঁরা যেভাবে সব মানুষকে সমানভবে সুবিধা প্রধানের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে তা যৌক্তিক নয়। কেননা সমাজের সব মানুষই সমান যোগ্যতা সম্পন্ন নয় এবং অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ তাঁদের সৃজণশীলতা ও কাজের গতিকে হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে যা প্রকারান্তরে সমাজেরই ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান অন্তরায় হলো এই দৃষ্টিভঙ্গি অবদানের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে সমাজের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বিভেদ তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। আবার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টভঙ্গি প্রয়োজনের নীতিকে অধিক গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মানুষকে কর্মবিমুখতার দিকে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ পরিশ্রম না করেও যেহেতু প্রয়োজন মিটানো যায় তাই পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ কাজে মনোযোগ ও আগ্রহ হারায় যার পরিণতি হতে পারে কর্মবিমুখিতা।

ম্যানুয়াল জি ভেলাসকোয়াজ তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে দাবি করেন যে, ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচরণের ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা আনয়নে কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে তিনটি পর্যায়ে ভাগে করে আলোচনা করা হয়েছে যা বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা, প্রতিশোধমূলক বা প্রতিশোধাত্মক ন্যায়পরতা এবং ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায়পরতা হিসেবে পরিচিত। বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা হলো ন্যায়পরায়ণতার প্রথম এবং মৌলিক পর্যায় যা মনে করে সমাজের সকল সুবিধা এবং অসুবিধার সুষ্ঠু বণ্টনই হলো ন্যায়। অর্থাৎ সমাজের মঙ্গল, কল্যাণ ও দায়িত্বের সঙ্গে বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা জড়িত। যেমন ‘ক’ নামক কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ‘প’, ‘ফ’, ‘ব’, ‘ভ’ এবং ‘ম’ নামক কতিপয় কর্মচারী কর্মরত আছেন। ‘ক’ নামক কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো ‘প’, ‘ফ’, ‘ব’, ‘ভ’ এবং ‘ম’ নামক কর্মচারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ বণ্টন ও পারিশ্রমিক প্রদান করা। প্রতিশোধমূলক বা প্রতিশোধাত্মক ন্যায়পরতা হলো ন্যায়পরায়ণতার দ্বিতীয় পর্যায় যা দণ্ডাদেশ এবং শাস্তি আরোপকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ প্রতিশোধমূলক বা প্রতিশোধাত্মক ন্যায়পরতা অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শাস্তি বা জরিমানাকে উৎসাহিত করে। যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন ইটভাটার মালিকগণ কর্মচারীদেরকে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করে কাজ আদায় করে থাকেন। আবার শ্রমিকদের দ্বারা খাদ্যে ভেজাল মেশানো বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করতে বাধ্য করার কারণে মালিক পক্ষকে উপযুক্ত শাস্তি ও জরিমানার বিষয়টি প্রতিশোধমূলক বা প্রতিশোধাত্মক ন্যায়পরতার সাথে সম্পৃক্ত। ন্যায়পরায়ণতার সর্বশেষ পর্যায় হলো ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায়পরতা। অর্থাৎ অন্যের প্রতি অন্যায্য আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার সঙ্গে ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায়পরতা জড়িত। যেমন বাংলাদেশের গণপরিবহন গ্রিন লাইন বাস কোম্পানির

বাসের চালক কবির হোসেন গত ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিলে রাজধানী ঢাকার মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ধোলাইপাড় প্রান্তে বেপরোয়া গতিতে বাস চালিয়ে একটি মাইক্রোবাসকে পেছন দিক দিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। মাইক্রোবাসের চালক রাসেল গ্রিন লাইন বাসের চালক কবিরের নিকট ধাক্কা দেয়ার কারণ জানতে চাওয়ার এক পর্যায়ে বাসের চালক কবির ইচ্ছাকৃতভাবে রাসেল সরকারের শরীরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়। গ্রিন লাইন বাসের চালক কবিরের এই অন্যায্য আচরণের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পা হারানো মাইক্রোবাস চালক রাসেলকে জরিমানা হিসেবে পঞ্চাশ লাখ টাকা প্রদানসহ রাসেলর ক্ষতিগ্রস্ত ডান পায়ের চিকিৎসা ও বাম পায়ের কৃত্রিম পা প্রতিস্থাপনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রিন লাইন বাস কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত।[৩৯]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ন্যায়পরতার তত্ত্বটি বিভিন্নভাবে ত্রুটিযুক্ত হলেও তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়, শিক্ষা, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি ধারণাগুলো মূল্যায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে বলে আজও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আচরণকে মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে। ব্যবহৃত মানদণ্ডসমূহ এককভাবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কারণ মানদণ্ডসমূহ সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে উপরে আলোচিত মানদণ্ডসমূহের মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদ ও আত্মবাদ চরমভাবাপন্ন মতবাদ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকার তত্ত্ব ও ন্যায়পরতার তত্ত্বের সংমিশ্রণে বৃহত্তর আঙ্গিকে গ্রহণ করে আমি আমার অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করব যে, টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, একক কোন নৈতিক মানদণ্ডের মাধ্যমে ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আচরণ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় এবং যদি একক মানদণ্ড ব্যবহার করি তাহলে তা আপেক্ষিকতাবাদ ও আত্মবাদের ন্যায় চরমভাবাপন্ন মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

১. Desjardins, J. (2009), *An Introduction to Business Ethics*, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, p.18.

২. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 8.

৩. *Ibid.* pp. 9-10.

৪. Desjardins, J., op. cit., p.24.

৫. Rachels, J. (2003), *The Elements of Moral Philosophy*, 4th ed., New York: McGraw-Hill Companies, pp. 18-19.

৬. Bhuiyan, Md. Nazim Uddin (2015), *Introduction to Business and Business Administration: Concepts and Text*, 3rd ed., Bangladesh: NaSyPeC Publications, p. 24.

৭. Velasquez, M. G., op. cit., p. 39.

৮. *Ibid.*, pp. 39-41.

৯. Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), *Business Ethics*, 2nd ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, p. 27.

১০. Hobbes, T. (1971), *Leviathan: OR The Matter, Forme and Power of A Commonwealth Ecclesiaticall and Civil*, Edited by Michael O., London: Coller-Macmillan Ltd., pp.98-101.

১১. খান, গালিব আহসান (২০১৭), *প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.৬১-৬২।

১২. *Ibid*, পৃ.৬২-৬৩।

১৩. *Ibid.*, পৃ.৬৩-৬৪।

১৪. Mill, J. S. (1964), *Utilitarianism*, Liberty, Representative Government, London: Everyman's Library, p. 6.

১৫. Velasquez, M. G., op. cit., p. 63.

১৬. Harris, Jr. C. E., Pritchard M. S. and Rabins M. J. (2005), *Engineering Ethics: Concepts and Cases,* 2nd ed., Bangalore: Eastern Press Pvt. Ltd., p. 81.

১৭. ঢালী, আব্দুল হাই (১৩৯২ বঙ্গাব্দ), *নীতিবিদ্যা: আদর্শনিষ্ঠ ও পরানীতিবিদ্যা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: পুথিঘর লিঃ, পৃ.৩৫-৩৬।

১৮. Velasquez, M. G., op. cit., pp. 64-65.

১৯. মজুমদার, বদিউল আলম (২০১৪), "একজন শ্রমিকের জীবনের মূল্য কত?", *দৈনিক প্রথম আলো*, বৃহস্পতিবার, ১ মে, পৃ. ১৩।

২০. Velasquez, M. G., op. cit., p. 72.

২১. *Ibid.*, pp. 74-75.

২২. *Ibid.*, p 76.

২৩. *Ibid.*

২৪. *Ibid.*, p. 78.

২৫. *Ibid.*, pp. 77-78.

২৬. https://www.academia.edu/1235634/Thinking_ethically Accessed on 10.20 p.m., Dated on 10.11.2019.

২৭. Velasquez, M. G., op. cit., p. 42.

২৮. Raphael, D. D. (1970), *Problems of Political Philosophy*, London, Basingstoke: Macmillan and Co. Ltd., p. 165.

২৯. Johari, J. C. (1995), *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends,* New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, p. 338.

৩০. *The Republic of Plato* (1945), trans. by Conford, F. M., New York: Oxford University Press, p. 1.

৩১. বেগম, হাসনা (২০০৬), *এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ন এথিক্স* (অনূদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, পৃষ্ঠা ১১ (অনুবাদকের ভূমিকা)।

৩২. Rawls, J. (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, p. 3.

৩৩. Johari, J. C., op. cit., p. 343.

৩৪. খান, আখতার সোবহান (২০০৮), *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি প্রেস, পৃষ্ঠা ৪।

৩৫. Rawls, J., op. cit., p. 3.

৩৬. Velasquez, M. G., op. cit., pp. 89-92.

৩৭. *Ibid.*, p. 92.

৩৮. *Ibid.*, p. 92.

৩৯. "রাসেলকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিল গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষ" (২০১৯), *দৈনিক যুগান্তর*, বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল, পৃ. ১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয়ের জন্যই লাভজনক

২.১ ভূমিকা: বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে তেমনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের সাথে সামাজিক সম্পৃক্ততাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের সম্পৃক্ততা সমাজের জন্য নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক দুই-ই হতে পারে। এইরূপ কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে যার মধ্যে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility বা CSR) বা সিএসআর একটি অন্যতম বিষয়। এ কারণে বলা যায় যে, “The term “corporate social responsibility” or CSR has become the favorite term both of many corporate critics and of many within corporations.”[১] কেউ কেউ যেমন সিএসআর-এর পক্ষে তাদের যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করে থাকেন তেমনি কেউ কেউ আবার সিএসআর-এর বিপক্ষে তাদের বক্তব্য যৌক্তিক আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ফলে এই প্রত্যয়টি বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে নিয়েছে। এক সময় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আর্থিক মুনাফা অর্জন। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের পরিক্রমায় এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জন ছাড়াও সমাজের সকল অংশিজনদের (Stakeholder) প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত এ সকল দায়বদ্ধতাকে সিএসআর-এর কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত করছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মনে করে, সিএসআর-এর সুবিধাসমূহ শেয়ারমালিক (Stockholder) ও অংশিজন উভয়ই প্রাপ্য। সুতরাং প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএসআরকে সমাজের জন্য লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার পাশাপাশি নিজেদের জন্যও লাভজনক হিসেবে বিবেচনা করছে যা বিচারমূলক আত্মস্বার্থ বা সচেতন আত্মস্বার্থ বা স্ব-অর্জিত স্বার্থ (Enlightened self-interest) নামে পরিচিত যা ‘ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয়ের জন্যই লাভজনক’ (Win-win situation) হিসেবে বিবেচিত। সিএসআর সংক্রান্ত আলোচনা মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রথমত: সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন দায়বদ্ধতা আছে কি? যদি উত্তরটি সদর্থক হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন ধরনের দায়বদ্ধতা রয়েছে? তৃতীয়ত: সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোজার চেষ্টা করব এবং দেখানোর চেষ্টা করব যে সিএসআর-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও ভোক্তা উভয়ই লাভবান হতে পারেন।

২.২ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: সিএসআর ধারণাটি বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে পরিচিতি লাভ করে।[২] আমেরিকার খ্যাতনামা লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক ও সোসাইটি ফর বিজনেস এথিক্সের (Society for Business Ethics) সাবেক নির্বাহী পরিচালক জন রেমন্ড বোটরাইট এবং ভারতের জাবির ইনস্টিউট অব ম্যানেজম্যান্টের (Xavier Institute of Management) জেনারেল ম্যানেজম্যান্ট স্ট্রেটেজিক ম্যানেজম্যান্টের (General Management and Strategic Management) স্বনামধন্য অধ্যাপক বিভু প্রসন পাত্র তাঁদের *Ethics and the Conduct of Business* গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ করে ১৯৫০ সালের দিকে এই প্রত্যয়টি সময়ের বিবর্তন ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় বলে মনে করেন।[৩] ধারণাটি বর্তমানে ব্যবসায়, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এটিকে সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবেও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সময়ভেদে সিএসআর-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উৎপত্তি ও বিকাশের এই ক্রমধারাকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৪]

২.২.১ ১৯৫০-এর দশকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ইতিহাসে আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং গ্রিনেল কলেজর সভাপতি ও অধ্যাপক হাওয়ার্ড রোথম্যান বাওয়েন ১৯৫৩ সালে প্রথমবারের মতো 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ধারণাটি তাঁর "Social Responsibilities of the Businessman" প্রবন্ধে আলোচনা করেন। 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' সম্পর্কে বাওয়েন বলেন, "… it refers to the obligations of businessmen to purpose those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society."[৫] বাওয়েনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে তিনি সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা সমাজের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের নীতিমালা, ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত ও ব্যবসায়ের কর্মধারা নির্ধারণ করেন এবং সে অনুযায়ী সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা পালনে সচেষ্ট হন। বাওয়েন বিশ্বাস করতেন যে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড জনগণের জীবনমানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

ঐ সময়ের আরেকজন স্বনামধন্য চিন্তাবিদ আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলসের ডিন ও পিট্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসনের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং দ্য সোসাইটি ফর বিজনেস এথিক্সের (The Society for Business Ethics) সভাপতি উইলিয়াম ক্রিটেনডেন

ফ্রেডরিকও এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে অবদান রেখেছেন। ফ্রেডরিক মনে করেন সমাজের অর্থনীতি, মানব সম্পদ প্রভৃতির ব্যবহার ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থে সীমিত না রেখে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল বা কল্যাণে সদ্ব্যবহার করাই 'সামাজিক দায়বদ্ধতা'।[৬] এই বক্তব্যে তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা: (ক) কর্পোরেট ব্যবস্থাপকগণ জনসাধারণের ট্রাস্টি (Trustee - সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই ট্রাস্টি বা Trustee হিসেবে পরিচিত) হিসেবে কাজ করবে; (খ) কর্পোরেট সম্পদের উপর দাবিকৃত বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে এবং (গ) মানব কল্যাণমূলক কাজ যেন ব্যবসায়ের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[৭]

২.২.২ ১৯৬০-এর দশকে মানবকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: এই দশকে সিএসআরকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও মানবকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে সিএসআর-এর অব্যাহত যাত্রা লক্ষ্য করা যায়। সিএসআরকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে আমেরিকার এরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থপনার উনিশতম প্রেসিডেন্ট কিথ ডেভিস তাঁর Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? প্রবন্ধে বলেন, "...businessmen's decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm's direct economic or technical interest."[৮] ডেভিসের বক্তব্যে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অর্থনৈতিক বা কারিগরি স্বার্থের পাশাপাশি অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অন্যান্য মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। সমসাময়িক চিন্তাবিদদের মধ্যে আমেরিকার ফলপ্রসূ গবেষক সি. সি. ওয়াল্টনের অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে প্রতিষ্ঠান ও জনগণ উভয়ই নিজ নিজ লক্ষ্য অন্বেষণ ও পূরণে নিয়োজিত।[৯] এছাড়াও এই দশকে আরেকজন খ্যাতিমান নোবেলজয়ী আমেরিকার অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি সিএসআরকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। তিনি বলেন, "... business has no social responsibilities other than to maximize profits."[১০] তাঁর বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তিনি ব্যবসায়ের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন অনুসরণ করে সমাজের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশিজনেদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে সিএসআর পালন করা যেতে পারে।

২.২.৩ ১৯৭০-এর দশকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার দ্রুতবর্ধনশীলতা: ১৯৭০-এর দশকে সিএসআর-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যেমন কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা (Corporate Social Responsiveness), কর্পোরেট আচরণ (Corporate behaviour) এবং কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন (Corporate Social Performance)। কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা বলতে বোঝায় চাহিদা বা প্রত্যাশা পূরণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্ধিত আচরণকে। যেমন সমাজের চাহিদানুযায়ী পরিবেশের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এখন সবুজ ব্যবসায়ের (Green business) প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছে। ব্যবসায়ীদের এই পরিবর্তিত আচরণই কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা। পক্ষান্তরে, কর্পোরেট আচরণ বলতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের সদস্যবৃন্দ কীভাবে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, আইনগত নিয়মকানুন, নৈতিক নীতিমালা প্রভৃতি অনুসারে একে অপরের সাথে আচরণ বা মিথষ্ক্রিয়ার মূল্যায়ন। অন্যদিকে, কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন বলতে ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের লক্ষ্যে গৃহীত নীতি, সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতার ‘প্রক্রিয়া’ এবং কর্পোরেট আচরণের ‘ফলাফল’কে বোঝায়।

সত্তর এর দশকের শুরুর দিকে মিল্টন ফ্রিডম্যান ‘সিএসআর’কে স্রেফ মুনাফা সর্বাধিকরণের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে ব্যবসায়ীদের কেবলমাত্র সামজিক দায়বদ্ধতা হচ্ছে কোনো প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না হয়ে নিয়মের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন করা বা অধিক মুনাফা অর্জন করা। মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের বহু পণ্ডিত এই দশকে সিএসআর-এর পরিমার্জিত ধারণা প্রদান করেন। যেমন আমেরিকার প্রসিদ্ধ গবেষক ও লেখক এইচ. এল. জনসন এটিকে ‘প্রজ্ঞাময়’ কাজ হিসেবে অভিহিত করেন। পরবর্তীতে অপারেশন্স ম্যানেজম্যান্টের অধ্যাপক এবং আমেরিকার ডালাসে অবস্থিত টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টেলিজেন্ট সাপ্লাই নেটওয়ার্কসের (Center for Intelligent Supply Networks) পরিচালক সুরেশ পি শেঠি কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন এবং কর্পোরেট আচরণের মাধ্যমে সিএসআরকে ব্যাখ্যা করেন।

১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে আমেরিকার অন্যতম সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের বারুচ কলেজের স্কুল অব বিজনেস এণ্ড পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের ডিন এইচ. ইলবার্ট ও বারুচ কলেজের মার্কেটিং অনুষদের সদস্য আই. রবার্ট পার্কেট আমেরিকার সমাজে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের মতামত প্রদানের চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে, আমেরিকার সমাজ তথা বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা ও কলায় অবদান রাখার মাধ্যমে সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করছে যা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। ১৯৭৪ সালে আমেরিকার

আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান রবার্ট হে ও লুইসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ই. গ্রে তাঁদের Social Responsibilities of Business Manager প্রবন্ধে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণাকে তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত করেন: মুনাফা সর্বাধিকিকরণ ব্যবস্থাপনা; ট্রাস্টিশীপ ব্যবস্থাপনা এবং "জীবনযাত্রার গুণগতমান" ব্যবস্থাপনা।[১১]

১৯৭৯ সালে সিএসআর-এর ধারণা সম্প্রসারণে আমেরিকার জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আর্চি বি. ক্যারলের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে সিএসআর-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "... social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time."[১২] এখানে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে চারটি উপাদানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চারটি উপাদান হলো অর্থনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিবেচনামূলক। ক্যারল কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা তৎকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এই সংজ্ঞায় সমাজের প্রতি ব্যবসায়ীদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।

এটা সর্বজন বিধিত যে, ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান সামাজিক দায়বদ্ধতা হচ্ছে অর্থনৈতিক। অর্থাৎ সমাজের চাহিদানুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে লাভজনক মূল্যে তা ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করা। সমাজ চায় অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ আইন ও কর্তব্য মেনে পরিচালিত হোক। অর্থনৈতিক ও আইনি দায়বদ্ধতার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শ থাকে। কিন্তু সমাজের সদস্যরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য উৎপাদন ও সেবা ছাড়াও বাড়তি কিছু কর্মসূচী প্রত্যাশা করে যা পূরণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে বাধ্য নয়। ব্যবসায়ীরা জনগণের এই ধরনের প্রত্যাশা স্বেচ্ছায় পূরণ করে থাকেন। এই বিবেচনামূলক বা স্বেচ্ছাধীন দায়বদ্ধতাসমূহ সবচেয়ে জটিল এবং এই দায়বদ্ধতাগুলো পূরণ করা হবে কিনা তা নির্ভর করে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পছন্দের উপর। পরবর্তীতে ক্যারল ১৯৯১ সালে পূর্বে প্রদত্ত ১৯৭৯ সালের সংজ্ঞাটিকে কিছুটা সংশোধন করে বিবেচনামূলক বা স্বেচ্ছাধীন অংশকে 'জনহিতৈষী' (Philanthropic) বা 'মানব কল্যাণমূলক' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, "For CSR to be accepted by the conscientious business person, it should be framed in such a way that the entire range of business responsibilities is embraced."[১৩] এই বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, সিএসআর-এর কাঠামো এমনভাবে তৈরী হতে হবে যেন সব ধরনের ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে

এবং সিএসআর যেন ন্যায়পরায়ন বা বিবেকবান ব্যক্তি ও সমাজ দ্বারা গৃহীত হয়। নিম্নে দায়বদ্ধতাসমূহকে পিরামিড সদৃশ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

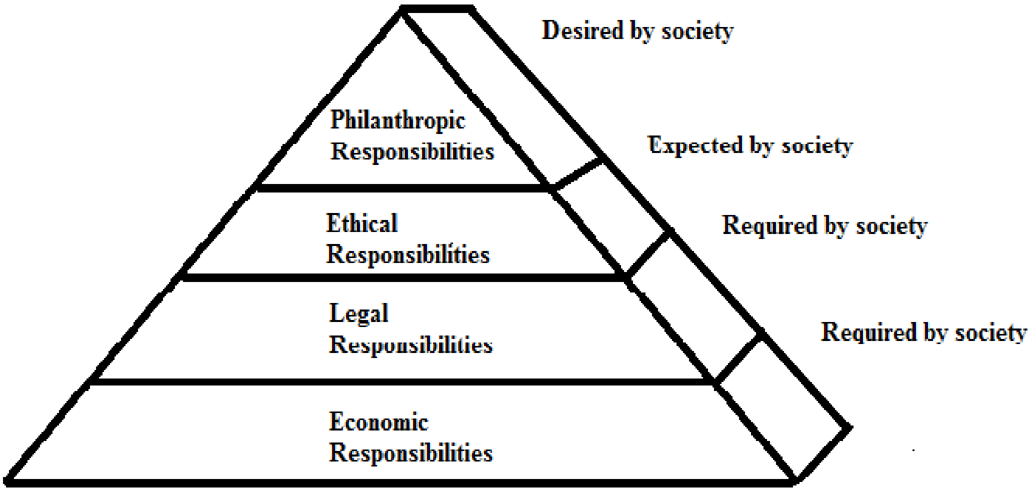

Source: Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, p. 53.

চিত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সিএসআর মোট চার ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে গঠিত। উপাদানগুলো হলো অর্থনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও জনহিতৈষী। এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

- ক্যারলের পিরামিডসদৃশ মডেল তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, সিএসআর-এর চারটি দায়বদ্ধতার মধ্যে প্রথম স্তরটি হলো অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা যেটি ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব। কেননা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন অংশিজনের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন প্রতিষ্ঠানে অনেকে অংশিজন অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং প্রদত্ত বিনিয়োগের বিপরীতে তাঁরা কাঙ্খিত মুনাফা প্রত্যাশা করেন। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানকে কর্ম ঘণ্টা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান থেকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করেন। আবার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভোক্তার সম্পর্ক রয়েছে যাঁরা ন্যায্য মূল্যে মানসম্মত পণ্য প্রত্যাশা করেন। সমাজের এসব প্রত্যাশা বা চাহিদা পূরণের জন্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়বদ্ধতা হলো যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত করা যা অন্যান্য দায়বদ্ধতাসমূহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অপরিহার্য।[১৪]

- ক্যারলের পিরামিডসদৃশ মডেল তত্ত্বটির দ্বিতীয় স্তর হলো আইনগত দায়বদ্ধতা। এই মডেল অনুসারে ব্যবসায় পরিচালিত হবে রাষ্ট্র দ্বারা প্রবর্তিত আইন মেনে। এখানে আইনি কাঠামো সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতার নামে অব্যবসায় সুলভ আচরণ ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত হতে দেখা গেছে। যেমন ২০০৭ সালে জার্মানের চলন্ত সিঁড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ডাচ বিয়ারসহ মোট ৪১টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৩.৩ বিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে অব্যবসায় সুলভ আচরণের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করেছে যা আইনসম্মত ছিল না। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনগত দায়বদ্ধতাসমূহ মেনে ব্যবসায় পরিচালনা করা আবশ্যক।[১৫]
- সমাজের এমন অনেক কাজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সম্পাদিত হয় যার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনগতভাবে বাধ্য নয়। তবে সমাজের ঔচিত্য, অনুচিত্য, ন্যায়ত্ব প্রভৃতি নৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমন যেন পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য কানাডা ও আমেরিকান ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিভিন্ন দেশে আইন প্রণীত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।[১৬]
- সিএসআর-এর পিরামিডসদৃশ মডেল তত্ত্বের চতুর্থ স্তরটি হলো 'জনহিতৈষিমূলক' বা 'Philanthropic'। 'Philanthropic' মডেলটি উক্ত পিরামিডের উপরিভাগে অবস্থিত যা 'জনহিতৈষিমূলক' বা 'মানবকল্যাণমূলক' দায়বদ্ধতা নামে পরিচিত। গ্রীক শব্দ 'Philanthropy' এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'the love of the fellow human.'। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবনমান উন্নয়ন, আঞ্চলিক সম্প্রদায় তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়ার প্রয়াসী হয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দাতব্য দান, কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের বিনোদনের জন্য ক্লাব ভবন নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আর্টস ও ক্রীড়া প্রভৃতিতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান যা 'জনহিতৈষী' কাজ হিসেবেও বিবেচিত হয় যা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

আইনগতভাবে বাধ্য নয়। এ কারণে, এই দায়বদ্ধতাটি অন্যান্য দায়বদ্ধতা থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।[১৭]

এই চার ধরনের দায়বদ্ধতা সর্বদায় কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। তবে সম্প্রতি নৈতিক ও জনহিতৈষি কর্মকাণ্ড সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে যেখানে অর্থনৈতিক হিসেবটা গৌণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২.২.৪ ১৯৮০-এর দশকে অংশিজন তত্ত্ব ও ব্যবসায়িক নীতি হিসেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা:

এই দশকে একাডেমিক গবেষণায় সিএসআর সংক্রান্ত অনেক নতুন নতুন ধারণার বা তত্ত্বের সূচনা ঘটে। যেমন কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা, কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন, জননীতি, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও অংশিজন তত্ত্ব। এই দশকের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আমেরিকার প্রখ্যাত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থমাস এম. জোন্স, আমেরিকার এরিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক জন প্রসিদ্ধ গবেষক ফ্রাঙ্ক তোজ্জুলিনু, আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্দেন স্কুলের ব্যবসায় প্রশাসনের অধ্যাপক ও দার্শনিক আর. এডওয়ার্ড ফ্রিম্যান, আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক স্টিভেন এল. ওয়ার্টিক এবং আমেরিকার প্রসিদ্ধ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ফিলিপ এল. ককরান অন্যতম। উল্লিখিত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ১৯৮০-এর দশক মূলতঃ অংশিজন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত এবং এ তত্ত্বের জন্য ফ্রিম্যান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি অংশিজন সম্পর্কে বলেন, “… stakeholder is any person, group or organisation who is affected by the business or who can affect the business.”[১৮] অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয় অথবা যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সিদ্ধান্তের কারণে ব্যবসায় প্রভাবিত হয় তারাই প্রতিষ্ঠানের অংশিজন। এক কথায় ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি প্রতিষ্ঠানটির মালিক, কর্মচারী, কিংবা প্রতিষ্ঠানটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত।

এই দশকের আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যানফোর্ড স্কুল অব এডুকেশনের অধ্যাপক জে. জি. মার্চ ও আমেরিকার অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হারবার্ট এলেক্সজান্ডার সাইমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অংশিজনের মধ্যকার সম্পর্ককে পারস্পরিক বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন, “… the relationship between a company and its stakeholders is reciprocal as the stakeholders deliver contributions for the company to meet their interests and the company reward them benefits in return.”[১৯] উল্লিখিত বক্তব্য থেকে বলা যায়, অংশিজনবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন অবদান রাখবে তেমনি প্রতিষ্ঠানও তাদের অংশিজনবৃন্দের

অবদানের বিনিময়ে বিভিন্ন রকম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুবিধা প্রদান করবে। এখানে প্রতিষ্ঠান ও অংশিজন উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে সমগুরুত্ব দেয়ার কথাই ইঙ্গিত করছে। পরবর্তীতে অংশিজন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সিএসআর-এর আরও কতিপয় নতুন ও মৌলিক বিষয়ের সূত্রপাত হয় যার মধ্যে টেকসই উন্নয়ন, স্টুয়ার্ডশীপ (সেবা প্রদান) তত্ত্ব ও ত্রয়ী রেখা বা ত্রি ভিত্তি রেখা (Triple Bottom Line/TBL) অন্যতম। টেকসই উন্নয়ন বলতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের সক্ষমতার সঙ্গে আপোস ব্যতিরেকে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণকে বোঝায়। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়নকে বোঝায় যেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রাকে যেমনিভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় তেমনিভাবে এই উন্নয়ন যেন প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি না করে সেই দিকটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। স্টুয়ার্ডশীপ তত্ত্ব বলতে শেয়ারমালিক, অংশিজন এবং কর্পোরেট সম্পদ প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপককে যে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয় তাকেই বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মক্ষমতা প্রভৃতির উপর যে প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা পরিমাপ করার প্রক্রিয়া হলো ত্রয়ী রেখা বা ত্রি ভিত্তি রেখা যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

উপরে উল্লিখিত ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে সিএসআর-এর আরো কতিপয় নতুন মডেলের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যেমন 'DNA of CSR2.0 Model', Value Creation Model of CSR', 'Practitioner-Based Model of Societal Responsibilities' এবং 'The Model of Consumer Driven Corporate Responsibility'। 'DNA of CSR2.0 Model' তত্ত্ব অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি সামাজিক দিককেও গুরুত্ব প্রদান করে যা টেকসই ক্ষমতাকে ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সমাজের জন্য মূল্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া হলো 'Value Creation Model of CSR'।

'Practitioner-Based Model of Societal Responsibilities' তত্ত্বানুযায়ী সকল অংশিজনকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া কঠিন। তাই এ তত্ত্বে ব্যবসায়ের মূল কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশিজনকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন কর্মচারী ও ক্রেতাসাধারণ বা গ্রাহকগণ বা ভোক্তাগণ হলেন অন্যান্য অংশিজনের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশিজন। 'The Model of Consumer Driven Corporate Responsibility' তত্ত্বানুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দিক হলো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লাভজনক হলেই তা টেকসই হবে। এ তত্ত্বে

ক্রেতাসাধারণকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং সম্ভাব্য টেকসই ব্যবসায় অর্জনের জন্য ক্রেতাসাধারণের প্রতি নৈতিক ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.২.৫ ১৯৯০-এর দশকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলন: ১৯৮০-এর দশকের শেষে ও ১৯৯০-এর দশকে ক্যারল এর পিরামিড তত্ত্ব ও অংশিজন তত্ত্ব থেকে পরবর্তীতে সিএসআর-এর কিছু নতুন নমুনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যেমন ত্রয়ী বা ত্রি ভিত্তি রেখা, 'Value Creation Model of CSR', স্টুয়ার্ডশীপ তত্ত্ব, 'The Model of Consumer Driven Corporate Responsibility' প্রভৃতি যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে অনুশীলনের দশকও বলা যায়। কারণ আমেরিকা, ইউরোপ, ভারতসহ বিশ্বজুড়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো এই দশকে সিএসআর-এর অনুশীলনে মনোযোগী হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো – আমেরিকার প্রখ্যাত ও বহুলভাবে পরিচিত ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইক, আমেরিকার মাল্টিনেশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান মার্ক, আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান কোকা-কোলা, আমেরিকার মাল্টিনেশনাল প্যাকেজ ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান ইউপিএস, আমেরিকার মাল্টিনেশনাল তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইবিএম, আমেরিকার ফাস্ট ফুড প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড'স, অফিস সরাঞ্জাম প্রতিষ্ঠান আমেরিকার হারম্যান মিলার, ভারতের মাল্টিনেশনাল প্রতিষ্ঠান টাটা, ভারতের প্রসিদ্ধ সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্মা, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ নব্বই দশকে ভারতের টাটা স্টীল্‌স লাইফলাইন এক্সপ্রেস বা জীবন রেখা এক্সপ্রেস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৬৭,৮০০ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ভারতের গ্রাম্য সমাজের অভ্যন্তরে পাঁচটি হাসপাতাল ও ভাসমান ক্লিনিকের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী প্রদান করছে এবং প্রতি বছরে ৪০০,০০০ ব্যক্তি সিএসআর কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে।[২০] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির ধারণাটি বিবেচনার বাইরে রেখে।

২.২.৬ একবিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে গবেষণা: বিংশ শতাব্দীতে সিএসআর-এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীতে সিএসআর-এর তাত্ত্বিক আলোচনার ধরন পরিবর্তিত হয়ে প্রায়োগিক গবেষণার সংযোজন ও প্রসারণ ঘটে। ফলে সিএসআর থেকে আরো অনেক নতুন ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যেমন অংশিজন তত্ত্ব, টেকসই ব্যবসায়, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা প্রভৃতি। দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় পরিচালনা করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালার সমন্বিত প্রক্রিয়াই হলো টেকসই ব্যবসায় যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০০ সালে ম্যাক্সিকোর এগেড

বিজনেস স্কুলের (EGADE Business School)- টেকনোলোজিকো ডি মন্টেরের (Tecnológico de Monterrey) গবেষক ব্রায়ান ডব্লিউ হাস্টেড মনে করেন সিএসআর হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ও তা মোকাবেলায় গৃহীত কৌশলাদির অংশ বিশেষ। ২০০৩ সালে কানাডার প্রখ্যাত ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সোয়ার্টজ ও ক্যারল তাঁদের "Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach" প্রবন্ধে পূর্বে উল্লিখিত ক্যারল এর চার উপাদান বিশিষ্ট সিএসআর-এর সংজ্ঞাকে তিন উপাদান বিশিষ্ট সংজ্ঞায় পরিণত করেন। উপাদান তিনটি হলো অর্থনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক। নিম্নে তাঁদের প্রদত্ত ভেন চিত্রের একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো:[২১]

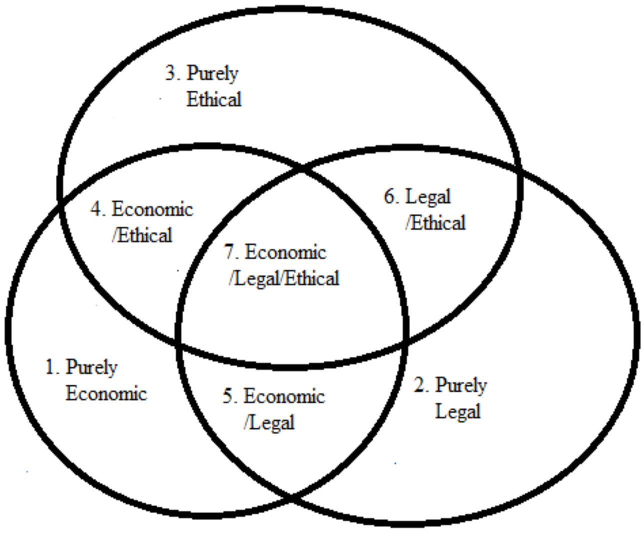

The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility

উপরের ভেন চিত্রে সাতটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। এই সাতটি অংশের মধ্যে কেবলমাত্র সপ্তম অংশটি তিনটি উপাদানের সন্নিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আমি মনে করি এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত অংশ হলো ভারসাম্য অবস্থা যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সবুজ সংকেত প্রদান করে। এই ভারসাম্যমূলক কৌশল (অর্থনৈতিক বা আইনগত বা নৈতিক) দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করা হলে প্রতিষ্ঠান যেমন টেকসই হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অংশিজনেরাও এর সুফল ভোগ করবে – "Corporate Social Responsibility should be disconnected from

short-term corporate or individual successes but needs to be understood and considered from a long term perspective combined with a forward looking approach."[২২] এ বক্তব্য স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে যে, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাময়িক সফলতার বিষয়টিকে তাঁরা বিযুক্ত করে এবং দীর্ঘকালীন তথা টেকসই ব্যবসায়ের সক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ প্রতিষ্ঠান টেকসই হলে শেয়ার মালিক যেমন দীর্ঘমেয়াদে তার সুফল ভোগ করবেন তেমন অংশিজনেরাও তাদের কাম্য সুবিধা লাভে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ শেয়ারমালিক ও অংশিজন উভয়ের জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত হবে।

একবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সিএসআর সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণাকে 'টেকসই উন্নয়ন তত্ত্বে' আখ্যায়িত করা হলেও একুশ শতকে এসে তা ত্রি ভিত্তি রেখায় রূপ নেয়। যেমন তুর্কির ইস্টিজ টেকনিক্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অব গ্রাজুয়েট স্কুলের (Director of Graduate School) এবং ফ্যাকাল্টি অব ইকোনোমিক এণ্ড এডমিনিস্ট্রেটিব সাইন্সেসের (Faculty of Economic and Administrative Sciences) ডিন ও ফাইন্যান্স এণ্ড একাউন্টিংয়ের অধ্যাপক গোলার এরাস ও ইংল্যান্ডের ডি মন্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় ও আইন অনুষদের অধ্যাপক ডেভিড ক্রোদার ২০০৯ সালে 'স্টুয়ার্ডশীপ' তত্ত্বকে টিবিএল (TBL) এর সাথে সমন্বয় করেন। তাঁরা সিএসআরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বার্থকে প্রকাশ করেন যেগুলোকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং সাংগঠনিক সংস্কৃতিগত হিসেবে অভিহিত করা যায়। একবিংশ শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই সময়ে সিএসআর কার্যক্রম সর্বোচ্চ সফলতা পায় এবং এই কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও নমুনা প্রকাশ পায়। যেমন Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) কর্তৃক ২০০১ সালে প্রথমবারের মতো সিএসআর সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রকাশিত হয়। আবার অংশিজন তত্ত্ব ও ক্যারোলের পিরামিড তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মালয়েশিয়ার এমএম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সাঈদ ঘোলামী ২০১১ সালে সিএসআর কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য 'Value Creation Model of CSR' মডেল তৈরী করেন। এছাড়াও ক্যারোলের পিরামিড তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ক্লেইডন ২০১১ সালে 'The Model of Consumer Driven Corporate Responsibility' তৈরী করেন।[২৩]

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, পঞ্চাশের দশক থেকে দুই হাজার সালের পরবর্তী সময় পর্যন্ত সিএসআর ধারণার যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে তা ছয়টি ধাপে বিভক্ত। এই ছয়টি ধাপে সিএসআর – কে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন পঞ্চাশের দশক প্রারম্ভিক পর্যায়; ষাটের দশক জনসেবামূলক পর্যায়; সত্তরের দশক ক্রমবর্ধনশীল পর্যায়; আশির দশক অংশিজন

তত্ত্ব ও ব্যবসায় নীতিবিদ্যার পর্যায়; নব্বইয়ের দশক কর্পোরেট জগতের চর্চার পর্যায়; দুই হাজার ও তদপরবর্তী সময় সিএসআর কর্মসূচীর ফলাফল নির্ণায়ক নিয়ে গবেষণার পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

২.৩ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে সিএসআর: সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত মতবাদ হলো সিএসআর। আমেরিকার ওয়েস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্যারন এস. সী তাঁর "Sustainability is Applied Ethics" প্রবন্ধে যদিও দাবি করেন যে সিএসআর-এর ধারণা প্রাচীন গ্রিসে চিহ্নিত হয়েছে তবুও বিভিন্ন লেখকের লেখনি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমেরিকার সমাজে সিএসআর প্রত্যয়টি সর্বাগ্রে বিকশিত হয়েছে।[২৪] তবে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সিএসআর ধারণাটি সম্প্রতি প্রভাবশালী হয়ে ওঠেছে। কারণ সমাজকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় পরিচালিত হয়। ব্যবসায়ের কার্যক্রম দ্বারা একটি সমাজ নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকেই প্রভাবিত হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এরূপ দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের মডেলের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একটি 'Model of explicit CSR' এবং অপরটি 'Model of implicit CSR'। 'Model of explicit CSR' অনুসারে প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীনভাবে সিএসআর এ অংশগ্রহণ করবে যেখানে আইনগত বাধ্যবাধকতা অনুপস্থিত। যেমন আমেরিকার সমাজে 'Model of explicit CSR' অনুসারে প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএসআর এ অংশগ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে, 'Model of implicit CSR' বলতে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে সিএসআর এ অংশগ্রহণ করাকেই বোঝায়। এই তত্ত্ব অনুসারে সিএসআর এ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে সিএসআর-এর এই মডেল অনুসরণ করা হয়। সুতরাং 'Model of implicit CSR' এবং 'Model of explicit CSR' পরস্পর বিপরীতমুখী। অর্থাৎ প্রথমটিতে সিএসআর এ অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সিএসআর এ অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা সংকুচিত। বাংলাদেশেও 'Model of implicit CSR' অনুসরণ করা হয়। যেমন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮ সালে সিএসআর ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করে যা পেশাগত বাধ্যতামূলক অনুশীলন হিসেবে বাংলাদেশে চর্চা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ আইন কেবল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।[২৫]

এতক্ষণ আমরা সিএসআর-এর ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন সিএসআর-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

২.৪ সিএসআর-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য: কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একধরনের নীতি বা কৌশল যা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনকে ব্যবসায় পরিচালনার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়মের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে বোঝায়। এ কারণে শ্যারন এস. সী তাঁর "Sustainability is Applied Ethics" প্রবন্ধে বলেন, "Corporate social responsibility deals with the role of business in society."[২৬] অর্থাৎ সমাজে ব্যবসায়ের ভূমিকা বা ব্যবসায়ের কারণে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনাই হলো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা। সহজভাবে বলতে গেলে, সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তাকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর বলে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "Corporate social responsibility (CSR) means that a corporation should act in a way that enhances society and its habitants and be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment."[২৭] অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণ, সামাজিক সম্প্রদায় ও পরিবেশ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করছে। ফলে সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সদস্যবৃন্দের উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। এই ধারণা 'দায়বদ্ধতা'র মূল প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত যার অর্থ হলো প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া বা অঙ্গিকার করা (to pledge back)। অর্থাৎ সমাজ ও ব্যবসায় সংগঠনের অংশিজনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ব্যবসায়ের এক সময়ের প্রধান লক্ষ্যই ছিল মুনাফা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায় নীতিবিদগণের মধ্যে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ীবৃন্দ সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন, বাজার ব্যবস্থা, দক্ষ জনবল প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। ফলে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এসব উপাদান ব্যবহার করার কারণে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সমাজের সকল সদস্য কর্তৃক ব্যবহৃত না হলেও এর দ্বারা সৃষ্ট সমূহ ক্ষতির দায় সকলকে বহন করতে হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট এসব নেতিবাচক প্রভাব যতদূর সম্ভব হ্রাস করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নানা রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যা সিএসআর নামে পরিচিত। যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিঃসরিত কার্বন ডাইঅক্সাইড মানুষ ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এটি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কিছু ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে কারখানার অভ্যন্তরে ও চারপাশে প্রচুর পরিমাণে সবুজায়নের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্যকে রক্ষার চেষ্টা করছে যা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড দ্বারা যদি জনগণ বা সমাজের কোনরূপ ক্ষতি হয় তাহলে সেই ক্ষতি স্বীকার করে তা যথা সম্ভব বিকল্প বিনিময় সুবিধার মাধ্যমে পূরণ করা বাঞ্ছনীয় । এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে হয়তো কিছু মুনাফা হ্রাসকে মেনে নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হ্রাস যদি কতিপয় অংশিজনেদের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এর অর্থ এই নয় যে প্রতিষ্ঠান তার অন্যান্য কর্মকাণ্ড বা উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করবে। আবার এটা বলাও যথাযথ হবে না যে, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যসব প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় কম মুনাফা অর্জন করে বা করবে বরং এর বিপরীত উদাহরণই অনেকক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি সমাজের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে টেকসই ব্যবসায়ের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। এ দিক বিবেচনা করে আমেরিকার ডেপল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রিহাজ কলেজ অব বিজনেসের অধ্যাপক লুরা পিনকাস হার্টম্যান এবং আমেরিকার বিখ্যাত সেইন্ট বেনেডিক্ট কলেজ এবং সেইন্ট জন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জো ডেসজার্ডিন্স তাঁদের *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility* গ্রন্থে বলেন, "If a firm fails to meet society's interests and demands, it will simply fail and go out of business."[২৮] ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি সমাজের চাহিদা পূরণ বা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই না হয়ে বরং অস্তিত্ব সংকটে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের চাহিদাকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সিএসআর-এর প্রতিটি ধরনেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রকম দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত দায়বদ্ধতা অন্যতম। নৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবেশ ও কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষা, পণ্যের গুণগতমান সমুন্নত রাখা, ক্রেতা ও ভোক্তা সাধারণের সাথে প্রতারণা না করা প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান করা, মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা, নিত্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ইত্যাদি। আবার আইনগত দায়বদ্ধতার মধ্যে রয়েছে শেয়ারমালিকদের স্বার্থ ও আমানত রক্ষা করা। অধিকন্তু কর্মী, ক্রেতা, উৎপাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রয়েছে আইনি দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্র নতুন নতুন আইন পাশ করার মাধ্যমে জনগণের ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের আইনি দায়বদ্ধতাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য সমাজের সদস্য তথা ভোক্তা বা ক্রেতার নিকট বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেহেতু তার উৎপাদিত অথবা সংগৃহীত পণ্য ভোক্তা বা ক্রেতার নিকট সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে তাই সেই সমাজের ভোক্তা বা ক্রেতার প্রতি ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ কারণে থমাস এম. জোন্স বলেন, "Corporate social responsibility as the notion that corporation has a obligation to constituent groups in society other than stockholders, and beyond that prescribed by law."[২৯] তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলা যায়, বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে পরিহার বা অবজ্ঞা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মুনাফা অর্জন ও টেকসই ব্যবসায় পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সমাজের ভোক্তা বা ক্রেতার সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ সমাজের দরিদ্র ও গরীব শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা বৃত্তি, দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, সমাজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতিতে সরাসরি সহায়তা প্রদান করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের ভোক্তা, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও তার পরিবার, বিনিয়োগকারী, যোগানদাতা, পরিবেশক, সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে যদি সক্ষম হয় তবেই তা উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক হতে পারে। এক কথায়, ব্যবসায় লাভ করার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকল্পে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমেই সিএসআর-এর মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ১৯৭১ সালে আমেরিকার Committee for Economic Development দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিবেদনে আইনগত দায়বদ্ধতার কথা পাশকাটিয়ে মোটামুটি একই বক্তব্য প্রদান করে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:[৩০]

- **অন্তঃবৃত্তিক দায়বদ্ধতা:** অর্থনৈতিক কার্যসমূহ সুনিপুণ ও সুচারুভাবে নির্বাহের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এই দায়বদ্ধতা। যেমন পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ, মাত্রারিক্ত মুনাফা অর্জন নীতি পরিহার করা, ব্যয় কমিয়ে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করা, অর্থনৈতিক সম্পদের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, পণ্যের বিক্রয় মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, নতুন

নতুন কর্মক্ষেত্রের পরিধি সৃষ্টি করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইত্যাদি অন্তঃবৃত্তিক দায়বদ্ধতার (Inner circle) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যবৃত্তিক দায়বদ্ধতা: মধ্যবৃত্তিক দায়বদ্ধতা অন্তঃবৃত্তিক দায়বদ্ধতার তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত যার মধ্যে পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত স্পর্শকাতর অর্থনৈতিক কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, পরিবেশ সংরক্ষণ বা দূষণমুক্ত রাখা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ক্রেতাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা, সামাজিক অনুভূতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা ইত্যাদি মধ্যবৃত্তিক দায়বদ্ধতা (Intermediate circle) হিসেবে বিবেচিত।

- **বহিঃবৃত্তিক দায়বদ্ধতা:** এ দায়বদ্ধতার মধ্যে নতুনভাবে উদ্ভূত এমনসব দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত যা সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। যেসব সমস্যাসমূহ সমাজের প্রধান বা মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত অথবা যে সকল সমস্যা সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয় তা সমাধানকল্পে সরকারের পক্ষে এককভাবে এ জাতীয় দায়বদ্ধতা পালন করা দূরহ বিধায় বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তা নিরসনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসতে হয়। যেমন দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা কার্যক্রম, অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বহিঃবৃত্তিক দায়বদ্ধতার (Outer circle) অন্তর্গত।

২.৪.১ সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমের উদাহরণ: এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, সিএসআর বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অর্থাৎ সকল পণ্ডিত একমত পোষণ করেন না। কিন্তু সিএসআরকে নির্দেশ করে এমনসব কার্যাবলী কি হতে পারে তা নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক নেই। এমন কার্যাবলীর একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৩১]

- আইনী বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে উঠে নৈতিকভাবে কাজ করা: সাধারণত কোন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আইন নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কিন্তু কোন কাজের উচিত-অনুচিত বিষয়টি বিবেক দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক কথায় এমন একটা নৈতিক অবস্থান থেকে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন তা আইনি বাধ্যবাধকতার চেয়েও বেশী। যেমন নাভানা গ্রুপ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করার উদ্দেশে গুলশান অঞ্চলে রোড ম্যাপিং করেছে যা করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে বাধ্য ছিলনা বরং নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে তারা

উক্ত কার্যটি সম্পাদন করেছে এবং তা করার ক্ষেত্রে আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসেবটাও বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ কারণে আমেরিকার প্রখ্যাত হার্ভার্ড স্কুল অব বিজনেসের জ্যেষ্ঠ ফেলো এম আর ক্রামার তাঁর "A Response to 'Shared Value': CSR Re-branded?" প্রবন্ধে বলেন, "Corporate social responsibility is widely perceived as a cost center, not a profit center."[৩২] তিনি সিএসআরকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করে বরং নৈতিক অবস্থান থেকে সিএসআর-এর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেছেন।

- পৌর ও দাতব্য সংস্থা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা: বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান ১০% ট্যাক্স রেয়াত পাবে।[৩৩] ইস্পাহানি গ্রুপ চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে, জনতা ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা দিচ্ছে। আবার আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বার্ষিক আয়ের প্রায় ১ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দাতব্য সংস্থাগুলোকে দান করে থাকে। এ সবই সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যয় কমানোর একটি পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সকল কর্মকাণ্ডে কোন আইনি বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে সরকার প্রদত্ত উক্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।
- কর্মীদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং আইনি বাধ্যবাধকতার বাইরেও কর্মক্ষেত্রের মানোন্নয়ন করা: কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের দ্রুত বেতন পরিশোধ করা এবং প্রতিষ্ঠানকে আইন মেনে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আট ঘণ্টা সময়কাল অনুসারে কাজ করানো। এছাড়াও কর্মীদের নিয়ে বার্ষিক বনভোজন, শিশু যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কর্মস্থলের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের জীবনমান উন্নতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এক কথায় পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করা। যেমন বাংলাদেশে সপুরা সিল্ক মিল্স গরীব কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ায় সহায়তার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করেছে যা করতে উক্ত প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে বাধ্য ছিল না এবং এ কাজটি সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাজের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত ও প্রশংসিত হয়ে থাকে।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে কম লাভজনক হলেও সমাজের জন্য উপকারী এমন অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা: কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুনাফা লাভের কাজটি এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যেন উক্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণ হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজের প্রয়োজনেই

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের চাহিদা পূরণকেও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হয়। কোন কোন সময় অর্থনৈতিক ক্ষতি জেনেও সামাজিক কল্যাণে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয়। যেমন স্টারবাক্স নামক একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দরিদ্র দেশগুলোর উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশী দামে কফি ক্রয় করে থাকে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ যার পরিমাণ ১৮১.৩৬ কোটি টাকা।[৩৪] তাদের এ ধরনের কার্যক্রম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের কোন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানও অধিক মূল্যে ক্রয় করে কম মূল্যে জনগণের কাছে তাদের সেবা কার্যক্রম পৌঁছে দেয়। গ্যাস বিতরণ তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

- প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহার করে সামাজিক সমস্যাগুলো নিরসনে কর্মসূচী পরিচালনা বা সামাজিক সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা: যেমন বিশ্বের খ্যাতনামা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আশির দশকের দিকে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অঞ্চলে মানুষের শরীরের চামড়ার নিচে এক ধরনের জীবাণু তৈরি হয়েছিল যা চুলকানির প্রদাহ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি করত এবং তা এক পর্যায়ে মানুষের চোখেও সংক্রমিত হত ও চোখ অন্ধ করে দিত যা 'River Blindness' রোগ নামে পরিচিত। উক্ত রোগের উপদ্রুপের কারণে ঔসব এলাকায় বসবাসরত জনগণের একটি বড় অংশ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এমনকি অনেকে অসহনীয় যন্ত্রনার কারণে আত্মহত্যাও করেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় 'River Blindness' দূরীকরণের জন্য ঔষধ তৈরী করে এবং শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সেখানে তা সরবরাহ করে। জনগণকে এ সেবা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠান আফ্রিকায় বেশ জনপ্রিয়।[৩৫] কারণ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে গৌণ মনে করে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে এরূপ কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানসমূহ আপাততঃ আর্থিক মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে বিসর্জন দিয়ে থাকলেও এইসব কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ

কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যা আমি পরবর্তীতে দেখানোর চেষ্টা করব। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি অর্থ ব্যয় করে তাদের কলকারখানাগুলোর আশেপাশের লোকালয়ের উন্নয়ন করে তবে তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানকে লাভবান করে। আবার কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিলে কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করে যা চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই সংরক্ষণ করে।

সিএসআর-এর ঐতিহাসিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান বিশ্বে সিএসআর-এর ধারণার সাথে আরোও কতিপয় অভিনব ধারণার জন্ম হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

২.৪.২ কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা: সিএসআর-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিত্য নতুন উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাড়া প্রদান করার প্রবণতা এবং সক্ষমতা। উইলিয়াম ক্রিটেনডেন ফ্রেডরিক কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা সম্পর্কে বলেন, "...corporate social responsiveness refers to the capacity of a corporation to respond to social pressures."[৩৬] তাঁর এই বক্তব্য এটাই ইঙ্গিত করে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক চাপে সাড়া দেয়ার ক্ষমতাকে কর্পোরেট সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতা বোঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক সমস্যা নিরসনে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্মসূচী ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করে। তবে ঠিক কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রতিষ্ঠান সাড়া দিচ্ছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি দ্বারা সামাজিক দায়বদ্ধতার ফলাফল সূচিত হয় যা কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার নর্থান লোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ডোনা জে. উডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কর্পোরেট সামাজিক কর্মসম্পাদন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন তিনটি উপাদানের সমন্বয়। এগুলো হলো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার 'নীতি', সামাজিক সাড়া প্রদানশীলতার 'প্রক্রিয়া' ও কর্পোরেট সামাজিক আচরণের 'ফলাফল'। তাই সাড়া প্রদানশীলতা হলো প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও কার্যক্রমকে সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যেখানে প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ই পরস্পর উপকৃত হতে পারে।[৩৭]

২.৪.৩ কর্পোরেট নাগরিকত্ব: সিএসআর ধারণার সাথে সম্প্রতি একটি প্রত্যয় বেশ জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যাকে কর্পোরেট নাগরিকত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধারণাটি ১৯৯০-এর দশকে ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে এ ধারণাটি প্রায়ই সিএসআর ও কর্পোরেট কর্মসম্পাদনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'কর্পোরেট নাগরিকত্ব' শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। বোটরাইটের মতে, "Corporate citizenship is the process of identifying, analyzing and

responding to the country's social, political and economic responsibilities as defined through law and public policy, stakeholder expactations, and voluntary acts flowing from corporate values and business strategies."[৩৮] উক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, কর্পোরেট নাগরিকত্ব হলো একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত আইন, জননীতি, অংশিজনদের স্বার্থ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কর্পোরেট মূল্যবোধ এবং ব্যবসায় কৌশল বিষয়ক ধারণাসমূহকে চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ এবং সে অনুযায়ী সাড়া প্রদানের প্রক্রিয়া। সুতরাং নাগরিকের যেমন রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে তেমনি ব্যববসায় প্রতিষ্ঠানেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। অর্থাৎ কর্পোরেট নাগরিকত্ব হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাদের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, গুণগত সেবা প্রদান ও অংশিজনদের জন্য মুনাফা বজায় রাখা। সিএসআর ও কর্পোরেট নাগরিকত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো সিএসআর এ ঐচ্ছিক কার্যাবলীকে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজের পাশাপাশি রাখা হয় কিন্তু কর্পোরেট নাগরিকত্বে ঐ সমস্ত কার্যাবলীকে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। কর্পোরেট নাগরিকত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ব্যবসায়কে সুনাগরিকের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক যেমন রাষ্ট্র প্রদত্ত আইন-কানুন মান্য করে সমাজে বসবাস করে ঠিক তেমনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেও রাষ্ট্র প্রদত্ত আইন-কানুন মান্য করে সমাজ, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর যতদূর সম্ভব অপেক্ষাকৃত কম বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করা। তাই আইন মান্য করে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্য থাকলেও একজন মানুষ যে অর্থে নাগরিক সে অর্থে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিক নয়। তাই 'কর্পোরেট নাগরিকত্ব' শব্দটি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।[৩৯]

২.৪.৪ কর্পোরেট গভর্নেন্স: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো কর্পোরেট গভর্নেন্স। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও কর্মকৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনরূপ অপব্যবহার অথবা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে কিনা সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্পোরেট গভর্নেন্সের প্রবর্তন করা হয়। কর্পোরেট গভর্নেন্স হলো একটা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।[৪০] কর্পোরেট গভর্নেন্স ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জড়িত শেয়ারমালিক, অংশিজন, ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, ভোক্তা, সরবরাহকারী, সরকার প্রভৃতির স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। এক কথায় বলা যায়, দেশ ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম মেনে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ

সংরক্ষণ, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীর নিকট কোম্পানির প্রকৃত সত্য তথ্য প্রকাশ প্রভৃতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং মালিক পক্ষের একক ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত করাও কর্পোরেট গভর্ন্সের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.৫ কর্পোরেশনের মূল বৈশিষ্ট্য: কর্পোরেশন হলো সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধুনিক আইনসৃষ্ট এক অভিনব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা শেয়ারমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। অন্যদিকে, আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্য থেকে সম্পদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকেই কর্পোরেশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কর্পোরেশনের মালিকানা থাকে তার শেয়ারমালিকদের মধ্যে এবং এটি পরিচালিত হয় একটি নির্দিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা। সুতরাং কর্পোরেশন একটি স্বাধীন সত্তা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী, পণ্য উৎপাদনকারী ও বণ্টনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকেও কর্পোরেশন স্বাধীন। অর্থাৎ তাদের স্বীয় অধিকারের কারণেই কর্পোরেশন পৃথক ও স্বাধীন সত্তা। এ কারণে, কর্পোরেশন চিরস্থায়ী সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে কোন বিনিয়োগকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ক্রেতার মৃত্যু সংঘটিত হলেও কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কোন বিরূপ প্রভাব পরে না বরং কর্পোরেশন নিত্য নতুন সদস্য সংগ্রহ করে পৃথক ও স্বাধীন স্থায়ী সত্তা হিসেবে বেঁচে থেকে লক্ষ্য স্থলে এগিয়ে চলে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে কর্পোরেশন একটি পৃথক সত্তা হিসেবে সমাজে পরিচিত হয়ে থাকে তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪১]

- আইনের দৃষ্টিতে কর্পোরেশন সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত না হলেও 'কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা' ('artificial persons') হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ কারণে, সমাজের প্রতি ব্যক্তির যেমন দায়বদ্ধতাও কর্তব্য রয়েছে ঠিক তেমনি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা হিসেবে কর্পোরেশনেরও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য রয়েছে। এছাড়া সমাজের সহযোগিতা ব্যতীত কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনাও অসম্ভব।
- ধারণাগতভাবে শেয়ারমালিক দ্বারা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের ব্যতিরেকেই পৃথক ও স্বাধীন সত্তা হিসেবে কর্পোরেশন অস্তিত্বশীল। তাই কর্পোরেশন কর্তৃক সমাজের উপর কোনরূপ ক্ষতি সংঘটিত হলে বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা কর্পোরেশন কর্তৃক ধ্বংসাত্মক কোন কাজ সংঘটিত হলে উক্ত বিরূপ কার্যাবলীর দায়বদ্ধতা শেয়ারমালিকগণ গ্রহণ করেনা বরং কর্পোরেশনকেই উক্ত বিরূপ কার্যাবলীর দায়িত্বভার বহন করতে হয়।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকগণের দায়িত্ব হলো শেয়ারমালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যার মধ্যে অন্যতম হলো বিশ্বস্ততার দায়বদ্ধতা, কর্তব্যপরায়ণতার দায়বদ্ধতা প্রভৃতি। এই সকল দায়বদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কর্পোরেশন শেয়ারমালিকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ

সততা ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে তাদেরকে লাভবান করতে সহায়তা করেন। তাই কর্পোরেশনে যারা বড় বড় পদ অলংকৃত করে আছেন তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো শেয়ারমালিকদের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করা। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা ব্যবস্থাপকগণ এমনভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন যেন কোনভাবেই অংশিজন এবং শেয়ারমালিকগণের মধ্যে আস্থাহীনতার জন্ম না নেয়।

২.৬ সিএসআর-এর আদর্শনিষ্ঠ ধারণা: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে সিএসআর নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের জন্ম হয় তা মূলত ছিল নৈতিকতা কেন্দ্রিক। প্রশ্নটি হচ্ছে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কি নৈতিকভাবে বাধ্য? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই 'ধ্রুপদী তত্ত্ব' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যা নিম্নে করা হলো:

উনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত আলোচিত বিশেষ করে অর্থনীতিবিদদের নিকট এখনও প্রভাবশলী হলো ধ্রুপদী তত্ত্ব বা মতবাদ। ধ্রুপদী তত্ত্বটি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়ের অর্থনৈতিক মডেল হিসেবেও পরিচিত। এই তত্ত্বটিকে আমেরিকার প্রখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ও অর্থনীতির অধ্যাপক জেম্‌স ডব্লিউ ম্যাকি তিনটি মৌলিক নীতির সাহায্যে প্রকাশ করেন। যথা:[৪২]

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্য যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা এবং ব্যবসায়িক সংগঠন অন্য যে কোনো সংগঠন থেকে ভিন্ন। কোনো বহুত্ববাদী (Pluralistic) সমাজে ব্যবসায়িক সংগঠন ও অন্য যে কোনো সংগঠনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভিন্ন।
- ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতার প্রাথমিক মানদণ্ড হচ্ছে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন। এছাড়া প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনও অন্তর্ভুক্ত।
- ব্যবসায়িক সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মুনাফা। তাই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেও প্রতিষ্ঠানসমূহ সকল সুযোগ ও দক্ষতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবে।

ধ্রুপদী তত্ত্ব পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ তত্ত্বানুসারে কোম্পানিগুলো পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে এবং বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যাবলীও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সেসব সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতা অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের উপর ন্যস্ত করতে হবে এবং বৃহত্তর স্বার্থে কর্পোরেট ক্ষমতাকে অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে নতুবা এটি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারে

তৎপর হয়ে উঠবে। ধ্রুপদী তত্ত্বের প্রবক্তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে থাকেন যা নিম্নরূপ:[৪৩]

- ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হয়। যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ দূষণ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাই সরকার কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরী ও প্রয়োগ করতে পারে।
- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে জনগণের সম্পদ বণ্টন ও বিতরণে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। জনগণের প্রত্যাশা হলো উক্ত ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাই বিত্তশালীদের নিকট থেকে কর আদায় করে তা উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দরিদ্রদের মাঝে পুনর্বণ্টন করে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।
- মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'অস্থিরতা' দেখা দিতে পারে। যেমন মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, বাজার মন্দা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। কোন প্রতিষ্ঠানই এককভাবে এই ধরনের বৃহত্তর সমস্যা সমাধান করতে পারেনা। তাই করারোপ, টাকা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করতঃ তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়বদ্ধতারই অংশ বিশেষ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ধ্রুপদি তত্ত্ব বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিদর্শন যা জনকল্যাণের জন্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সরকারের হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত হস্তক্ষেপ 'বাহ্যিক'। তবে আমরা মনে করি উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সমর্থনযোগ্য। কারণ সরকার যদি বাজার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ না করে তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার কারণে পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই অর্থে বাজার ব্যবস্থার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য। ধ্রুপদী তত্ত্বের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ তত্ত্বটি কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করার অনুমতি দেয়না বরং তাদেরকে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহলে প্রশ্ন হলো: নৈতিকভাবে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করা সমর্থনযোগ্য কিনা? এখন এসবের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে যা নিম্নে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হলো:

২.৭ সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ: ইতোমধ্যে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কোন কোন পণ্ডিত যেমন সিএসআর-এর পক্ষে তাদের যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করে থাকেন তেমনি কোন কোন পণ্ডিত আবার সিএসআর-এর বিপক্ষে তাদের বক্তব্য যৌক্তিক আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সুতরাং সিএসআর-এর পক্ষে যেমন যুক্তি রয়েছে তেমনি এটির বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে। নিম্নে সিএসআর-এর পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো:

২.৭.১ সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে যুক্তিসমূহ: মুনাফা অর্জন করাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র দায়বদ্ধতা হিসেবে মেনে নিলে তা স্বার্থপর বস্তুবাদী মতবাদে পরিণত হবে। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজেরই অংশ। তাই সমাজের অংশ হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে পারে না। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও মুনাফা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি তাদের নৈতিক ও সামাজিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত কর্তব্য বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার ভোগ্যপণ্য ও ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জনসন ও জনসনের চেয়ারম্যান জেমস্ বার্কের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "... a simple moral imperative, namely serving the public in the broadest possible sense better than their competitors."[৪৪] জেমস্ বার্কের বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, বৃহত্তর স্বার্থে টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে যা একটি সাধারণ নৈতিক স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেটি হলো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পোষণের তুলনায় জনগণকে যতদূর সম্ভব বেশি সেবা প্রদান করা শ্রেয়। ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষের যুক্তিসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

২.৭.১.১ ব্যবসায় সম্পর্কে পরিবর্তিত জনপ্রত্যাশা: সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ও অন্যতম যুক্তি হলো ব্যবসায় সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও প্রত্যাশার পরিবর্তন। সমাজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সমাজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে টিকে থেকে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন অত্যন্ত দুরূহ হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অবশ্যই সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়া বাঞ্ছনীয়। অতীতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাজের উৎপাদন ও সরবরাহের বা চাকুরি প্রদানের মাধ্যম বা এজেন্সি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায় সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের পরিবর্তনের কারণ হলো পূর্বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের প্রত্যাশাগুলো পূরণে প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে যার ফলশ্রুতিতে নতুন প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪০ সালে আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম হেরল্ড মাস্লো সমাজের প্রত্যাশা পূরণের বিষয়টিকে মনোবিজ্ঞানের প্রেষণা চক্রের সাথে তুলনা করে ব্যাখ্যা করেন যা মাস্লোর প্রয়োজন উলম্ব স্তর বিন্যাস (Maslow Need Hierarchy) নামে পরিচিত। প্রেষণা চক্র যেমন মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাড়িত করে তেমনি 'মাস্লোর প্রয়োজন উলম্ব স্তর বিন্যাস' অনুসারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমানের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ মানুষের অভাবগুলো প্রাধিকারের ভিত্তিতে পরম্পরায় অবস্থান করে এবং প্রথমে জীবনধারনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানো হয়। মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ হওয়ার পরই অন্যান্য প্রয়োজন যেমন সামাজিক প্রয়োজনগুলো পূরণে প্রয়াসী হয়। এভাবে মানুষ ক্রমান্বয়ে তাদের অভাবগুলো পূরণ করে।[৪৫] তবে প্রত্যেকের প্রয়োজনের চাহিদা অবশ্যই অভিন্ন নয় এবং মানুষের প্রয়োজনগুলো প্রকাশ করার ধরণও ভিন্ন। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতাসম্পর্কে এখানেও মতানৈক্য বিদ্যমান। আব্রাহাম মাস্লো এর তত্ত্ব মূলত জন প্রত্যাশার মৌলিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জনগণের চাওয়া পাওয়াগুলো যেহেতু উন্নত জীবনযাত্রার মানের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেহেতু ব্যবসায় ও সমাজের সম্পর্কও নতুনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে। সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা হলো মানুষের পরিবর্তিত প্রত্যাশা পূরণে জীবযাত্রার মান উন্নতকরণে সহায়তা করা।

২.৭.১.২ সিএসআর সম্পর্কে নৈতিক যুক্তি: সিএসআর-এর পক্ষে নৈতিক যুক্তিটি হলো এ অধ্যায়ের সবচেয়ে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে আমেরিকার নীতিদার্শনিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা একটা বাধ্যবাধকতার পদ্ধতি প্রদান করেছেন যেখানে তিনি তিনটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৬] (ক) ক্ষতি পরিহার করা: কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতি করার কোন অধিকার নেই যদি না নৈতিক যুক্তি অগ্রাহ্য করার কোন বাধ্যকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী না থাকে। এটাকে অনেকে ঋণাত্মক কর্তব্য পালনও বলে থাকেন। (খ) ক্ষতি প্রতিরোধ করা: এটি আরো কম বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নীতি এবং এই দায়বদ্ধতা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এবং (গ) অন্যের জন্য ভালো কাজ করা: এটি সমাজের জন্য কল্যাণ করার একটা পরামর্শপত্র। এটাকে অনেকে ইতিবাচক অর্থে কর্তব্য পালনও বলে থাকেন। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কাউকে কোন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ি করতে হয় তাহলে সেখানে কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হয়।[৪৭] যেমন (অ) ন্যায়পরতা অনুসারে কাজ করা; (আ) অযৌক্তিক ক্ষতি যা পরিহার্য করা যায় না এবং (ই) সুনিশ্চিতভাবে ক্ষতি প্রতিরোধ করা। প্রশ্ন হলো: প্রতিষ্ঠানকে কি কোন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ি করা যায়? হ্যাঁ, উল্লিখিত শর্তাবলী যদি কোন প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে যা তাহলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানকে দায়ি করা যায়।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানকে দায়ি করার ক্ষেত্রে যেসব যুক্তিসমূহ বিবেচিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো:[৪৮]

- প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দূষণের ন্যায় বিভিন্ন রকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ কারণে সমাজের চাহিদা হলো, "Society desires that business should participate and bear a part of the cost of controlling environmental pollutions and minimizing ill effects caused by environmental pollution."[৪৯] এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কারণে যেহেতু পরিবেশের দূষণ সংঘটিত হয় সেহেতু উক্ত সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতাও প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে। আবার উক্ত সমস্যা যদি অদূর ভবিষ্যৎ উদ্ভূত হয় তাহলেও প্রতিষ্ঠানকেই এর সমাধানকল্পে এগিয়ে আসতে হবে।
- সমাজের শক্তিশালী কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের যথোচিত ব্যবহার নিশ্চিত করাও প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ সামাজিক শক্তি ও সম্পদের সমন্বয় সাধন করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানে অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমই সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এসব প্রভাব বিস্তার পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে, পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে, পণ্য সেবার মাধ্যমে, কর্মরত কর্মীর মাধ্যমে অথবা প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন কার্যক্রম দ্বারা হতে পারে। এসব প্রভাব ইবিাচক, নেতিবাচক অথবা নিরপেক্ষ যাই হোক না কেন প্রতিষ্ঠান এর দায় এড়াতে পারে না। কারণ মনে রাখতে হবে উক্ত কর্মকাণ্ড কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হলেও সেটা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই হয়ে থাকে যা ব্যক্তির নিজের জন্য নয়।
- প্রতিষ্ঠানকে কেবল শেয়ারমালিকদের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করলে চলবে না বরং প্রতিষ্ঠানকে তার অংশিজনদের (ভোক্তা, সরবরাহকারী, আঞ্চলিক সম্প্রদায়) স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে। কারণ অংশিজনরাও প্রতিষ্ঠানের অংশ এবং ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদেরও অনেক বড় ভূমিকা থাকে।

উপরের যুক্তিগুলো বিবেচনা করে বলা যায়, সমাজের স্বাধীন, অস্তিত্বশীল ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা রয়েছে যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অস্বীকার করা যায় না।

২.৭.১.৩ সরকারি নিয়ন্ত্রণ পরিহার: সমাজে প্রচলিত আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবাসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়দায়বদ্ধতা পালন করে নিজেদেরেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য। সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা অনেক সময় ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁদের স্বাধীনভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে না। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সমাজের চাহিদা মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা চান। কিন্তু বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীরা যখন সামাজিক লক্ষ্যগুলো পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তখন সরকারের কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাই সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বাড়তি চাপ প্রয়োগ করেনা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বৃহৎ পরিসরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে সেক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক দায়িত্ব অনেকাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু এটিও ঠিক যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সব ধরনের সামাজিক সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা সম্ভব নয়। তাই আমেরিকার ইয়েল ল স্কুলের অধ্যাপক জন জি. সিমন, আমেরিকার ইয়েল ডিভাইনিটি স্কুলের সামাজিক নীতিবিদ্যার অধ্যাপক চার্লস ডব্লিউ পাওয়ার্স ও আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়া স্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস স্টাডিজের অধ্যাপক জন পি গানম্যান কোন্ ধরনের সামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারে তার একটি নমুনা প্রদান করেন। এগুলো হলো: চাহিদার আশু প্রয়োজনীয়তা; ঐ চাহিদার সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ব্যাপকতা; কার্যকরভাবে সমস্যা মোকাবেলা করার সক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ব্যতীত সমাধান অসম্ভব এমন চাহিদা।[৫০] কোন প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করলে রাষ্ট্রের নিকটও তাদের সুনাম বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের কড়া নজরদারি থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা আমেরিকার বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মার্ক এন্ড কোম্পানির বিষয়টি উল্লেখ করেছি যারা ব্যবসায় মুনাফা অর্জনকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা না করে নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে 'River Blindness' নামক রোগটি দূরীকরণের জন্য ঔষধ তৈরী করে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়কে মুনাফাকেন্দ্রিক কার্যক্রমের গণ্ডির বাহিরে নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের এ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একদিকে যেমন সুনাম অর্জন করতে সহায়ক হয়েছে তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনের নজরদারি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে সুনাম অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের কঠোর আইনকানুন ও কর প্রদান থেকেও ছাড় পেতে পারে। তাই এ যুক্তির

ক্ষেত্রে বলা চলে, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ীরা শুধু জনগণের জীবনমান উন্নয়নেই ভূমিকা পালন করে না নিজেদের স্বার্থও সংরক্ষণ করার সুযোগ পায়।

২.৭.১.৪ সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শ: সমাজে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির মত ব্যবসায়ীরাও সমাজের একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি মেনে চলেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনো সমাজের সংস্কৃতি ঐ সমাজের মানুষের আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তি, আইন ও বাজারের নিয়মের মতোই এটিও অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। সমাজের নিয়ম-নীতি তথা সংস্কৃতি পরিবর্তন হওয়ার সাথে ব্যবসায়ীদের আচরণেও পরিবর্তন আসে। বর্তমান সমাজও সামাজিক দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি চর্চা করছে। তাই ব্যবসায়ীরাও অপরিহার্যভাবে সামাজিক দায়িত্বের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। উপযোগতত্ত্বের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায়, আধুনিককালের ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের স্রেফ অর্থনৈতিক উপযোগিতায় সন্তুষ্ট নন, বরং প্রতিষ্ঠানের আরও অনেক উপযোগিতা চান। তাই অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কোম্পানিকে তারা সামজিক লক্ষ্য অর্জনের বাহন হিসেবেও ব্যবহার করেন। এই তত্ত্বের অন্যতম একটি সংস্করণ হচ্ছে 'Lexicographic Utility Theory'। এই তত্ত্বানুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তির উপযোগিতা অণ্বেষণে কাজ করে 'মাস্লোর প্রয়োজন উলম্ব স্তর বিন্যাস' এর মতোই একটি নির্দিষ্ট প্রাধিকারের ভিত্তিতে।[৫১] অর্থাৎ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করা। কোনো ব্যবসায়ীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করা। তাই এটি অর্জন সম্ভব হবে তখনই যখন অন্যান্য লক্ষ্য যেমন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য নিরসন, ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া যায়। তাহলে এই যুক্তি অনুযায়ী, কোনো ব্যবসায়ীর মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে সচেষ্ট হন। অর্থাৎ এভাবে কোন প্রতিষ্ঠান যদি সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে তাহলে প্রতিষ্ঠান সমাজের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের জন্য টেকসই হবে যা নিরাপদ, শিক্ষিত, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এরূপ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ই লাভবান হবে যাকে আমরা Win-win situation হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

২.৭.১.৫ ব্যবসায়ের জন্য উন্নত পরিবেশ: সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধিকতর উন্নত পরিবেশ পাওয়া যায়। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সমাজিক অবদানে সচেষ্ট হয় তাহলে সমাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমিক নিয়োগ আরো সহজতর হয় এবং তাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কাজের মানও উৎকর্ষতা অর্জন করে। তাই কর্মচারীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রতারণা করা, ফাঁকি দেয়া ও অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা হ্রাস পায়।

সমাজের উন্নয়নের ফলে অপরাধের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ফলে নিরাপত্তা ব্যয় কমে আসে ও পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত করও কমে আসে। সমাজের বাকি সকল ক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। এই যুক্তিটি আসলে টেকসই ব্যবসায়ের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের একটি সূক্ষ্ম অথচ জটিল ধারণা। কেননা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সামাজিক কার্যক্রমের জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অলাভজনক। কিন্তু গভীর পর্যক্ষেণ করলে দেখা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় প্রদান করেনি তারা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই ব্যবসায় ও সমাজ উভয়ই সমভাবে উপকৃত হয়ে থাকে যা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক অবস্থা (Win-win situation)। তাই উত্তম সমাজ এবং স্বার্থক ও টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সিএসআর যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তা অনস্বীকার্য। যেমন ডাচ বাংলা ব্যাংক দীর্ঘদিন সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনার পাশাপাশি নানারকম সামাজিক দায়বদ্ধতাও পালন করছে। বাংলাদেশে ডাচ বাংলা ব্যাংক ২০১৩ সালে ২৫১৮ জন দরিদ্র ও মেধাবী স্নাতক পর্যায়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ২৫০০/=(দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ও পাঠ্য উপকরণ প্রদান করে এবং পোশাক পরিচ্ছদের জন্য বার্ষিক ৬০০০/= (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করে।[৫২] ডাচ বাংলা ব্যাংক শিক্ষার্থীদের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা তাঁরা করতে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল না। তবে প্রতিষ্ঠানটি নৈতিক ও জনহিতৈষি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজটি সম্পন্ন করেছে বলে প্রতীয়মান। ডাচ বাংলা ব্যাংক এরূপ কাজের মাধ্যমে যেমন সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছে তেমনি সমাজের কিছু অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ই স্ব স্ব অবস্থান থেকে লাভবান হচ্ছে যাকে ব্যবসায় নীতিবিদ্যার পরিভাষায় Win-win situation বলা হয় ।

২.৭.১.৬ ক্ষমতার সাথে দায়বদ্ধতার ভারসাম্যতা: এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণে সামাজিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। এই ক্ষমতা দ্বারা তাঁরা বাস্তুসংস্থান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বেকারত্ব, বাজার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সমস্যাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই এই ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যতা আনার জন্য সমপরিমাণের দায়বদ্ধতাও আরোপ করা দরকার। যদি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে তাহলে যেখানেই ক্ষমতা আছে সেখানেই দায়বদ্ধতার ধারণাটিও চলে আসে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর প্রতি তাঁদের দায়িত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর আকার এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বাজার শক্তি বা সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর পরিসরে

প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিথ ডেভিস বলেন যে, "Social responsibility arises from social power"[৫৩] কিথ ডেভিসের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, সামাজিক শক্তির সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ সামাজিক শক্তির ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক দায়বদ্ধতা নির্ধারণ হয়ে থাকে। যেমন মেধা, যোগ্যতা, নৈতিকতা প্রভৃতি দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় মানুষে মানুষের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পরিবারকে সুন্দর ও মসৃণভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে যিনি অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন, অধিক মেধাবী, নৈতিকতা সম্পন্ন গুণের অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাব ও ক্ষমতা পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গের তুলনায় অধিক। তাই উক্ত ব্যক্তির ক্ষমতার প্রভাব যেমন পরিবারের মধ্যে বেশি তেমন পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাও বেশি। কারণ পরিবার মসৃণভাবে পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি উক্ত ব্যক্তির ক্ষমতার অনুশীলনের উপরই নির্ভর করছে। অর্থাৎ ক্ষমতার প্রয়োগ যথাযথ হলে পরিবারটি তার সকল সদস্যদের নিয়ে মসৃণভাবে পরিচালিত হবে নতুবা পরিবারের মধ্যে বিপরীতচিত্র পরিলক্ষিত হবে। পরিবারের উক্ত সদস্যের ন্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতাও একই প্রকৃতির। ব্যবস্থাপক যেমন অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেন তেমন তার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাও বেশি। কারণ তার ক্ষমতার অনুশীলন ও প্রয়োগের উপরই নির্ভর করছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকের ক্ষমতার প্রয়োগ ইতিবাচক হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে নতুবা বিপরীত হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। এই দিক থেকে ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কীত। এই কারণে কিথ ডেভিস বলেন, সামাজিক ক্ষমতা থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তিনি দায়বদ্ধতার কঠোর আইনের (Iron Law) কথাও বলেছেন। কঠোর আইন অনুযায়ী, "যারা দীর্ঘ পরিক্রমায় সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে ক্ষমতার ব্যবহার বা অনুশীলন করে না, তাদের ক্ষমতা টিকে থাকে না।"[৫৪] তাই আকার ও প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতাও অপরিহার্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৭.১.৭ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য সামাজিক সচেতনতা: এই যুক্তিটি 'ক্ষমতার সাথে দায়বদ্ধতার সমন্বয়' যুক্তির সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল যেখানে প্রতিটি সংগঠন একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। তাই যেকোনো একটি সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কোনো কাজের দ্বারা অন্যান্য উপাদানও (যেমন পরিবেশে) প্রভাবিত হয়। প্রাচীনযুগে সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সরল। তাই সমাজের কোনো সংগঠন সামগ্রিকভাবে সমাজের তেমন কোনো ক্ষতি না করেই নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অনেক জটিল আকার ধারণ করায় সেটা

সম্ভব হচ্ছে না। তাই কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তার প্রভাব কতটুকু বিস্তৃত হতে পারে সেটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ একটি গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গাড়ি তৈরি করে সমাজের বিভিন্ন রকম চাহিদা (যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে) যেমন পূরণ করছে তেমন সমাজের বিভিন্নরূপ ক্ষতিও সাধন (পরিবেশ দূষণ) করছে। তাই সমাজের চাহিদা পূরণ ও ক্ষতির পরিমাণ যতটুকু হ্রাস করা যায় তার মধ্যে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রেখে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

২.৭.১.৮ জনসাধারণের নিকট ভাবমূর্তি: সামাজিক দায়বদ্ধতার আরেকটি যুক্তি হচ্ছে এটির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট নিজেদের ভাবমূর্তি উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানই দক্ষ কর্মচারী, অধিক ক্রেতা ও ব্যবসায় সহায়ক অন্যান্য বহু সুযোগসুবিধা পেতে চায়। এগুলো পাওয়া তখনই সম্ভব যখন জনগণের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানের সদর্থক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুক্তি অনুযায়ী, জনগণের চাওয়া পাওয়ার সামাজিক লক্ষ্যগুলোকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। সামাজিক লক্ষ্যগুলো যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ, দারিদ্র নিরসন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি পূরণে যেসব প্রতিষ্ঠান সহায়তা প্রদান করে জনগণের নিকট তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। অধিকাংশ মানুষই এখন সেইসব প্রতিষ্ঠানের সেবা বা পণ্য গ্রহণ করতে চায়, বা সেই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে আগ্রহী হয়। আবার সামাজিকভাবে কাম্য নয় এমন কোনো কাজে প্রতিষ্ঠান সহায়তা বা সমর্থন প্রদান করলে জনসাধারণ সেটাকে সদর্থক অর্থে বিবেচনা করে না। তাই বর্তমানে দেখা যায়, যেসব প্রকল্প থেকে অধিক হারে পরিবেশ দূষণ হওয়ার আশংকা থাকে সেসব প্রকল্পে ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। যেমন 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান পেস্টিসাইড বা কীটনাশক তৈরির নিমিত্তে কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে ইচ্ছুক কিন্তু ব্যাংকসমূহ এরূপ প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ কীটনাশক তৈরিতে যেসব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয় তা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া প্রজাতি বিলুপ্তিতেও ঐসব রাসায়নিক দ্রব্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব বিরূপ সমস্যার কথা বিবেচনা করে ব্যাংকসমূহ নিজেদের অর্জিত ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করতে চায় না। ফলে ব্যাংকসমূহ অনেক সময় কীটনাশক তৈরির প্রকল্পে ঋণ দিতে আগ্রহী হয় না। আবার অনেকক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা সমাধান করে এমন প্রকল্পগুলোতে ব্যাংকগুলো স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন স্বল্পসুদে ব্যক্তিগত 'শিক্ষা ঋণ'। কারণ উক্ত ব্যক্তি শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে নিজে যেমন লাভবান হবেন তেমনি সামাজিক উন্নয়নে উক্ত ব্যক্তি সহায়ক ভূমিকা

পালন করতে সচেষ্ট হবে। তাই ব্যক্তিগত 'শিক্ষা ঋণ' প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহও সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে যা তাদের অর্জিত ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করতে পারে।

২.৭.১.৯ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের প্রতুলতা: এটা বলা হয়ে থাকে যে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক মূল্যবান সম্পদ আছে যেগুলো সামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার ফলে ধরে নেয়া হয় ব্যবসায়ীদের কাছে সম্পদের প্রাচুর্যতা আছে এবং অর্থ ব্যয় করলেই সমস্ত সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতপক্ষে যেসব প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে তা হলো দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা এবং মূলধন। কিন্তু সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্ভবত তিনটি সম্পদের সন্নিবেশ ঘটানো দূরহ একটি ব্যাপার। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা থাকে না। কিন্তু সামাজিক সমস্যাবলী নিরসনে তাদের প্রচুর জ্ঞান থাকে। তাই বলা যায়, এইসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বয় করে কাজ করতে দেয়া হয় তবে সম্ভাব্য সাফল্যের হার বেড়ে যাবে। আবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত কর্মপরিবশ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় নিত্য নতুন পন্থা বা কর্মকৌশল আবিষ্কারে নিজেদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ দুটো গুণের সন্নিবেশ ঘটিয়ে সামাজিক সমস্যা নিরসনে চেষ্টা অব্যাহত রাখা আজকের দিনে প্রয়োজন।

২.৭.১.১০ সমস্যাকে মুনাফায় রূপান্তর: প্রথাগত ব্যবসায় ধারণা অনুযায়ী, ব্যবসায়ের নিত ্যনতুন প্রযুক্তি ও পন্থা উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে বর্তমানে বিরাজমান অনেক সামাজিক সমস্যাকে সমাধান করতঃ মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তবে এটা সত্য যেসব ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য যা ব্যবসায়ীদের সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতে আরো বেশি উৎসাহিত করবে। যেমন ফ্লোরিডার ফসফেট খনিজ উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভাবন করেছে যে, খনন কাজ শেষে খনিজ সম্পদ উত্তোলন হওয়ার পর পরিত্যক্ত জমিকে হ্রদে পরিণত করা যেতে পারে।[৫৫] উক্ত হ্রদের তীরকে আবাসন প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হলে ব্যবসায় মুনফা অর্জন যেমন সম্ভব হবে তেমনি জনগণের আবাসন সংক্রান্ত সমস্যাও পূরণ করা সম্ভব যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জনগণ উভয়ের জন্য লাভজনক বা Win win situation।

২.৭.১.১১ বাজারের ন্যূনতম নৈতিক দায়বদ্ধতা: অদৃশ্য হাত কাজ করার জন্য ন্যূনতম কিছু নৈতিক শর্ত মেনে চলা আবশ্যক। মিল্টন ফ্রিডম্যান ক্রীড়া নিয়মের কথা বলেছেন যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এটি দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন "প্রতারণা ছাড়া একটি উন্মুক্ত স্বাধীন ও নৈতিক

নীতিমালা মেনে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করা।"[৫৬] আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক থিওডর লেভী তাঁর 'The Dangers of Social Responsibility' প্রবন্ধে বলেছেন, ব্যবসায়ের কেবলমাত্র একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং তা হলো ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহারিক আদর্শ যেমন সততা, উত্তম বিশ্বাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করবেন।[৫৭] এসব বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কর্মচারী, ক্রেতা, জনসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার, বিক্রির ক্ষেত্রে প্রতারণা, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি বর্জন এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজের কাজ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। যেসব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র এই ন্যূনতম শর্ত মেনে চলে তারা নিজেদেরকে সামাজিক সমস্যা নিরসন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্মুক্ত রাখে। এভাবে সমাজের প্রত্যাশাগুলো নিজেদের কর্মসূচীতে আত্তীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

২.৭.১.১২ সমাজের নাগরিক হিসেবে সিএসআর: প্রতিষ্ঠান হলো সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি সমাজকে উন্নত করা বা বিশ্বকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানেরও সেই দায়বদ্ধতা রয়েছে। সর্বোপরি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। ফলে যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে একজন ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় – সেসব অর্থে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। তাই ব্যক্তি নাগরিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠানেরও নাগরিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে যদি কোন প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রেতা বা ভোক্তা কর্তৃক পুরুস্কৃত হবে অন্যথায় উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রেতা বা ভোক্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের *The Economist* পত্রিকা কর্তৃক পরিচালিত জরিপের উপাত্ত থেকে বলা যায় যে, যেসব প্রতিষ্ঠান খুব বেশি সফলতা অর্জন করেছে এর মধ্যে ৫০% ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাইক অন্যতম।[৫৮]

২.৭.১.১৩ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম: চিকিৎসাবিদ্যায় ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Prevention is better than cure." অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে একটি চূড়ান্ত যুক্তি এই যে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এখন সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে না আসে তবে ভবিষ্যতে সমস্যা হয়তো আরো বেড়ে যাবে। বলা বাহুল্য, তখন হয়ত সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় থাকবেনা। তাই এইসব সামাজিক সমস্যার প্রতিকার হবে এই আশায় বসে না থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিরোধের সুযোগ দেয়া উচিত। এটি অনস্বীকার্য

যে,সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে আলোচিত সকল যুক্তিগুলো সমান গুরুত্ব বহন করে না। আবার একটি যুক্তির সাথে অপরটি পারস্পরিক ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু এই সকল যুক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখলে সামাজিক দায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী খুঁজে যুক্তি পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসার নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি, যদি কোন সমস্যা সর্বাধিক মানুষের মঙ্গলের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে তাহলে সমাজের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা থেকেই উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠানের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আবার ঐ সমস্যা যদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে, অথবা ঐ সমস্যা সমাধান করার মতো সম্পদ ও সক্ষমতা যদি প্রতিষ্ঠান অর্জন করে থাকে, এবং প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ঐ সমস্যা সমাধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে আসাই হবে নৈতিকভাবে যথার্থ। কারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়ার জন্য যেহেতু সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন এলাকার ভূমি, কাঁচামাল, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী, শিক্ষিত দক্ষ জনবল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ব্যবহার করছে তাই সমাজের প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা রয়েছে যা কেউ কেউ ঋণ হিসেবেও বিবেচনা করেন। এ ঋণ পরিশোধ করার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই এগিয়ে আসা উচিত। অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসা উচিত। ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অর্থই হলো একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তা উভয়ের জন্যই লাভজনক যা বিচারমূলক আত্মস্বার্থ বা সচেতন আত্মস্বার্থ নামেও পরিচিত।

২.৭.২ সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ: ব্যবসায়ের প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের নীতিবোধ প্রচলিত ছিল যা আমেরিকার বিখ্যাত ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যারল্ড ডি. কুঞ্জ এবং সাইরিল জে. ও'ডোনেল তাঁদের *Principles of Management* গ্রন্থে বলেন, “The business of business is business.”[৫৯] এই বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ তারা মনে করেন ব্যবসায়ের একমাত্র কাজ হলো মুনাফা অর্জন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন। তারা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষে যেসব যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন তা নিচে আলোচনা করা হলো:

২.৭.২.১ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতব্দীতে ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস, ইংরেজ দার্শনিক জন লক এবং ইংরেজ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথদের মতো খ্যাতনামা দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদগণ মানব প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে বলেছিলেন সমাজের সর্বোত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

হবে তাই যা ব্যক্তি স্বার্থকে স্বীকৃতি অথবা প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি এই আবেদনকে আত্মরক্ষামূলক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। ফলে উপযোগবাদের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিতে যে ধ্রুপদি তত্ত্বগুলো উদ্ভাবিত হয়েছিল তা ছিল আত্মরক্ষামূলক। এসব তত্ত্বের প্রবক্তাগণের মধ্যে অন্যতম হলেন অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ যিনি আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসেবে সমাদৃত। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (১৭৭৬) গ্রন্থে বলেন দুই জন ব্যক্তি যদি একই বস্তু চায় তাহলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য এবং তারা যদি প্রত্যেকেই পৃথক বস্তু চায় তাহলে তা উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক। আর এটি সম্ভব হতে পারে উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য। এই দিক বিবেচনা করে এডাম স্মিথ বলেন, "... if we all pursued our own business interests, society would be better served. An "invisible hand" coordinated individual self-interested behavior so that social good resulted."[৬০] এডাম স্মিথের বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, আমরা যদি প্রত্যেকে স্বীয় ব্যবসায় স্বার্থ অন্বেষণ করি তাহলেই সমাজ উত্তমভাবে পরিচালিত হবে এবং 'অদৃশ্য হাত' ব্যক্তি স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। নব্য-উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তারপরও তিনি মনে করেন যে, "People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise pieces". Business does not operate in vacuum. Firms and corporations operate in the social and natural environment."[৬১] এডাম স্মিথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, আনন্দ ও বিনোদন ভিন্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও একই ধরনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত অনেকে একত্রে মিলিত হলে তারা সর্বদা জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং দ্রব্য বা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে বিভিন্নরকম দুষ্ট কৌশল বা ফন্দি তৈরি করে যা মোটেই কাম্য নয়।

২.৭.২.১.১ অদৃশ্য হাত: ব্যবসায় নীতিবিদ্যা তথা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় 'অদৃশ্য হাত' কথাটি বহুল আলোচিত ও প্রচলিত। প্রকৃত পক্ষে ধ্রুপদী তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাতের' ('Invisivle hand') দক্ষতার উপর। 'অদৃশ্য হাত' এর অপর নাম হলো বাজার ব্যবস্থা। এবার একটি উদাহরণের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা বা 'অদৃশ্য হাত' বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। যেমন প্রতিদিন আমরা সকালে প্রাতঃরাশ বা নাস্তা করে থাকি। সকালের এই নাস্তা পরিবারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সকালের নাস্তায় কেউ কেউ রুটি, সব্জি, ডিম, ভাত, ডাল, বর্তা, চা, কফি, বিস্কুট প্রভৃতি খেতে খেতে খবরের কাগজ বা পত্রিকা পড়ে থাকেন। নাস্তার এসব উপাদানের ক্ষেত্রে একটা বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক পৃথক জায়গায় উৎপন্ন বা তৈরি হয়। প্রশ্ন হলোঃ কোন

শক্তির বলয়ে নাস্তার উপাদান সামগ্রী একই টেবিলে একত্রিত বা জড়ো হলো? এবার খাবারের টেবিলের খবরের কাগজের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক্। খবরের কাগজের উপাদান হয়তোবা পৃথিবীর কোন এক দেশ থেকে এসেছে এবং উক্ত মণ্ড কাগজের কলে এসে প্রথমে কাগজ হলো এবং পরবর্তীতে উক্ত কাগজ প্রেসে গিয়ে পরিণত হলো খবরের কাগজে। খবরের কাগজ তৈরিতে যারা অবদান রেখেছে তারা হলো সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, প্রেসকর্মী, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। পরবর্তীতে হকারের সহায়তায় খবরের কাগজ এসে পৌঁছায় আমাদের খাবারের টেবিলে। প্রশ্ন হলো: কোন শক্তির বদৌলতে খবরের কাগজ এসে নাস্তার টেবিলে পৌঁছেছে? আধুনিক অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ এ শক্তির নাম দিয়েছেন 'অদৃশ্য হাত' যা বাজার ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে হলে তা নির্ভর করছে বাজার ব্যবস্থার উপরে। বাজার ব্যবস্থার দক্ষতার উপরই নির্ভর করবে সর্বাধিক পণ্য উৎপাদন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন প্রভৃতি। তাই বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজনীয় এবং বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবর্তে একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হতে পারে যা মোটেই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কাম্য নয়। বাজার ব্যবস্থার এরূপ ব্যর্থতার কারণেই সরকারকে প্রয়োজনে বাজার ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়। যেসব পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন বা ভোগ করলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ছাড়াও অন্য মানুষ উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেসব পণ্য বা দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।[৬২] অর্থাৎ এখানে দুটি বিষয় জড়িত। একটি হলো নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি (Negative externality) এবং অপরটি হলো পজিটিভ এক্সটার্নালিটি (Positive externality)। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

২.৭.২.১.১.১ নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি: নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি হলো অর্থনৈতিক লেনদেনের এমন একটা ব্যয় যেখানে তৃতীয় পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে ঐ লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লেনদেনে উৎপাদক এবং ভোক্তা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হতে পারে। এক কথায় যখন কোন পণ্য বা দ্রব্য ভোগ করার বা উৎপাদনের কারণে তৃতীয় পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে উক্ত পণ্য ভোগ বা উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাকেই নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি বলে। যেমন কোন এক এলাকার ইট ভাটায় ইট তৈরি করা হয়। ইট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাতাস দূষিত হচ্ছে। বাতাসে দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের শারীরিক, মানসিক, ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ইট উৎপাদন একদিকে যেমন ক্রেতাদের উপকারে আসছে অন্যদিকে অন্যান্য সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে। এই অপকার সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি। ইট উৎপাদকারীদের নেগেটিভ এক্সটার্নালিটির জন্য কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। তাই তাদের পণ্যের বাজার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকে। আবার ইটের মূল্য কম হওয়ার কারণে তা বাজারে বেশি বিক্রি হবে এবং বিক্রি বেশি হলে সামাজিক অপকারের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রস্তুতকারকদের প্রান্তিক খরচের (ভুমি,পুঁজি, শ্রম, জ্বালানি প্রভৃতি) পাশাপাশি উক্ত পণ্য উৎপাদনের কারণে সৃষ্ট দূষণের উপর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে করারোপ করা যায় তাহলে সামাজিক যোগান রেখা পাওয়া সম্ভব হবে। এভাবে সামাজিক যোগান রেখা ও চাহিদা রেখা যখন সমান হয় তখনই বাজারের ভারসাম্যতা রক্ষা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে পণ্যের যে মূল্য নির্ধারিত হয় তা পণ্যের ভারসাম্য মূল্য হিসেবে পরিচিত। এই মূল্যের ভারসাম্যতাই সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে যা সবার্ধিক সামাজিক উদ্বৃত্ত (Maximum Social Surplus) নামে পরিচিত। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণেই সামাজিক ভারসাম্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে থাকে। এই ধরনের পণ্যকে ডিমেরিট গুডস (Demerit goods) বলা হয়।[৬৩]

২.৭.২.১.১.২ পজিটিভ এক্সটার্নালিটি: পজিটিভ এক্সটার্নালিটি হলো অথনৈতিক লেনদেনের এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে তৃতীয় পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে ঐ লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও তারা সুবিধা ভোগ করে। এই লেনদেনে তৃতীয় পক্ষ যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন, সম্পত্তির মালিক ইত্যাদি যারা পরোক্ষভাবে সুবিধা প্রাপ্ত হয়। এক কথায় যখন কোন পণ্য বা দ্রব্য ভোগ করার বা উৎপাদনের কারণে তৃতীয় পক্ষ উক্ত লেনদেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়েও সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাকেই পজিটিভ এক্সটার্নালিটি বলে। যেমন একজন ব্যক্তি যখন শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন তিনি – একটি ব্যক্তিগত সুবিধা পান বটে কিন্তু সমাজের বাকী অংশের সদস্যরাও উক্ত সুবিধার সুফল ভোগ করতে পারেন। কারণ ঐ ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তির শিক্ষা লাভের কারণে সমাজের অন্যান্য সদস্যরাও উপকৃত হন। আবার একজন কৃষক যিনি আপেল গাছ রোপণ করেন তখন তিনি মৌমাছি পালককে একটি সুবিধা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মৌমাছি পালক অধিক মধু তৈরির ক্ষেত্রে একটি ভাল উৎস পায়। আমরা বাড়ির আশে পাশে ও উঠুনের সামনে নানা ধরনের গাছ রোপণ করে থাকি। এ গাছ বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের নানা রকমের উপকার হয়ে থাকে। যেমন গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ উন্নত করে, যা আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আবার গাছ বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ফল দেয় যা আমরা নিজে খেয়ে থাকি ও অন্যান্য মানুষকেও আপ্যায়ন করে থাকি। একেই অর্থনীতির ভাষায় পজিটিভ এক্সটার্নালিটি বলে। যদিও এটি পজিটিভ তবুও এটিকে বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলা হয়।

কারণ গাছ রোপণের মাধ্যমে যারা উপকৃত হচ্ছে তারা কিন্তু অর্থের বিনিময়ে এ সুবিধা গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাই গাছ রোপণ করা, রাস্তাঘাট তৈরি করা, কালভার্ট, ব্রিজ প্রভৃতি তৈরি করা সরকারের দায়বদ্ধতা। এসব জিনিসকে অর্থনীতির ভাষায় মেরিট গুডস বা পাবলিক গুডস (Merit goods) বলা হয়ে থাকে। এসব জিনিস প্রত্যেকে পেতে চায় কিন্তু বিনিময়ে কোন রকম অর্থ ব্যয় করতে চায় না। সমাজও জনগণকে বিনে পয়সায় প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করার জন্য উৎসাহিত করে।[৬৪] এ সুবিধাগুলো সাধারণত জনপ্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই করে থাকেন।

আধুনিক অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ কর্তৃক উপস্থাপিত সামাজিক দায়িত্বের বিপক্ষে এটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি। তিনি মনে করেন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে অদৃশ্য হাত বা শক্তি। তাই এই তত্ত্বানুযায়ী, ব্যবসায়ীরা সমাজের উপকার তখনই করেন যখন তারা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন দক্ষতা বাড়ায় ও দ্রব্যের মূল্য কমায়। এসব ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য আত্মস্বার্থ রক্ষা ও মুনাফা অর্জন। কিন্তু 'অদৃশ্য হাত' উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্য কাঙ্খিত পর্যায়ে এনে জনস্বার্থ রক্ষা করতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করে। তাহলে, ব্যবসায়ীরা সমাজের প্রতি তখনই বেশী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন যখন তাঁরা পুরোপুরি নিজেদের ব্যবসায়িক সফলতার উদ্দেশ্যে কাজ করেন এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহকেও তাদের স্ব স্ব কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং এই যুক্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করে সফলতা অর্জন করা কিন্তু সামাজিক লক্ষ্য পূরণ করা নয়। 'অদৃশ্য হাত' প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে কিনা তা নির্ণয় করা দূরহ হলেও এটা বলা যায় যে 'অদৃশ্য হাতের' বিষয়টি সিএসআর-এর পক্ষের কতিপয় যুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ নয়। কারণ এডাম স্মিথ স্বীকার করেছেন যে, "... the market competition that drives self-interested individuals to act in ways that sereve society."[৬৫] এডাম স্মিথের এই বক্তব্য থেকে বলা যায়, বাজার প্রতিযোগিতা ব্যক্তি স্বার্থকে সমাজের উপযোগী করে পরিচালিত করে যা সিএসআর-এর পক্ষে প্রদত্ত কতিপয় যুক্তির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয় বরং সংগতিপূর্ণ। আবার 'অদৃশ্য হাত' তত্ত্বটি উৎপাদন দক্ষতার পাশাপাশি বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করাই হলো জনকল্যাণমূলক কাজ যা সিএসআর-এর পক্ষের কতিপয় যুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২.৭.২.২ সিএসআর যথার্থ নয়: পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সিএসআর নিয়ে সকল পণ্ডিত এক মত পোষণ করেন না। কেউ কেউ সিএসআর-এর পক্ষে বলেছেন। যেমন সিএসআর হলো জনকল্যাণমূলক কাজ করা। আবার কেউ কেউ সিএসআর-এর বিপক্ষে বলেছেন। যেমন মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেছেন যে, সিএসআর যথার্থ নয়। আলোচ্য অংশে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অংশে ‘সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যান’ এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করা হবে এবং দ্বিতীয় অংশে‘সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যানের মত প্রত্যাখান’ বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করা হবে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

২.৭.২.২.১ সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যান: ১৯৭০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মিল্টন ফ্রিডম্যানের বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits" শিরোনামে *The New York Times Magazine* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দাবি করেন যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধ্রুপদি তত্ত্বের মূল নীতিই হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন আইন অনুসরণ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।[৬৬] এভাবে মিল্টন ফ্রিডম্যান সিএসআর-এর বিখ্যাত সমালোচক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সিএসআর-এর বিপক্ষে তাঁর মূল যুক্তিটি কর্পোরেট নির্বাহীদের সাথে সম্পৃক্ত। কর্পোরেট নির্বাহীরা যখন ব্যক্তি হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে পেশাজীবী হিসেবে কাজ করেন তখন তাঁরা কর্পোরেশনের শেয়ারমালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং এমন ক্ষেত্রে কর্পোরেট নির্বাহীরা শেয়ারমালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে নৈতিকভাবে বাধ্য। কেননা ঐ শেয়ারমালিকগণই তাদের নিয়োগকর্তা। তাই মিল্টন ফ্রিডম্যান তাঁর *Capitalism and Freedom* গ্রন্থে বলেন,

> “The view has been gaining widespread acceptance that corporate officials ... have a social responsibility that goes beyond serving the interests of their stockholders…. This view shows a fundamental misconception of the character and nature of a free economy. In such an economy, there is one and only one social responsibility of businesses—to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, without deception or fraud.” [৬৭]

মিল্টন ফ্রিডম্যানের বক্তব্য থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন সকলের দ্বারা স্বীকৃত যে ব্যবসায়ীরা তাদের স্টকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা ছাড়াও সমাজের প্রতি তাদের কিছু দায় রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতির প্রতি একটি মৌলিক ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। এই ধরনের অর্থনীতিতে ব্যবসায়ের সামাজিক দায় শুধুমাত্র একটি এবং তা হলো আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ আইনের ব্যতয় না ঘটিয়ে প্রতারণা ব্যতিরেকে অবাধ এবং মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত থাকা এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণে মনোনিবেশ করা। তাই তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে কর্পোরেট নির্বাহীর ‘সামাজিক

দায়বদ্ধতা' আছে এমনটি বলতে বুঝিয়েছেন যে, যদি কর্পোরেট নির্বাহী সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেন তবে তিনি তা বিনা অনুমতিতে অন্যের অর্থ ব্যবহার করে পালন করছেন বলে প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যদি তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের কারণে শেয়ারমালিকদের মুনাফা কমে যায় অথবা ক্রেতাদের নিকট দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় অথবা কর্মচারীর বেতন কমে যায় তবে তিনি অংশিজনদের অথবা কর্মচারীদের অর্থ খরচ করছেন। অর্থাৎ বর্ণিত উপায়ে যখন কর্পোরেট নির্বাহীগণ কাজ করেন তখন তারা ব্যয় সংকোচনের জন্য অন্যান্যদের উপর এক প্রকার 'কর' ধার্য করেন। কিন্তু কর ধার্য করার যথাযথ অধিকার কেবল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের রয়েছে। তাই মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন যে, 'কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা' বিষয়টি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।[৬৮] তাঁর যুক্তিগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৬৯]

- মিল্টন ফ্রিডম্যান তাঁর "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits" প্রবন্ধে বলেন, "Only people can have responsibilities. A corporation is an artificial person and in this sense may have artificial responsibilities, but "business" as a whole cannot be said to have responsibilities … ."[৭০] তাঁর বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রেই কাজের 'নৈতিক দায়বদ্ধতা' ধারণাটি প্রয়োগ করেছেন। কারণ কর্পোরেশন যেহেতু ব্যক্তি মানুষের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয় সেহেতু সিদ্ধান্তের পরিণতি ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। অর্থাৎ এই দায় কর্পোরেশনের নয় বরং ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই এইসব কাজের জন্য দায়বদ্ধ।
- ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র যে আইনি কাঠামো তৈরি করে তা মেনে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন ব্যবস্থাপক। তাই তাঁর একমাত্র দায়বদ্ধতা হলো আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে কর্পোরেশনের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ও মুনাফা অর্জন করা। এইসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যই ব্যবস্থাপককে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অর্থাৎ শেয়ারমালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনই ব্যবস্থাপকের যথার্থ কাজ। উক্ত কাজ ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপক যদি অন্য কাজে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তা হবে শেয়ারমালিকগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব লঙ্ঘনের শামিল কিংবা ব্যবস্থাপকগণ অথবা নির্বাহীগণ যদি সর্বাধিক মুনাফার পরিবর্তে অন্যখাতে অর্থ ব্যয় করেন তাহলে এটি হবে শেয়ারমালিকদের পকেট থেকে অর্থ চুরি করার শামিল যা কোনভাবেই কাম্য নয়। মনে

রাখতে হবে শেয়ারমালিকগণ বিনিয়োগ করে থাকেন কাঙ্খিত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্যই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জন্য নয়।

- কোনটি সমাজের জন্য সর্বাধিক স্বার্থ রক্ষা করে তা একজন ব্যবস্থাপকের বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ ঐ কাজটি রাষ্ট্র বা সরকারের উপর বর্তায়। তাই সামাজিক সমস্যা মানেই হলো রাষ্ট্রীয় সমস্যা এবং এসব সমস্যা সমাধান করার দায়বদ্ধতা কর্পোরেশনের নয় বরং রাষ্ট্রের। ফ্রিডম্যানের মতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক এইসব সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধান করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন এবং এইসব কাজের জন্য তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষও নন। সুতরাং সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় করা অনধিকার চর্চার নামমাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান সিএসআর-এর কার্যক্রম যথাযথ নয় বলে দাবি করেন। তাঁর মতে, কোনো বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সিএসআর কার্যক্রমের জন্য কেবল তখনই অর্থ ব্যয় করা সম্ভব যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি 'একচেটিয়াভাবে বাজার দখল করে থাকে'। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি পেশাজীবীদের তাদের প্রকৃত যোগ্যতানুযায়ী ন্যায্য বেতন প্রদান না করে কিংবা বাজার দখলের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি ক্রেতাদের নিকট থেকে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে তাহলে ঐ সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে 'এন্টি ট্রাস্ট' ('Anti-trust') আইনের অধীনে বিচারের আওতায় আনা উচিত বলে ফ্রিডম্যান মনে করেন। কারণ এ ধরনের কাজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয় যা কোনভাবেই কাম্য নয়।[৭১]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মিল্টন ফ্রিডম্যান নিজেও আইন বহির্ভূত ও অনিয়ন্ত্রিত পন্থায় মুনাফালাভের কার্যক্রমকে অনুমোদন করেন না। কারণ তিনি নিজেই ব্যবসায়ে ক্রীড়া নিয়মের কথা বলেছেন যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি আরও মনে করেন যে, আপাতঃদৃষ্টিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের কথা হলেও অনেক কর্মকাণ্ডই ব্যবসায়িক তথা ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন স্কুল, কলেজ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে অনুদানের মাধ্যমে সৃষ্ট সুনাম পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। তাঁর এই বক্তব্যের সারাংশ হলো তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোর এইসব কর্মকাণ্ডকে জনহিতৈষী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা না করে মুনাফা লাভের কার্যকরী উপায় হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাহলে, এদিক থেকে বলা যায় তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার মনোভাব থেকে কাজ করার বিরোধী নন। বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার ছদ্মাবরণে মুনাফালাভের প্রসঙ্গটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চূড়ান্ত হিসেবে যদি সামাজিক দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে সেটি আর নৈতিক দিক থেকে

গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ তাঁর মতে নৈতিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্য বিবেচনায় আনা গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৭.২.২.২ সিএসআর সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যানের মত প্রত্যাখান: পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মিল্টন ফ্রিডম্যান মনে করেন সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করার জন্য কর্পোরেট নির্বাহীরা অন্যের অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু এই দাবি আসলেই যথার্থ কিনা তা নিয়ে আমরা একটি বিচারমূলক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করব। মিল্টন ফ্রিডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিটিকে 'করারোপ' ('Taxation') যুক্তি বলা হয়ে থাকে। এই যুক্তি অনুযায়ী, বিনিয়োগকারীরা কাঙ্খিত মুনাফা লাভের আশায় কর্পোরেট নির্বাহী তথা ব্যবস্থাপকদের নিকট অর্থ জমা রাখেন। তাই সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই অর্থ খরচ করা এক প্রকার 'করারোপ'। কিন্তু এই 'করারোপ' যুক্তির অনেক কিছুই যৌক্তিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন ঐ অর্থ যে শেয়ারমালিকগণ দাবি করতে পারেন এ সম্পর্কে মিল্টন ফ্রিডম্যানের বক্তব্য পুরোপুরি সত্য নয়। আবার তাঁর এই দাবি যদি সত্য বলে মেনেও নেওয়া হয় তবে তার মানে এই নয় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তাই 'করারোপ' যুক্তির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা নিচে আলোচনা করা হলো:[৭২]

- শেয়ারমালিকদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের অর্থ এই নয় যে ব্যবস্থাপক যেমন খুশি তেমনভাবে শেয়ারমালিকদের অধিকতর লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সচেষ্ট হবেন। এরূপ কোনো আইনি বাধ্যবাধকতাও শেয়ারমালিকদের পক্ষ থেকে কর্পোরেট নির্বাহীদের প্রতি আরোপ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, একজন সিএনজি চালকের কথা বলা যেতে পারে। একজন সিএনজি চালককে যদি যত দ্রুত সম্ভব ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেয়ার জন্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ এই নয় যে সে ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করে দ্রুত গতিতে সিএনজি চালিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবেন। কেননা যদি সে ট্রাফিক নিয়ম না মেনে গাড়ি চালায় তাহলে তা অন্যদের জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। একইভাবে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে পণ্যের উৎপাদন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বা দূষণ নিয়ন্ত্রণে অধিক অর্থ ব্যয় করার কারণে শেয়ারমালিকদের মুনাফা কমে যাচ্ছে। কিন্তু যদি এই অর্থ ব্যয় করা না হতো তাহলে ঐ দূষণ সমাজের অন্যান্যদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ কারণে মিল্টন ফ্রিডম্যান হয়তো বলতেন ব্যবস্থাপকগণ 'ক্রীড়া নিয়ম' তথা সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন মেনে শেয়ারমালিকদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন। ধরা যাক, এই আইন মেনে কোন এক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কোন মরণব্যাধি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে একটি ওষধ তৈরি করে বাজারজাত করেছে। উক্ত ঔষধ সেবন করার পর লক্ষ্য করা গেল যে তা রোগ নিরাময়

করার পরিবর্তে রোগিকে মৃত্যুর দিকে তাড়িত করছে। তাহলে আইন মেনে ঔষধ তৈরির চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। এদিক বিবেচনা করে বলা যায় যে মিল্টন ফ্রিডম্যান যে ন্যূনতম শর্ত বা নিয়মগুলোর কথা বলেছেন সেগুলো থেকেও অন্যের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করার গুরুত্ব নৈতিকভাবে আরও অনেক বেশি।

- নির্বাহীদের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিনিয়োগকৃত অর্থ নিরাপদ রাখাও তাদের দায়িত্ব। আমরা জানি, ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সমূহ ঝুঁকি থাকে। তাই বিনিয়োগ সুরক্ষিত রাখা ও মুনাফা অর্জন–এ দুটির সাথেই সংগতি রেখে চলতে গেলে নির্বাহীগণকে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই সমাজের যৌক্তিক প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে বা স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। এ কারণে জন রেমন্ড বোটরাইট এবং বিভু প্রসন পাত্র তাঁদের *Ethics and the Conduct of Business* গ্রন্থে বলেন, "Friedman admits the legitimacy of acts of social responsibility as long as they are ultimately in the self-interest of the corporation."[৭৩] এই বক্তব্যকে পর্যালোচনা করে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে মিল্টন ফ্রিডম্যান সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রমের বৈধতাকে স্বীকার করছেন। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য হলো কি পরিমাণ স্বার্থকে সংরক্ষণ করে প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা যাবে না – এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে দায়িত্ব পালনের পরিধি বা ব্যাপকতা নিয়ে।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ারমালিকদের উদ্দেশ্য কেবল অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন নয় বরং তাদের অধিকাংশই মনে করেন সামাজিক দায়িত্ব পালনে সফলতা অর্জনও প্রতিষ্ঠানের কাম্য হওয়া উচিত। কারণ শেয়ারমালিকগণও সমাজের সদস্য, ভোক্তা, পরিবেশ সুবিধাভোগী এবং রাষ্ট্রের নাগরিক। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা এরূপ কোনো দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হয় তখন ঐ শেয়ারমালিকগণও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যেও এগুলো অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, শেয়ারমালিকগণ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কাজের বিরোধীতা করেন; আবার কোনো কোনো কাজের পক্ষে থাকেন। অর্থাৎ কোনো কোনো শেয়ারমালিক হয়তো কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক কাজের পক্ষে। আবার কোনো কোনো শেয়ারমালিক হয়তো ঐ কাজের বিপক্ষে কিন্তু অন্য কোনো সামাজিক কাজের

পক্ষে। যদি তাই হয়, তাহলে নির্বাহীগণ শেয়ারমালিকদের উপর কর আরোপ করছেন না, বরং নির্বাহীগণ যদি সামাজিক দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে শেয়ারমালিকদের অর্থ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যয় না করে অন্য কাজে ব্যয় করছেন। এক্ষেত্রে বরং এই কাজটিই হবে অনৈতিক। মিল্টন ফ্রিডম্যান হয়তো এক্ষেত্রে বলবেন যে, কোনো শেয়ারমালিক কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে চাইতেই পারেন। এক্ষেত্রে, নির্বাহীগণের উচিত হবে ঐ শেয়ারমালিকদের লভ্যাংশ থেকে ঐ দায়বদ্ধতা পালন করা, প্রতিষ্ঠানের মোট লভ্যাংশ থেকে নয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিষ্ঠানের মোট লভ্যাংশ থেকে ঐ ধরনের দায়বদ্ধতা পালনে অর্থ ব্যয় করাই প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক কার্যকর হবে। সুতরাং বলা যায়, সিএসআর কর্মসূচী বাস্তবায়নে কর্পোরেট নির্বাহীদের নিজস্ব কোন এজেন্ডা থাকে না – বরং তাঁদের কর্মকাণ্ড শেয়ারমালিকদের স্বার্থের অনুকূলেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মচারী, ভোক্তা ও জনগণের ক্রমাগত চাপের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো সিএসআর কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কারণ এসব সম্প্রদায় পণ্য ক্রয় ও প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখেন সেটিও বিবেচনায় রাখেন। গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতি–উভয় ক্ষেত্রে জনগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পরিবেশে জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ভোটের মাধ্যমে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পণ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণ সাধারণত সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে অধিক পরিমাণে ক্রয় করেন যেসব প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে সিএসআর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। যেমন মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠান, স্টারবাক্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী দলমত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁদের সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ফলে অর্জিত সুনামে তাঁদের প্রতিষ্ঠান পরিচিতি লাভ করেছে। আবার কোনো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান অর্জন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে নিত্য নতুন সমস্যার মোকাবেলা করে সমাধানে ভূমিকা রাখছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তার নিজস্ব দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে যা তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবিষ্কৃত।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মিল্টন ফ্রিডম্যান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আইন মেনে মুনাফা অন্বেষণকে ব্যবসায়ের একমাত্র দায়বদ্ধতা বলে গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরাও উপযোগবাদী তত্ত্ব অনুসারে মনে করি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি টেকসই না হয় তাহলে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

পালনও প্রায় অসম্ভব হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হওয়ার জন্য আইন, নৈতিকতা ইত্যাদি মেনে মুনাফা অর্জন করাকে দায়বদ্ধতা বলে মনে করি। তাই ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও এটিই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হওয়ার জন্য মুনাফা অর্জন ব্যতিরেকেও এটি সমাজের অবকাঠামো যেমন রাস্তা, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, শিক্ষিত জনবল, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পরিবহন সুবিধা, জনস্বাস্থ্য, ইত্যাদির প্রতি নজর দেয়া উচিত। কারণ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামোর উপর ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হওয়ার জন্য যেহেতু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজ থেকে এসব উপাদান গ্রহণ করছে তাই সমাজের প্রতি এটির যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এসব কারণগুলো বিবেচনা করে বলা যায়, সিএসআর-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিল্টন ফ্রিডম্যান এর 'করারোপ' যুক্তিটি প্রত্যয়যোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু অকাট্য বা চূড়ান্ত নয় ('Convincing but not conclusive')। তাই শেয়ারমালিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হলে নির্বাহীগণের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

২.৭.২.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে সমাজের ব্যয়: সিএসআর-এর বিপক্ষে একটি মৌলিক যুক্তি হলো অনেক সামাজিক প্রকল্পে ব্যয় অনুপাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এসব প্রকল্পগুলোর খরচ কাউকে না কাউকে বহন করতেই হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের নাগরিকগণ কি এই ব্যয় বহন করতে আগ্রহী? এক্ষেত্রে সমাজের সীমিত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার কীভাবে করা যায়? সমাজ কি এই ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নগুলোর উত্তর তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যা নিচে আলোচনা করা হলো:[৭৪]

- সমাজে অনেক ধরনের বিনিয়োগ হয়ে থাকে এবং উক্ত বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় সে অনুপাতে অনেক কম। অর্থাৎ ব্যয়িত অর্থের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাবলী অনেক কম বা বিপরীতক্রমে প্রাপ্ত সুবিধাবলী থেকে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ প্রাপ্তি বিশ্লেষণ করে এই ধরনের প্রকল্প থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। কিন্তু সমাজ তার সদস্যদের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে এগিয়ে আসে।
- আমাদের সম্পদ সীমিত। পক্ষান্তরে সামাজিক সমস্যার তালিকা অনেক দীর্ঘ। সমাজের সকল সমস্যাই তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলে সমাজই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট থাকে।

- জনসাধারণের মনে একটি ধারণার জন্ম নেয় যে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে তাহলে পরোক্ষভাবে এই ব্যয় বহন করে প্রতিষ্ঠানের মালিক ও স্টকহোল্ডারগণ। নাগরিকেরা সামাজিক কার্যাবলীর সুবিধাগুলো উপভোগ করবে বিনামূল্যে'। সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যয় সম্পর্কে জনসাধারণের এটি হলো একটি ভ্রান্ত ধারণা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এই ব্যয়ভার চূড়ান্ত হিসেবে ভোক্তা ও অন্যান্য অংশিজনদের উপরই চাপিয়ে দেয়। সাধারণ জনগণ যদি অর্থনীতির এই বিষয়টি উপলব্দি করতে পারতো তাহলে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের দাবি করতো না।

২.৭.২.৪ বৃহৎ পরিসরে সহযোগিতার অভাব: সামাজিক দায়িত্বের বিপক্ষে সর্বশেষ যুক্তি হচ্ছে এটি বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের বৃহৎ পরিসরে সহযোগিতা প্রয়োজন তা পাওয়া অনেকাংশে সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বর্তমানে অনেকেই ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে চরমভাবে এ মতের বিরোধিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবী, সরকার প্রভৃতির মধ্যেও মত পার্থক্য বিদ্যমান। এই মত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে নানা দল-উপদল সৃষ্টি হবে। ফলে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়ার পরিবর্তে বরং পরিস্থিতি আরো প্রতিকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। তাই এই ধারণা বাস্তবায়ন করা কতটুকু যুক্তিসংগত তা ভেবে দেখা যেতে পারে।[৭৫]

২.৭.২.৫ সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি: সাধারণতঃ অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকে না। বলা হয়ে থাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। তাদের মতে, সামাজিক সমস্যা যদি সমাধান করতেই হয় তাহলে এ কাজের জন্য অদক্ষ ব্যবসায়ীদের নির্বাচন করা ফলপ্রসূ হবে না। এই ধরনের যুক্তি সবচেয়ে জোরালোভাবে তুলে ধরেন কতিপয় বামপন্থী ব্যক্তি তথা সংগঠন। তাদের মতে, ব্যবসায়ীরা এতোটাই অর্থলিপ্সু ও অমানবিক যে একটি বাড়তি ডলার আয় করার জন্য তারা যে কোনো কাজ করতে পারেন। তাই সামাজিক সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতা তাদের উপর অর্পণ করা হলে এতেও অনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবেন। ফলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবেনা। এই বামপন্থীদের বক্তব্য অনেকটা শ্রুতিকটু বটে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যায় না যে ব্যবসায়ীরা প্রায়শই যে কোনো প্রকল্প থেকেই অনৈতিকভাবে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা সামাজিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে নৈতিক ও যৌক্তিকভাবে অনেকটা উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।[৭৬]

২.৭.২.৬ সামাজিক সম্পৃক্ততায় ব্যবসায়িক ব্যয়: সামাজিক কার্যক্রমের সাথে আর্থিক ব্যয়ের বিষয়টিও জড়িত। সামাজিক কার্যক্রমে যদি প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যধিক বিনিয়োগ করে তাহলে অর্থনৈতিক সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অসীম। তাই দক্ষতার সাথে এই সীমিত সম্পদ ব্যবহার করা না হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই যায়। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জন্য প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে যা তারা অনেক আগে থেকেই করে আসছে। যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে সামর্থ্যের বাহিরে বিনিয়োগের বিষয়টি মেনে নিতে হয় তাহলে প্রান্তীয় কলকারখানার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সেই অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয় এবং চূড়ান্ত হিসেবে কারখানাগুলো নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। সিমেন্ট ও ধাতব পদার্থ উৎপাদনকারী প্রান্তীয় কলকারখানাগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। দূষণ নিয়ন্ত্রণজনিত অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে তারা তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে বা বন্ধ করে দিয়েছে এমন নজিরও বিশ্বে অপ্রতুল নয়।[৭৭]

২.৭.২.৭ ব্যবসায়ের প্রাথমিক লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা: এটা অস্বীকার কারর উপায় নেই যে অনেকের মতে, ব্যবসায়ের প্রধান দায়বদ্ধতা হলো মুনাফা অর্জন। এই মূল কাজ ব্যতিরেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি সামাজিক লক্ষ্য পূরণে অধিকতর মনোনিবেশ করে তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে, ব্যবসায়িক অংশিদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে এবং সর্বোপরি বাজার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোনো ধরনের লক্ষ্য পূরণেই সফল হবেনা। প্রতিষ্ঠানগুলোর এই ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আরো অনেক নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে যার পরিণতিতে ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সামাজিক বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে কোনোভাবে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি জনগণের নিকট ক্ষুন্ন হবে। অধিকন্তু এমন অনেক সামাজিক সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে জনগণ এগিয়ে আসবে যেগুলো পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক প্রকল্পের 'বলির পাঠা' হিসেবে পরিগণিত বা রূপান্তরিত করতে পারে যা মোটেই কাম্য নয়।[৭৮]

২.৭.২.৮ ব্যবসায় সংগঠনগুলোর ক্ষমতা ভোগ: বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা ভোগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। শিক্ষা, হাসপাতাল, সরকার, গৃহ, সমাজের সর্বত্র ব্যবসায়ের প্রভাব বিদ্যমান। তাই সামাজিক কার্যাবলীও যদি ব্যবসায়

সংগঠনগুলোর উপর ন্যস্ত করা হয় তাহলে তারা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করার চেষ্টা করে। তাদের এই দানবীয় ক্ষমতার ব্যবহার স্বাধীন সমাজের অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের (যেমন সরকার, গণমাধ্যম, ইত্যাদি) অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। ব্যবসায় সংগঠনগুলো ইতোমধ্যেই কাম্য সকল ধরনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টায় প্রয়াসী। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা হলে কাম্য ফলাফল নাও আসতে পারে।[৭৯]

২.৭.২.৯ ক্ষমতার আর্ন্তজাতিক ভারসাম্যের দুর্বলতা: সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষের যুক্তিগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত থাকেনা; যা মোটেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সামাজিক কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা যদি ব্যবসায় সংগঠনগুলোর উপর অর্পণ করা হয় তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে যে ব্যয়িত অর্থ সুদাসলে আদায় করবে। এইভাবে সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে যদি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা ঘটে তাহলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা তথা সরবরাহ কমে যাবে। ফলে চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে তারা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হবে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই আইন অভিন্ন। যেসব দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সামাজিক কার্যক্রম চাপিয়ে দেয়া হয় সে সব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কেননা অন্যান্য দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো একই পণ্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম মূল্যে ভোক্তার নিকট সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যাবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সামাজিক দায়বদ্ধতাসমূহ অর্পণ করা কতটুকু যৌক্তিক তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।[৮০]

২.৭.২.১০ জবাবদিহিতার অভাব: এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে জনগণের প্রতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেরূপ জবাদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে ব্যবসায়ীদের সরাসরি সে ধরনের কোনো জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে যেখানে দায়বদ্ধতা নেই সেখানে জবাবদিহিতা থাকতে পারে না। দায়বদ্ধতার সাথে সর্বদা জবাবদিহিতার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যেহেতু জবাবদিহিতা নেই সেহেতু তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা অর্পণ হবে অবিবেচনাপ্রসূত। এজন্য জনসাধারণের সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন নয় বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন।[৮১]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, মিল্টন ফ্রিডম্যানসহ আরো অনেকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিপক্ষে যেসব যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন তা অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষা করা কঠিন। ব্যবসায় মুনাফা অর্জিত না হলে যেমন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা

প্রায় অসম্ভব তেমনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টেকসই হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পেতে পারে। তাই তাঁদের মত পরিপূর্ণভবে মেনে নিলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বার্থপর বস্তুবাদী মতবাদে পরিণত হবে। আমরা মনে করি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে যা আমরা পূর্বেই বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

২.৮ ব্যবসায়ের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনগত, নৈতিক, অর্থনৈতিক, বিভিন্ন রকম সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচলিনা করে থাকে। এ সম্পর্কের বিষয়টি আমেরিকার প্রখ্যাত জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অধ্যাপক জর্জ জি. ব্রেনকার্ট অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন,

> "… Each person participates in the system of free enterprise both as a worker/producer and as a consumer. The two rules interact; if the person could not consume he would not be able to work, and if there were no consumers there would be no work to be done. Even if a particular individual is only (what is ordinarily considered) a consumer, he or she plays a theoretically significant role in the competitive free enterprise system. The fairness of the system depends upon what access he or she has to information about goods and services on the market, and the lack of arbitrary restrictions imposed by the market and/or government on his or her behavior."[৮২]

জর্জ ব্রেনকার্টের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যদি সমাজের বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবসায়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের রূপরেখা বিশ্লেষণ করি তাহলে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিটি ব্যক্তিই কেউ শ্রমিক, কেউ পণ্য প্রস্তুতকারক, কেউ ভোক্তা হিসেবে বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকের ভূমিকাই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কোন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র ভোক্তা হিসেবেও ভূমিকা পালন করে তাহলেও তাত্ত্বিকভাবে সে ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে যদি ক্রেতা না থাকে তাহলে ভোক্তাও থাকে না এবং ভোক্তা না থাকলে বাজারও থাকে না। আর বাজার না থাকলে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি বিভিন্ন শ্রেণি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখে পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় প্রতিষ্ঠানসমূহের

সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে দুটি তত্ত্ব গড়ে ওঠে। এদের একটি শেয়ারমালিকানা তত্ত্ব এবং অপরটি হলো অংশিজন তত্ত্ব। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

২.৮.১ শেয়ারমালিকানা তত্ত্ব: শেয়ারমালিকানা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আইনগত বৈধ মালিকানা হলো স্টকহোল্ডার্স। শেয়ারমালিকানা তত্ত্ব শেয়ারহোল্ডার্স তত্ত্ব নামেও পরিচিত। তাঁরা প্রতিষ্ঠানের স্টক থেকে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে আইনগত স্বত্বাধিকার লাভ করে যা প্রতিষ্ঠানের বাজার অংশিজন নামেও পরিচিত। এই তত্ত্বানুযায়ী সমাজের সদস্যগণ বিকল্প বিনিয়োগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠানের স্টক থেকে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ বাজার মূল্য সৃষ্টি করা এবং রাষ্ট্রীয় আইন মেনে প্রতিষ্ঠানের শেয়ারমালিকদের জন্য অধিক অর্থ উপার্জন ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপক ও বোর্ডের সদস্যদের আর কোন আইনগত দায়বদ্ধতা নেই। এ কারণে আমেরিকার মিনাসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক নরম্যান ই বাউই এবং আমেরিকার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালী লেখক মেগ স্লেইডার তাঁদের *Business Ethics for Dummies* গ্রন্থে শেয়ারমালিকানা সর্ম্পকে বলেন,

> "Management has a fiduciary duty to protect stockholder interests. Fiduciary duty is a legal mandate that requires people in positions of trust to act in the best interests of their beneficiaries. In business, the executive team and the board of directors are the trustees for the stockholders, and the stockholders are the beneficiaries."[৮৩]

নরম্যান ই বাউই এবং মেগ স্লেইডারের বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, ব্যবস্থাপনার জিন্মাদারি দায়িত্ব হলো শেয়ারমালিকদের স্বার্থ সুরক্ষা দেয়া। অর্থাৎ ব্যবসায়ের মুখ্য দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় শেয়ারমালিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া ও সেবা প্রদান করা। দেশে প্রচলিত আইন মেনে মুনাফা অর্জন করাই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যা মিল্টন ফ্রিডম্যানের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে উক্ত মত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্যক্রম শেয়ারমালিকদের মধ্যে সীমিত না করে অংশিজনেদের মধ্যেও বিস্তৃত করেছে। অর্থাৎ শেয়ারমালিক ও অংশিজনদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছি।

২.৮.২ অংশিজন তত্ত্ব: ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় জনপ্রিয় ও প্রভাবের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো অংশিজন তত্ত্ব। এই তত্ত্বানুযায়ী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা শুধু স্টকহোল্ডারদের মধ্যে

সীমাবদ্ধ হলে চলবে না বরং সামাজিক স্টেকহোল্ডারদের মধ্যেও দায়বদ্ধতার পরিধি বিস্তৃত হতে হবে যারা প্রতিষ্ঠানের বহিঃসদস্য হিসেবে পরিচিত।[৮৪] অংশিজন শব্দটি ১৯৬০ সালে ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় পরিচিতি পায়।[৮৫] অংশিজন শব্দটি প্রথমে অভ্যন্তরীণ স্মারকলিপিতে ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড রিচার্স ইনস্টিটিউট ব্যবহার করে।[৮৬] স্ট্যানফোর্ড রিচার্স ইনস্টিটিউট অংশিজন তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন, "those groups without whose support the organization would cease to exist."[৮৭] অর্থাৎ যেসব গোষ্ঠীর সমর্থন ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তাদেরকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশিজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব আবশ্যকীয় গোষ্ঠী বা শ্রেণি হলো কর্মকর্তা, কর্মচারী, মালিক, সরবরাহকারী, ভোক্তা, সামাজিক সম্প্রদায় প্রভৃতি। ১৯৮০ সালে এই তত্ত্বটিকে এডওয়ার্ড ফ্রিম্যান তাঁর "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation" প্রবন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এডওয়ার্ড ফ্রিম্যান এবং রীড উভয়ই অংশিজনকে দু'টি অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন। একটি হলো সংকীর্ণ অর্থে অংশিজন এবং অপরটি হলো বৃহৎ অর্থে অংশিজন। তাঁদের মতে সংকীর্ণ অর্থে অংশিজন হলো, "The "narrow definition" includes those groups who are vital to the survival and success of corporation."[৮৮] তাঁদের মতে, কর্পোরেশনের টিকে থাকা এবং উত্তরোত্তর সাফল্যের জন্য অপরিহার্য গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে সংকীর্ণ অর্থে অংশিজন বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে বৃহৎ অর্থে অংশিজন হলো, "The "wide-definition" includes any group or individual who can affect or is affected by the corporation."[৮৯] তাঁদের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, বৃহত্তর অর্থে অংশিজন হলো সে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাদের দ্বারা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত হয় অথবা যেসব ব্যক্তি বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। এডওয়ার্ড ফ্রিম্যানের এই বক্তব্যকে পরবর্তীকালে আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থমাস ডোনাল্ডসন এবং মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি প্রিসটন দ্বারা সমর্থিত হয়। সুতরাং কর্মচারী, ক্রেতা, সরবরাহকারী, বিনিয়োগকারী, মালিক, ব্যাংক, স্বার্থ গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, গণমাধ্যম, সরকার, সমাজ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীও অংশিজন হিসেবে পরিচিত।[৯০] প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর স্বার্থে সমাজের জন্য মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। এডওয়ার্ড ফ্রিম্যানের মতে, এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে দুটি নীতি মেনে চলতে হয়:[৯১]

- প্রতিষ্ঠান তার অংশিজনেদের সুবিধার জন্য পরিচালিত হওয়া উচিত। অংশিজন বলতে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানকে এসব গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তারা অংশ গ্রহণ করবে এবং তারা তাদের কল্যাণ সংশ্লিষ্টতা বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করবে।

- প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অংশিজন এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের একটা আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠবে। এটি অংশিজন ও তার প্রতিনিধি উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করবে। এটি প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার বিষয়টি যেমন নিশ্চিত করে তেমনি অংশিজনেদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ সুরক্ষার্থেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, অংশিজন তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত নতুন তত্ত্ব। এই তত্ত্বানুযায়ী, বহিঃ পক্ষের (external parties) সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন অধিকতর সহজ হয়। কিন্তু দুর্বল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে অথবা আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হলে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশে দুরূহ হয়ে উঠে। অংশিজনেদের সঙ্গে যদি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্পর্ক কার্যকর থাকে তাহলে একে সবল অংশিজন সম্পর্ক বলে। ফলে অংশিজন তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হলো বহিঃ পক্ষের সঙ্গে সবল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা। তাই প্রতিষ্ঠানের অংশিজনেদের চিহ্নিত করা এবং তাদের স্বার্থে বিশ্বস্থতার সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্যারন এস. সী তাঁর “Sustainability is Applied Ethics” প্রবন্ধে অংশিজনেদের চিহ্নিত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে সাধারণত শেয়ারমালিক, বিনিয়োগকারী, কর্মচারী, গ্রাহক, এবং সরবরাহকারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অংশিজন হিসেবে বিবেচিত। এসব অংশিজনেদের লক্ষ্য, চাহিদা, চাওয়া-পাওয়া, দাবি প্রভৃতি ভিন্ন। যেমন শেয়ারমালিক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের প্রত্যাশা হলো অর্থ বিনোয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ লভ্যাংশ অর্জন করা। পক্ষান্তরে গ্রাহকবৃন্দের উদ্দেশ্য হলো যৌক্তিক মূল্যে উত্তম পণ্য ও সেবা পাওয়া এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হলো তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও মুনাফা বৃদ্ধি করা। এভাবে অংশিজন তত্ত্ব তাঁর অংশিজনেদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিবেশ সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[৯২]

২.৮.২.১ বিভিন্ন প্রকার অংশিজন: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠী বা শ্রেণির সমন্বয়ের প্রয়োজন যা অংশিজন নামে পরিচিত। অংশিজন বিভিন্ন রকম হতে পারে। নিচে কয়েক প্রকার অংশিজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

২.৮.২.১.১ বাজার অংশিজন: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই বাজার অংশিজন (Market stakeholders) নামে পরিচিত। তারা সমাজের নিকট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করে থাকে। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রকম পণ্য বাজারজাতকরণ, পণ্য সরবরাহ, পণ্যের গুণগতমান ও সেবা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজার

অংশিজনেরা ভোক্তা বা সমাজের নিকট পৌঁছে দেয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাজার অংশিজনেদের মধ্যে এটি একটি বিশেষ লেনদেন বলে বিবেচিত যা উভয়মুখী বিনিময় বলেও খ্যাত। যেমন শেয়ারমালিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে থাকে। শেয়ারমালিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ পেয়ে পুঁজিকে আরো সমৃদ্ধ করে। আবার ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্য সুদ ও পুঁজি উভয়ই আদায় করে থাকে। কর্মচারী বা কর্মকর্তাগণ তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবদান রাখে। এই অবদানের বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক, পেশাগত মানোন্নয়ন ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরবরাহকৃত কাঁচামাল, শক্তি ও সেবা প্রভৃতি অর্থের বিনিময়ে প্রদান করে থাকে। পাইকারী বিক্রেতা অথবা খুচরা বিক্রেতা, পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রয়যোগ্য পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই দীর্ঘমেয়াদে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য ক্রেতা বা ভোক্তার প্রয়োজন। কারণ ক্রেতা বা ভোক্তা সাধারণ না থাকলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার থাকবে না যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ব্যবসায় টিকে থাকবে না। এ কারণে, ক্রেতা বা ভোক্তা সাধারণকে বাজারের রাজা বলা হয়।[৯৩] বাজারের রাজাদের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কৌশল নির্ধারণের জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দও থাকে। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন তারই অংশ বিশেষ।

২.৮.২.১.২ বাজারবহির্ভূত অংশিজন: বাজার অংশিজনের বিপরীত হলো বাজারবহির্ভূত অংশিজন (Nonmarket stakeholders)। অর্থাৎ বাজারবহির্ভূত অংশিজনেরা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক লেনদেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক লেনদেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না হলেও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতার কারণে উক্ত অংশিজনেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন সম্প্রদায়, সরকার, এনজিও, গণমাধ্যম, ব্যবসায় সমর্থক গোষ্ঠী, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সাধারণ জনগণ বাজারবহির্ভূত অংশিজনের অন্তর্ভুক্ত। এসব অংশিজনেদের গুরুত্বও কম নয়। কারণ তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য নিজেরা সংকটে পতিত হতে পারে পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।[৯৪]

২.৮.২.১.৩ অভ্যন্তরীণ অংশিজন: প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই হলো অভ্যন্তরীণ অংশিজন। উক্ত অংশিজন তাদের সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবদান রাখে। বাজার অংশিজনেদের মধ্যে কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ হলো উক্ত অংশিজনে অন্তর্ভুক্ত।[৯৫] প্রকৃতপক্ষে কর্মদক্ষতাকে বিবেচনায় রেখেই উক্ত অংশিজনদেরকে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কর্ম

দক্ষতার উপর ভিত্তি করে কোন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন বা বাজারজাতকরণের জন্য পরিচালনা করে থাকে।

২.৮.২.১.৪ বহিস্থ অংশিজন: অভ্যন্তরীণ অংশিজনের বিপরীত হলো বহিস্থ অংশিজন। বহিস্থ অংশিজন হলো তারাই যারা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন করে থাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত নয়। বাজার অংশিজনদের মধ্যে স্টকহোল্ডার্স, বিনিয়োগকারী, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, পরিবেশক এবং বাজারবহির্ভূত অংশিজনদের মধ্যে সরকার, সম্প্রদায়, এনজিও, গণমাধ্যম, বিশেষ ব্যবসায় সমর্থক গোষ্ঠী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভৃতি হলো বাজারবহির্ভূত অংশিজনেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[৯৬] এসব অংশিজন ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.৮.২.১.৫ মুখ্য ও গৌণ অংশিজন: উপরোল্লিখিত অংশিজন ছাড়াও টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ম্যাক্স বি. ই. ক্লার্কসন আরও দুই প্রকার স্টেইকহোল্ডার্সের কথা বলেন। একটি মুখ্য বা প্রাথমিক অংশিজন এবং অপরটি হলো গৌণ বা অপ্রধান অংশিজন। কর্মচারী, ক্রেতা, সরবরাহকারী, সম্প্রদায়, সরকার ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিকে মুখ্য অংশিজন বলে অভিহিত করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, গণমাধ্যম, বাণিজ্য সংঘ, বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী প্রভৃতিকে গৌণ অংশিজন বলে অভিহিত করা হয়।[৯৭]

এ পর্যন্ত উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার অংশিজনেদের প্রকৃতি আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির একটা পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এসব গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতিষ্ঠানের প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে এবং এসব গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতি প্রতিষ্ঠানের যে কর্তব্যবোধ রয়েছে তা এডওয়ার্ড ফ্রিম্যান তাঁর "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation" প্রবন্ধে নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন:[৯৮]

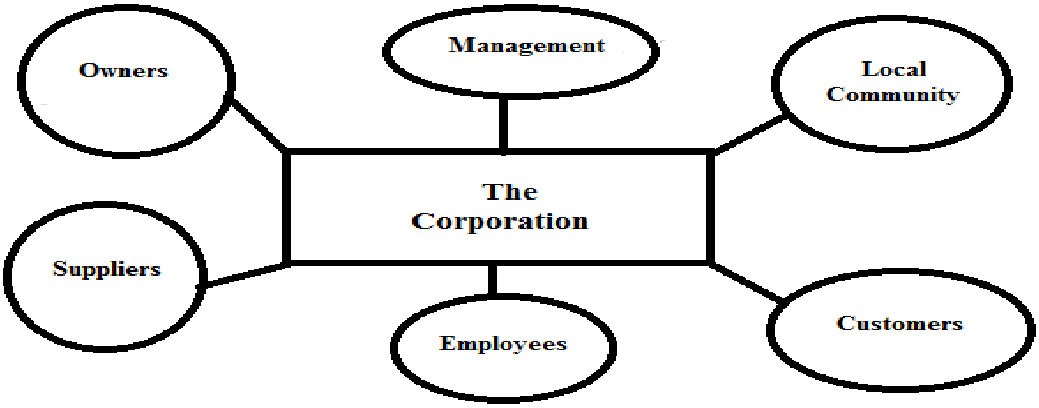

A stakeholder model of the corporation

উপরের চিত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রতিটি গোষ্ঠী বা শ্রেণির সঙ্গেই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মচারীর দায়বদ্ধতা হলো আনুগত্য, সততা, আন্তরিকতা, দক্ষতা, নিষ্ঠার সাথে সর্বোচ্চ সামর্থ্যের মাধ্যমে অবদান রাখা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হলো কর্মচারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পেশাগত মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মানসম্মত কাঁচামাল, বিভিন্ন উপকরণ, সেবা প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা পালন করে থাকে এবং প্রতিষ্ঠান পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে কর্তব্য পালন করে। বিনিয়োগকারীগণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে; ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীকে ন্যায্য ও উৎসাহব্যঞ্জক লভ্যাংশ প্রদান করে। বিনিয়োগকৃত অর্থ কোন খাতে ব্যয় করা হচ্ছে তা বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অবহিত করা হয় ও এভাবে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মুনাফা বৃদ্ধির কাজটি নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলে। এভাবে প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক অটুট রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার চেষ্টা করে। পরিণতিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় যাকে অনেক পণ্ডিত 'Win-win situation' হিসেবে অভিহিত করেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, সিএসআরকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা বা বর্জন করা উভয়ই অত্যন্ত কঠিন। কারণ এটির বিপক্ষে যেমন কেউ কেউ অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন তেমনি এটির পক্ষেও কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। তবে আমরা বলতে পারি, সিএসআর দ্বারা সমাজের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব না হলেও সমাজের ন্যূনতম লক্ষ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে সিএসআর যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি এক সময় ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মুনাফা অর্জন। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবসায়কে ব্যবহার করেছে এবং সামাজিক সমস্যা ছিল উপেক্ষিত। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপ্রয়োগ, প্রতারণা, অনৈতিকতা ইত্যাদি অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়া উচিত নয় এবং ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নৈতিকভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সর্বোপরি মানবিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো আবেদনের সৃষ্টি করেছে। তাই জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন, স্বপ্নদ্রষ্টা নেতৃত্ব, উদ্যোগী প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানুষের চিন্তার জগৎকে সম্প্রসারিত করে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করেছে। এ কারণে আমরা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বলতে পারি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে সমাজে টেকসই হওয়ার জন্য মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি বৃহত্তর

পরিসরে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করাই শ্রেয়। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হলো সমাজের স্বাধীন স্থায়ী সত্তা (ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য বা সদস্যবর্গের মৃত্যু হলেও এটি ধ্বংস হয় না) ও সমাজের প্রাকৃতিক অংশ। সমাজের অংশ হিসেবে এটি সমাজ থেকে বিভিন্ন উপকরণ যেমন ভূমি, পানি, বায়ু, মূলধন, ভৌত-অবকাঠামো, শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল, গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রশাসনিক সহায়তা প্রভৃতি গ্রহণ করছে। এ দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজ দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আবার অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, কর্মচারীদের উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে ন্যায্য বেতন-ভাতা প্রদান করছে, পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে, পণ্য উৎপাদনের উপকরণ তথা কাঁচামাল সরবরাহকারীকে চুক্তি অনুযায়ী ন্যায্য মূল্য প্রদান করছে, পণ্য সরবরাহকারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করছে, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত বা মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করছে, ন্যায্য মূল্যে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ প্রভৃতির মাধ্যম সমাজও উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যা বিচারমূলক আত্মস্বার্থ বা সচেতন আত্মস্বার্থ নামে পরিচিত। তাই টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান যেমনিভাবে নিজের স্বার্থকে গুরুত্ব দিচ্ছে তেমনিভাবে সমাজের স্বার্থকেও সমভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে যা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক অবস্থা (Win-win situation) হিসেবে বিবেচিত হয়। সিএসআর-এর ধারণাটি সময়ের সাথে সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সিএসআর কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা গৌরব বোধ করেন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আরো অধিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সেবক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি এ লক্ষ্যে কাজ করে তাহলে এটি ‘জনস্বার্থের রক্ষক’ বলে পরিচিতি লাভ করবে যা প্রতিষ্ঠান ও জনগণ উভয়ের জন্যই লাভজনক অবস্থা (Win-win situation) হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

১. DeGeorge, R. T. (2011), *Business Ethics*, 7th ed., India: Batra Art Press, p. 200.

২. Bhaduri, S.N. and Selarka E. (2016),“Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies” in *Springer*, Vol. xv, p. 12.

৩. Boatright, J. R. and Patra, B. P. (2011), *Ethics and the Conduct of Business*, 6th ed., India: Dorling Kindersley Pvt. Ltd., p. 431.

৪. Bhaduri, S.N. and Selarka, E., op. cit., p 13-22.

৫. *Ibid.*, p 14.

৬. *Ibid.*

৭. *Ibid.*

৮. Davis, K. (1970), "Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?" in *California Management Review*, p.70.

৯. Bhaduri, S.N. and Selarka, E., op. cit., p. 15.

১০. Barry, V. (1986), *Moral Issues in Business*, 3rd ed., California, USA: Wadsworth Publishing Company, p. 112.

১১. Hay, R., and Gray, E. (1974), "Social Responsibilities of Business Manager" in *Academy of Management Journal*, pp. 135-137.

১২. Bhaduri, S.N. and Selarka, E., op. cit., p. 16.

১৩. *Ibid.*

১৪. Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, p. 53.

১৫. *Ibid.*, p. 54.

১৬. *Ibid.*

১৭. *Ibid.*

১৮. Williams, O. F. (2014), "CSR: Will it Change the World? Hope for the Future: An Emerging Logic in Business Practice" in Journal of Corporate Citizenship, Volume 2014, Number 53, p.13.

১৯. Bhaduri, S.N. and Selarka E., op. cit., p. 18.

২০. *Ibid.*, p. 21.

২১. Schwarts M. S. and Carroll, A. B. (2003), "Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach" in Business Ethics Quarterly, Vol. 13, No 4, p. 509.

২২. Samuel O. I. and Céline L. (2011), "Corporate Social Responsibility: Concluding Remarks"in Samuel O. I. and Céline L. (eds.), *Theory and Practice of Corporate Social Responsibility*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: New York, p. 265.

২৩. Bhaduri, S.N. and Selarka, E., op. cit., pp. 21-22.

২৪. Seay, S. S. (2015), "Sustainability is Applied Ethics" in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 18, p.67.

২৫. "কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর): ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র", বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স, বাড়ি ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯, পৃ. ৮।

২৬. Seay, S. S., op. cit., p. 67.

২৭. Lawrence, A. T. and Weber, J. (2014), *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*, 14th ed., Irwin: McGraw –Hill, p.49.

২৮. Hartman L. P.and Desjardins J. (2011), *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility*, 2nd ed., Irwin: McGraw –Hill, p. 206.

২৯. Rahman, M. Ataur., and Islam, M. Rabiul (2013), *Introduction to Business*, Bangladesh: University Publications, p. 115.

৩০. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 438.

৩১. *Ibid.*, pp. 438-439.

৩২. Williams, O. F., op. cit., p. 15.

৩৩. পরিপত্র-১ (আয়কর)/২০১১।

৩৪. Green Banking and CSR Department, Bangladesh Bank, 2015, p. 25.

৩৫. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 4.

৩৬. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 439.

৩৭. *Ibid.*

৩৮. *Ibid.*, p. 440.

৩৯. *Ibid.*

৪০. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 28.

৪১. *Ibid.*, pp. 46-47.

৪২. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 440-441.

৪৩. *Ibid.*, p. 444.

৪৪. Fernando, A.C. (2012), *Business Ethics and Corporate Governance*, 2nd ed., India: Pearson, p. 230.

৪৫. Davis, K. and Blomstrom L. R. (1975), *Business and Society: Environment and Responsibility,* USA: McGraw-Hill, p. 24.

৪৬. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 34.

৪৭. *Ibid.*

৪৮. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 52.

৪৯. Khan, A R, (2009), *Business Ethics,* Bangladesh: Rubi Publications, p. 55.

৫০. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 443.

৫১. Davis, K. and Blomstrom L. R., op. cit., pp. 26-27.

৫২. "২৫১৮ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির টাকা দিল ডাচ-বাংলা ব্যাংক" (২০১৪), *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ২ ফেব্রুয়ারি, পৃ.৩।

৫৩. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 442.

৫৪. *Ibid.*

৫৫. Davis, K. and Blomstrom L. R., op. cit., pp. 29-30.

৫৬. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 441.

৫৭. *Ibid.*.

৫৮. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 51.

৫৯. Bhuiyan, Md. Nazim Uddin (2015), *Introduction to Business and Business Administration: Concepts and Text*, 3rd ed., Bangladesh: NaSyPeC Publications, p. 24.

৬০. Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), *Business Ethics,* 2nd ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, p. 25.

৬১. Salehi M., Saeidinia, M. and Aghaei M. (2012), "Business Ethics" in *International journal of Scientific and Research Publications*, Volume 2, Issue 1, p. 2.

৬২. রুশদী, আলী আহমাদ (২০১৫), "অ্যাডাম স্মিথের অদৃশ্য হাত", *দৈনিক বণিক বার্তা*, মঙ্গলবার, ৭ জুলাই, পৃ. ৪।

৬৩. *Ibid.*

৬৪. *Ibid.*

৬৫. Velasquez, M. G., op. cit., p. 136.

৬৬. Jesus G. M. and Fernando R. R. C. (2010), “Corporate Social Responsibility and the Classical Theory of the Firm: Are Both Theories Irreconcilable?” in *Rev. Innovar* Vol. 20, Num 37, p. 5.

৬৭. Desjardins, J. (2011), *An Introduction to Business Ethics*, 4th ed., New York: McGraw-Hill, p. 54.

৬৮. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 443-444.

৬৯. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 48.

৭০. Friedman, M. (1970), "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits," in *The New York Times Magazine*, p. 55.

৭১. Davis, K. and Blomstrom L. R., op. cit., p. 31.

৭২. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 446-447.

৭৩. *Ibid.*, p. 446.

৭৪. Davis, K. and Blomstrom L. R., op. cit., pp. 32-33.

৭৫. *Ibid.*, p. 35.

৭৬. *Ibid.*, p. 33.

৭৭. *Ibid.*, pp. 31-32.

৭৮. *Ibid.* p. 33.

৭৯. *Ibid.*, pp. 34-35.

৮০. *Ibid.*, p. 34.

৮১. *Ibid.*, p. 35.

৮২. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 39.

৮৩. Bowie, N. E. and Schneider, M. (2011), *Business Ethics for Dummies*, Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc., p. 163.

৮৪. Weiss, J. W. (2003), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*, 3rd ed., Australia: Thomson South-Western, p. 90.

৮৫. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 61.

৮৬. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 40.

৮৭. *Ibid.*

৮৮. Freeman, R.E. (1994), “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation” in Bowie N. E. and Beauchamp, T. L. (eds.), *Ethical Theory and Business*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, p. 266.

৮৯. *Ibid.*

৯০. McDonald, G. (2015), *Business Ethics: A Contemporary Approach*, Australia: Cambridge University Press, p. 38.

৯১. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 42

৯২. Seay, S. S., op. cit., p. 68.

৯৩. Lawrence, A. T. and Weber, J., op. cit., p.8.

৯৪. *Ibid.*

৯৫. *Ibid.*, p.9.

৯৬. *Ibid.*

৯৭. McDonald, G., op. cit., p. 38.

৯৮. Freeman, R.E., op. cit., p. 267.

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মচারী ও নিয়োগকারীর অধিকার ও কর্তব্য: পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক

৩.১ ভূমিকা: ঐতিহাসিকভাবে লক্ষণীয় যে কর্মচারী ও নিয়োগকারীর সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতিগতভাবে এক রকম কর্তৃত্ব ও অধীনস্থতার, যা অনেক সময় পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত শক্তিসমূহ প্রতিনিয়ত কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার কর্পোরেট দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আরো নানাবিধ নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করে বিতর্কের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। এ প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায়, কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও অধিকার সর্বদা পরিবর্তনশীল বিতর্কবিহীন। বর্তমানে বিদ্যমান বাজার অর্থনীতিতে নিয়োগকর্তার অধিকার ও দায়িত্ববোধ এবং কর্মচারীর অধিকার ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ধারণা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন কর্মচারীরা তাদের মজুরী, সুযোগ-সুবিধা, উন্নত কর্মপরিবেশ, সক্রিয়তা, চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রভৃতি নিশ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে, নিয়োগকর্তা সর্বদা পণ্য উৎপাদন, মুনাফা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ন্যূনতম ব্যয়, পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ, বাজারে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ও মজুরী স্থিরকৃত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহী। এ কারণে বলা যায়, “No perfect boundary exists between employer and employee rights in a capitalist market economy.”[১] অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিতে নিয়োগকারী ও কর্মচারীর দায়িত্ব, অধিকার প্রভৃতির সীমা নির্ধারণ করা যে অত্যন্ত দূরহ কাজ এই উক্তিতে সেই বিষয়টিরই প্রতিফলন দেখতে পাই। কিন্তু ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনার জন্য নানা রকম পক্ষ থাকে। এসব পক্ষের মধ্যে অন্যতম হলো নিয়োগকর্তা বা মালিক, কর্মচারী, ক্রেতা বা ভোক্তা প্রভৃতি। এসব পক্ষের মধ্যে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাকে আমরা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। ফলে নিয়োগকর্তার অধিকার ও কর্তব্য এবং কর্মচারীর অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্কের সফলতার উপরই নির্ভর করে ব্যবসায়ের সফলতা। অর্থাৎ নিয়োগকর্তার অধিকারের সাথে কর্মচারীর কর্তব্য এবং কর্মচারীর অধিকারের সাথে নিয়োগকর্তার কর্তব্যের একটি বিনিময় সম্পর্ক থাকা উচিত। যেমন কর্মচারীর অধিকার হলো কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরী লাভ করা এবং নিয়োগকর্তার কর্তব্য হলো তাঁর দ্বারা প্রতিশ্রুত কর্মচারীদের অধিকার নিশ্চিত করা। যদি কর্মচারী তার বেতনের নিশ্চয়তা পায় তাহলে সে কোম্পানি ও নিয়োগকর্তার অধিকার সম্পর্কেও অধিক সচেতন থাকবে এবং যদি উক্ত ধারায় ব্যতয় ঘটে তাহলে বিপরীত ধারাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাই বলা যায় যে, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর অধিকার হলো একটি পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক এবং এই পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কের সফলতার

উপরই নির্ভর করছে ব্যবসায়ের সফলতা। ফলে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়টি ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

৩.২ অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক: আমরা যখন বলি সকল মানুষ সমান তখন এর অর্থ হলো আমরা প্রত্যেক মানুষকে নৈতিক এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করি। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আমরা যেমন কিছু অধিকার ভোগ করি তেমনি অন্যের অধিকারকে সুরক্ষা দেয়ার অনুরূপ দায়িত্বও আমাদের রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি অধিকার ও দায়িত্ব হলো পারস্পরিক সেতু বন্ধনে আবদ্ধ। এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হলো: যেমন যদি বলা হয় যে, ‘S’ এর জীবনের অধিকার রয়েছে সেক্ষেত্রে অন্যের দায়িত্ব হলো ‘S’ কে হত্যা না করা। আবার ‘N’ এর স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার রয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্যের দায়িত্ব হলো ‘N’ কে বল প্রয়োগ করে কাজ না করানো। ‘I’ এর স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব হলো ‘I’ কে স্বাধীনভাবে কথা বলা থেকে বিরত না রাখা বা প্রতিরোধ না করা। আবার ‘A’ এর গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ অন্যের দায়িত্ব হলো ‘A’ এর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ না করা। অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত এরূপ ধারণাটি আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে যদি বলি কর্মচারীদের প্রতারিত না হওয়ার অধিকার রয়েছে সেক্ষেত্রে মালিকের দায়িত্ব হলো কর্মচারীদের প্রতারিত না করা। এ বক্তব্য বিপরীতভাবেও প্রযোজ্য। আবার যদি বলি মালিকের সম্মান রক্ষা করার অধিকার রয়েছে সেক্ষেত্রে কর্মচারীদের দায়িত্ব হলো মালিককে অসম্মানিত না করা। এটিও বিপরীতভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এ সকল উদাহরণ বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। মনে রাখতে হবে, একজনের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অর্থই হলো অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়া অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা।

নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। অধিকারের ধারণাটি একটি জটিল ধারণা যার প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন অত্যন্ত দূরহ। কারণ অধিকার হলো একটি দ্বিকোটিক ধারণা। অর্থাৎ অধিকার বললে দুজনের প্রসঙ্গ ওঠে। (ক) অধিকারী ও (খ) যার উপর অধিকার (অর্থাৎ অধিকারের বিষয়)। যেমন ‘খ’-তে অধিকার আছে বললে বোঝায় খ-এর উপর আমার মালিকানা বা কর্তৃত্ব আছে এবং খ-এর উপর আমার এই মালিকানা অন্যদের দ্বারা স্বীকৃত।[২] এ সংক্রান্ত আরো উদাহরণ আমি পূর্বে উল্লেখ করে বলার চেষ্টা করেছি যে, অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক বিনিময়ে সম্পর্কে আবদ্ধ।

সাধারণভাবে অধিকার বলতে কতিপয় সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত ব্যক্তির কল্যাণময়, সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ অসম্ভব। তারপরও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিকার হলো নিয়োগকর্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্রেতা, ভোক্তা ইত্যাদি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অধিকার। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অধিকারকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমেরিকার রোজমন্ট কলেজ এবং সেন্টার ফর এথিক্সের (Centre for Ethics) পরিচালক ও দর্শনের এমেরিটাস অধ্যাপক রোনাল্ড ফেলিস্ক ডুস্কার অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর "Employee Rights" প্রবন্ধে বলেন, "A right can be defined as either a capacity, possession, or condition of existence which entitles either an individual or group to the enjoyment of some object or state of being."[৩] অধিকার হলো কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠির নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জন বা অবস্থা উপভোগের জন্য সহায়ক পরিবেশ বা সুযোগ লাভ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাক স্বাধীনতার অধিকার হচ্ছে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার একটি শর্ত যা তাকে তার চিন্তাধারা সঠিকরূপে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। যদি কোনো ব্যক্তির অধিকার থাকে তাহলে অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ঐ অধিকারকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া।

নিয়োগকারী ও কর্মচারীর বিনিময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক অধিকারের বিষয়টির প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধানে। সাম্প্রতিক সময়ে এমন অনেক আইন পাশ করা হয়েছে যা কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্র অধিকতর সহায়ক এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ ও ছাটাই প্রক্রিয়া নির্ধারণ, হয়রানি প্রভৃতি রোধ করে। এসব বিধি-বিধান ও অধিকার আদায়ের পরিমাণ এতই বেড়ে গিয়েছে যে অনেকে এর কঠোর সমালোচনা করছেন। কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলেন যে এগুলো আর কিছুই না বরং অধিকারের নামে অনধিকার চর্চা যা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু এই মতের বিরোধীরা এসব আইন বা নিয়মনীতিকে অধিকারের অন্যায্য বা অনধিকার চর্চা হিসেবে দেখেন না। বরং তাদের মতে এইসব নিত্য-নতুন আইন সমাজে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য। অধিকার সুরক্ষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন এবং মানুষের মর্যাদাকে মূল্যায়নে যিনি অসমান্য অবদান রেখেছেন তিনি হলেন আমেরিকার অন্যতম লেখক এবং বিচারক ব্লাকস্টোন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Commentaries on the Law* এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন,

> "The principal aim of society is to protect individuals in the enjoyment of those absolute rights, which were vested in them by the immutable laws of nature, but which could not be preserved in peace, without the mutual assistance and intercourse of social communities. The primary end of

human law is to maintain and regulate these absolute rights of individuals."[৪]

অর্থাৎ প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইন দ্বারা ব্যক্তি মানুষের যেসব সার্বভৌম অধিকার অর্পিত হয়েছে সেসব অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়াই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সামাজিক গোষ্ঠী বা সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিথস্ক্রিয়া ছাড়া এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অসম্ভব। সুতরাং মানবসৃষ্ট আইনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের ঐসব সার্বভৌম অধিকার রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

অধিকার হচ্ছে কোন কিছুর প্রতি কোনো ব্যক্তির স্বত্ব (Entitlements) বা প্রাপ্যতা। এই স্বত্বাধিকারের কারণে সে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট তার স্বত্ব ন্যায্যভাবে দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব হলো এই ন্যায্য দাবির প্রতি সম্মান দেখানো। এই সম্মান দেখানো হতে পারে ঐ দাবিকৃত বস্তু প্রদানের মাধ্যমে কিংবা তা অর্জনে সহায়তার মাধ্যমে অথবা অন্ততঃপক্ষে ঐ বস্তু অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থেকে। দাবিটি যদি ন্যায্য হয় তাহলে তা তিনটি উপাদান দ্বারা সুরক্ষিত বলে বিবেচনা করা হয়। উপাদান তিনটি হলো প্রকৃতি, মানবসৃষ্ট আইন ও সামাজিক রীতিনীতি। আবার, প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ কোনো ধরনের প্রাকৃতিক অধিকারকে স্বীকার করেন না। তাদের নিকট অধিকার বলতে বোঝায় শুধু সামাজিক অধিকার বা আইনি অধিকার। আইনি অধিকারের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রতিটি মানুষের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সামাজিক অধিকারের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একজন ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে মূলত মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত। মধ্য যুগের ইতালিয়ান দার্শনিক সেন্ট থমাস একুইনাস ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্পত্তির অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। আবার উদারতাবাদের জনক ও ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকও প্রাকৃতিক অধিকার বলতে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে বুঝিয়েছেন যার প্রতিফলন আমরা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় লক্ষ্য করি। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তিন নম্বর ধারায় বর্ণিত হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে।" সমাজ সংস্কারক ও উপযোগবাদের জনক ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "প্রাকৃতিক নিয়ম একটি ভুল অধিবিদ্যার ধারণা থেকে উদ্ভূত; এটি কল্পনাপ্রসূত এবং কোনো কাল্পনিক নিয়ম থেকে শুধু কাল্পনিক অধিকার অনুসৃত হতে পারে, কোনো বাস্তব অধিকার নয়।"[৫] ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমও প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "প্রাকৃতিক অধিকার ধারণাটি বাস্তব সম্মত নয় - এটি সাধারণ মানুষকে বৈপ্লবিক কাজে উদ্দীপ্ত করে এবং এরূপ ধারণা দেয় যে তারা এমন সব জিনিসের অধিকার

পাওয়ার যোগ্য, যা তারা আসলে পায় না।"[৬] সুতরাং অধিকার হলো মানুষের স্বাভাবিক প্রাপ্যতা এবং তার প্রতি সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা উচিত।

অধিকারের প্রকারভেদ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। অধিকারের প্রকারভেদ নিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত সেন্ট বেনেডিক্ট কলেজ এবং সেন্ট জন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও সোসাইটি ফর বিজনেস এথিক্সের (Society for Business Ethics) পরিচালক যোসেফ ডেসজার্ডিন্সের অবদানও কম নয়। তিনি তাঁর *An Introduction to Business Ethics* গ্রন্থে অধিকারকে আইনগত, চুক্তিমূলক ও নৈতিক — এই তিন ভাগে ভাগ করেন। বিচারক কিংবা আইনজীবীগণ শুধু আইনি অধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। যোসেফ ডেসজার্ডিন্স আইনগত অধিকার সম্পর্কে বলেন, "... legal rights granted to employees on the basis of legislation or judicial rulings."[৭] অর্থাৎ সংবিধান ও বিভিন্ন বিচার প্রক্রিয়া দ্বারা আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ অধিকারগুলো হলো সমতার অধিকার, ন্যূনতম মজুরির অধিকার, নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দরকষাকষির অধিকার, কর্মস্থলে আহত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার, শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার প্রভৃতি। তিনি চুক্তিমূলক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "...employee rights might refer to those goods that employees are entitled to on the basis of contractual agreements with employers."[৮] অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রম ও সেবার বিনিময়ে কোন মালিক তার শ্রমিককে চুক্তির ভিত্তিতে যেসব বিষয় প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন তাই চুক্তিমূলক অধিকার। এরূপ অধিকারগুলো হলো সবেতনে ছুটি পাওয়ার অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার, অবসর ভাতা পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি। নৈতিক অধিকারগুলো হলো তাই যা আইনগত ও চুক্তিমূলক অধিকারের কোনটাই নয় বরং উভয় প্রকার অধিকার থেকে স্বাধীন। যেমন ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম নির্বাচনের অধিকার প্রভৃতি।[৯]

পুঁজিবাদ বিকাশের সাথে সাথে অধিকার সম্পর্কে দু'টি আধুনিক ধারণারও উদ্ভব ঘটে। এদের একটি পরিণতিমুক্ত ধারণা ও অপরটি পরিণতিমূলক বা উপযোগবাদী ধারণা। পরিণতিমুক্ত মতের প্রবর্তক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। তিনি মনে করেন মানুষের অধিকারের উৎপত্তি হয় সাম্য ও মর্যাদাবোধ রক্ষার্থে এবং যৌক্তিক সত্তার (মানুষ) লক্ষ্যের মধ্যেই অধিকার নিহিত। আবার ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে অধিকারের সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক অভাব পূরণের তাগিদ থেকে। তাই অধিকার হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যের বিকাশ।

অধিকারের ভিত্তি যাই হোক না কেন অধিকারের কিছু নির্দিষ্ট দিক রয়েছে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে প্রতিটি অধিকারের সাথে একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দায়িত্ব রয়েছে। যেমন আমার যদি চাকুরি পাওয়ার অধিকার থাকে তবে আমাকে চাকুরি দেয়ার দায়িত্ব অন্য কারোর রয়েছে। এক্ষেত্রে হতে পারে সেই অন্য কেউ হচ্ছে রাষ্ট্র। তাহলে দেখা যায়, অধিকারের মধ্যে দাতা-গ্রহীতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অধিকারের ধারণাটি এদিক থেকে আপেক্ষিক। কেননা অধিকার কিরূপ হবে তা দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের ধরনের উপর নির্ভরশীল। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অধিকারকে – নেতিবাচক ও ইতিবাচক এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

আমেরিকার সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও দর্শন বিভাগের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজ তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে নেতিবাচক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "Duties others have to not interfere in certain activities of the person who holds the right."[১০] কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। এ কারণে নেতিবাচক অধিকার সম্পর্কে বলা হয়, "Negative rights require others leave us alone."[১১] নেতিবাচক অধিকার হচ্ছে সেইসব অধিকার যেক্ষেত্রে অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। যেমন 'ক' নামক ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার আছে। এটির অর্থ হলো অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব হলো 'ক' নামক ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে হস্তক্ষেপ না করা। আবার ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহার, বিক্রয় বা ধ্বংস করার অধিকার আছে। কিন্তু অন্যের দায়িত্ব হলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহার, বিক্রয় বা ধ্বংস যা সে পছন্দ করে তার কোন ক্ষেত্রেই তাকে প্রতিরোধ না করা অথবা বিরত থাকা।

রোনাল্ড ডুস্কা তাঁর "Employee Rights" প্রবন্ধে ইতিবাচক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "Positive rights are right of recipience."[১২] ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজ ইতিবাচক অধিকার সম্পর্কে বলেন, "Duties of other agents to provide the holder of the right with whatever he or she needs to freely pursue his or her interests."[১৩] ইতিবাচক অধিকার হচ্ছে নেতিবাচক অধিকারের বিপরীত ধারণা যেক্ষেত্রে একটি দায়িত্ব অন্য একটি দায়িত্বের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। যেমন কোন ব্যক্তির শিক্ষা লাভের অধিকার আছে – এর অর্থ এই নয় যে কেউ শিক্ষা লাভে হস্তক্ষেপ করবে না বরং ব্যক্তির যদি শিক্ষা গ্রহণে অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা না থাকে তাহলে সরকারের বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব হলো তার শিক্ষা লাভে সহযোগিতা করা। শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার সঙ্গে সরকার পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আবার ব্যক্তির চাকুরি পাওয়ার

অধিকার আছে। চাকুরির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ না কেউ রয়েছে। তবে এই অধিকারটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা একটু কঠিন। এ কারণে ইতিবাচক অধিকার সম্পর্কে বলা হয় "Positive rights require others help us."[১৪] এ অধিকারের আরো উদাহরণ হলো কাজ করার অধিকার, জীবনযাত্রার মান উন্নত বা নিশ্চিত করার অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি। এসব অধিকার নিশ্চিত করতে যদি কেউ এগিয়ে আসতে সক্ষম না হয় তাহলে উক্ত অধিকার লাভে সহযোগিতা করা হলো আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং ইতিবাচক অধিকারে অন্যের সহযোগিতার বিষয়টি আবশ্যক। অন্য কথায় বলতে গেলে ইতিবাচক অধিকারের ক্ষেত্রে অন্যের দায়িত্ব পালন বা ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন হলো: অধিকার কি হস্তান্তরযোগ্য? কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কি বৈধ? উদাহরণস্বরূপ মানুষের বাক-স্বাধীনতার কথা বলা যেতে পারে। কারো বাক-স্বাধীনতা থাকার অর্থ এই নয় যে সে কোনো সিনেমা হলের মধ্যে গিয়ে আগুন আগুন বলে চিৎকার দেবে – যদিও সেখানে আগুন লাগেনি। তাই অনেক ক্ষেত্রে সরকার জনগণের বিভিন্ন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে থাকে। ফলে কোনো ব্যক্তির অধিকার অন্য আরো অনেকের সাথে সম্পর্কিত। এভাবে অধিকার যৌক্তিক সত্তায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কর্মচারীর অধিকারের ক্ষেত্রে তা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় কোনো কর্মীর অধিকার পূরণ করা হলো নিয়োগকর্তার কর্তব্য। নিয়োগকার্তারও অনেক অধিকার থাকতে পারে এবং ঐসব অধিকার পূরণ করা কর্মীর কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন আমরা যদি বলি কোনো কর্মীর নিরাপদ কর্মক্ষেত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে; তার অর্থ দাঁড়ায় যে ঐ কর্মী নিরাপদ কর্মক্ষেত্র পাওয়ার দাবি করলে সেটি হবে ন্যায্য এবং সে এও প্রত্যাশা ও দাবি করতে পারে যে তার নিয়োগকর্তা কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা দিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুত করবেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আইনগতভাবে বা নৈতিকভাবে বা যৌক্তিক কোন উপায়ে কিছু লাভ করাই হলো অধিকার। এ অর্থে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা, কর্মচারী, ক্রেতা, ভোক্তা, বিক্রেতা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অধিকারের ধারণাটি সম্পৃক্ত এবং এক পাক্ষিক নয়। অর্থাৎ একটি পক্ষ প্রত্যাশা করে এবং অন্য পক্ষ তা প্রদান করে বা নিশ্চিত করে। ফলে দাবি করা ও পূরণ করা দু'টি পক্ষের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে যা পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য।

৩.৩ কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার অধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চাকুরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি, অব্যাহতি, মজুরি নির্ধারণ এবং চাকুরির বিভিন্ন শর্ত নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাকে সাধারণত নিয়োগকর্তার অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নিয়োগকর্তা কর্তৃক যেসব শর্ত আরোপ করা হয় সেসব শর্ত গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার অনরুপ অধিকার কর্মীদেরও রয়েছে এবং আরো অধিকতর সুবিধাজনক শর্তের জন্য দরকষাকষিও করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় অনেক সময় নিয়োগকর্তা তার কর্মচারীকে 'কর্মসংস্থানের ইচ্ছা' ('Employment-at-Will'- EAW) তত্ত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন যদিও এ তত্ত্বটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। চুক্তিপত্রে যদি কোন শর্তে একজন কর্মীকে চাকুরিচ্যুত করা যাবে সেটির উল্লেখ না থাকে তাহলে কর্মীদের বৈধভাবে বা যে কোন কারণে কিংবা কোনরূপ কারণ দর্শানো ছাড়াই অব্যাহতি দেয়া যায় এই রূপ তত্ত্বই 'কর্মসংস্থানের ইচ্ছা' তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই 'কর্মসংস্থানের ইচ্ছা' নামক তত্ত্বটি নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর ঐতিহাসিক সামাজিক চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে EAW তত্ত্ব সবচেয়ে প্রভাবশালী হলেও বর্তমানে এই তত্ত্বের প্রভাব পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ১৮৮৪ সাল থেকে EAW তত্ত্ব দ্বারা সূচিত আইনি বিধান কার্যকর এবং ঐ বছর 'Payne v. Western & Atlantic R.R. Co.' মামলার রায়ে আদালত বলেন, "all may dismiss their employees at will, be they many or few, for good cause, for no cause, or even for cause, or even for cause morally wrong without being thereby guilty of legal wrong."[১৫] EAW তত্ত্ব অনুযায়ী, নিয়োগকর্তা স্বল্প কিংবা অধিক সংখ্যক কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে যথাযথ কারণে, কিংবা কোনো কারণ ব্যতিরেকে বা এমনকি চাকুরিচ্যুতির কারণ যদি নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্যও হয় তবুও নিয়োগকর্তাকে আইনগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা। তাহলে নিয়োগকর্তা তাঁর অধিকারের উপর ভিত্তি করে কর্মচারীকে কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এবং পছন্দের সময়ে অবসর গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যেকোনো সময় চাকুরিচ্যুত করতে পারেন। তাই এই তত্ত্বানুযায়ী, কর্মচারীর চাকুরি যদি কোনো লিখিত চুক্তি অথবা শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা সুরক্ষিত না হয় তাহলে নিয়োগকর্তা তাকে যে কোন সময় চাকুরিচ্যুত করতে পারবেন। অর্থাৎ EAW তত্ত্ব অনুসারে একজন নিয়োগকর্তা যে কোন সময় কিংবা যে কোন কারণে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একজন কর্মীকে ছাঁটাই করতে পারেন যদি না চুক্তিপত্রে ভিন্নরূপ কিছু থাকে। এই মতবাদ অনুসারে নিয়োগ হচ্ছে at-will সম্পর্ক যার অস্তিত্ব দু'টি পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভরশীল এবং সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত চলমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি পক্ষ তা মেনে চলে। বাইরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে নিয়োগকর্তা ও কর্মী পারস্পরিকভাবে একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার ভোগ করে।

কোন কোন দার্শনিক নিয়োগকর্তা-কর্মচারীর সম্পর্ককে পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করেন। পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ উদাহরণ হিসেবে পরিবারের কথা বলা যায়। পরিবারে

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক পারস্পরিক। পিতামাতা তাদের সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদি দিতে বাধ্য। অর্থাৎ এগুলো পাওয়া সন্তানদের অধিকার। অন্যদিকে, সন্তান তার পিতামাতার সদাশয় শাসন (Paternalism) বা অভিভাবকত্ব মেনে নিতে বাধ্য। অর্থাৎ সন্তানকে শাসন করার অধিকার পিতামাতার রয়েছে এবং তার মানে এই নয় যে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সন্তানদের মতামতের কোনো মূল্য থাকবে না। আধুনিক পরিবারে সন্তানদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। কেননা এইসব সম্পর্কের সাথে অধিকার ও দায়িত্বের বিষয়ও সম্পর্কিত। এ দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। তাই নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মত রয়েছে।[১৬]

নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাচীনতম ধারণাগুলোর একটি হচ্ছে ‘প্রভু-ভৃত্য’ সম্পর্কের মতো। যেমন সামন্তযুগে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যকার সম্পর্ক। সেখানে সামন্ত প্রভুর দায়িত্ব ছিল ভূমিদাসদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে দাসদের অধিকার ছিল প্রভুর নিকট থেকে নিরাপত্তা পাওয়া। ভূমিদাসের দায়িত্ব ছিল উৎপাদিত ফসলের প্রথমাংশ সামন্ত প্রভুকে দিয়ে দেয়া। অর্থাৎ প্রভুর অধিকার ছিল ঐ ফসল পাওয়ার। তবে এটাও সত্য যে, কতিপয় বিবেকহীন সামন্ত প্রভু ভূমিদাসদের অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। ফলে এসব বিবেকহীন সামন্ত প্রভুর কাজ আর যাই হোক নৈতিকভাবে সমর্থযোগ্য নয়। উপরন্তু, ভূমিদাসদের নিকট হতে আনুগত্য ছিল প্রত্যাশিত এবং সামন্ত প্রভুদের ‘সদাশয় স্বৈর’ (শাসন) ছিল আইনি কাঠামো দ্বারা সুরক্ষিত। তাই সামন্ত প্রভুকে দেখা মাত্রই শির নত করা ছিল দাসদের আনুগত্যের প্রতীক। এভাবে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক শিল্পবিপ্লবের সূচনাকালে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হলেও পরবর্তীতে এই ধারণা জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স ও জ্ঞানালোক যুগের উপযোগবাদী দার্শনিকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাই সামন্ত ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে ‘নিয়োগকর্তা-কর্মচারী’ সম্পর্ককে এখন আর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সাথে তুলনা করা হয় না। বরং নিয়োগকর্তা-কর্মচারীর সম্পর্ক বিবেচিত হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক ও অধিকারের সম্পর্ক হিসেবে। অর্থাৎ এই সম্পর্ক হচ্ছে দু'জন যোগ্য ব্যক্তির চুক্তির ফসল যারা ব্যবসায়িক কাজ একত্রে কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ অথবা সম্মত হয়েছেন। চুক্তিভিত্তিক ধারণার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ হচ্ছে এটি নিয়োগকর্তা ও কর্মীর মধ্যকার সম্পর্কের জটিল অংশটুকু উপেক্ষা করে। তাই এই চুক্তিকে কেউ কেউ যথোপযুক্ত বলে মনে করেন এবং কেউ কেউ তার বিরোধীতাও করেন। যেমন যখন আমরা নিয়োগকর্তা ও কর্মীর ক্ষমতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করি তখন এই সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের ধারণার সাথে বেশি সংগতিপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন।

আবার, জ্ঞানালোকের যুগ থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক অভিলাষ 'সাম্যের দাবি' যখন কাম্য তখন 'চুক্তিভিত্তিক' ধারণাই যথোপযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন।[১৭]

ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক বিষয়ে সাম্প্রতিক ধারণাটি হচ্ছে অংশিজন বা স্টেকহোল্ডার ধারণা যা পূর্বোক্ত ধারণা দু'টির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই তত্ত্বানুসারে ব্যবসায়ের ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের কোনো না কোনো স্বার্থ সংরক্ষণ করে। অংশিজন হচ্ছেন ব্যবসায়ী নিজে, কিংবা কাঁচামাল সরবরাহকারী, কিংবা ব্যবসায়িক অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, বা ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা, অথবা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার কিংবা কর্মী – এদের প্রত্যেকেই একেকজন অংশিজন। এখানে যদি তাদের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তবে তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের অধিকারের দাবি করতে পারে। যেমন একজন বিক্রেতা তার দেয়া সেবার জন্য ন্যায্য মূল্য পাবার অধিকারের দাবি জানাতে পারে। বর্তমান সময়ে ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ভোক্তাগণ বিশ্বাসযোগ্য প্রচারণা, নিরাপদ ও গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য পাওয়ার অধিকার দাবি করছে। একইভাবে কোম্পানির কর্মীগণ বহুবিধ অধিকার আদায়ের দাবি জানাচ্ছে। জীবনযাত্রার গুণগত মান অর্জন, বা ব্যক্তির মর্যাদাবোধ রক্ষার তাগিদে অধিকারের ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমরা আশা করবো যে নিয়োগকর্তা-কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সম্পর্কিত অধিকারের ধরনও পরিবর্তন হবে। কিন্তু সব অধিকার প্রকৃতিগতভাবে এক নয়, কিছু অধিকার মৌলিক এবং কিছু অধিকার অমৌলিক। অনেক দার্শনিক মনে করেন মানুষের সকল ধরনের অধিকার জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞার দ্বিতীয়টি থেকে পাওয়া সম্ভব। এই অনুজ্ঞাটি হচ্ছে "Act so as never to treat another rational being merely as a means to an end."[১৮] কান্ট মানুষকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেছেন কিন্তু কখনও মাধ্যম হিসেবে নয়। এই বক্তব্যের কাঙ্খিত পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় আরেক জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের দর্শনে। মার্ক্স পুঁজিবাদকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করার জন্য উক্ত অনুজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদীরা শ্রমিক বা কর্মীকে পণ্য বা বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও তিনি শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রসঙ্গে কোন অধিকারের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু কান্ট মনে করেন মানুষ নিজেকে বা অন্য কোন মানুষকে যেন কোন সময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা হয়। তাঁর এই বক্তব্য মানুষকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দিতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এভাবেই কান্টের বক্তব্য মানুষের মৌলিক মানবিক মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠা করেছে।[১৯] এ বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন শিল্প বিপ্লবের সময় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ গ্রহণ না করার যে নীতি প্রচলিত হয়েছিল সেটির

উপর ভিত্তি করে EAW তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। ১৯৩০ ও ৬০ এর দশকের মধ্যকার সময় থেকে এই তত্ত্বের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় আমেরিকান সমাজে ১৯৬০ এর দশক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চাকুরিক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য নিরসন এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে EAW সংক্রান্ত কোনো না কোনো আইন রয়েছে। কিন্তু অঙ্গরাজ্যে ভেদে এই তত্ত্বের প্রয়োগেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন নিউইয়র্কের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুত করা তুলনামূলকভাবে সহজ। আবার, অনেক অঙ্গরাজ্যে নিয়োগকর্তার অন্যান্য বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। যেমন কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, আস্থা প্রদর্শন ইত্যাদি।[২০]

১৯৭০ এর দশক থেকে আদালত প্রদত্ত বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে EAW তত্ত্বের প্রয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আদালত কর্মচারী অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আদালতের দৃষ্টিতে কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে জননীতি (Public policy) লঙ্ঘিত হলে ভুক্তভোগী কর্মচারী নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করলেই আইনি পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব: (১) যদি কর্মচারীকে ক্ষতিপূরণ আদায় কিংবা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেয়া না হয়; (২) যদি কর্মচারীকে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান অথবা অর্থের বিনিময়ে অসত্য বলতে বাধ্য করা হয়; (৩) কোম্পানির একত্রিকরণে অসম্মতির জন্য যদি কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করা হয় এবং (৪) কর্মচারীকে যদি নিয়োগকর্তার সংবিধিবদ্ধ নীতি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয় (হুইস্‌ল-ব্লোয়িং)।[২১]

১৯৮১ সালে ক্যালিফোর্নিয়া আপিল কোর্ট নিয়োগকর্তা ও নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত 'Pugh V. See's Candies, Inc.' মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করেন। প্রদত্ত রায়ের আদেশানুযায়ী চুক্তিবিহীন নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মচারীর প্রতি নিয়োগকর্তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কর্মচরীকে চাকুরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তাঁকে কতিপয় বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে যা নিম্নরূপ: (ক) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; (খ) কাজের প্রত্যক্ষ সমালোচনার অভাব; (গ) সুপারিশমালা ও প্রাপ্ত পদোন্নতিসমূহ; (ঘ) নিয়োগের স্থায়িত্ব এবং (ঙ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক স্বীকৃত নীতিসমূহ।[২২]

EAW তত্ত্বে ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এই তত্ত্বের কঠোর প্রয়োগ ও প্রকৃতি নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক বেড়েই চলছে। প্রতিটি কোম্পানিই তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কতিপয় অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে থাকে। যেমন অবসর গ্রহণের সময়ে এককালীন ভাতা প্রদান, পেনশন, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। আবার, নিয়োগকর্তাও তার কর্মচারীগণের শ্রম, সময় ও

প্রচেষ্টাকে নিজের সম্পত্তির অংশ হিসেবে দেখে থাকেন। এখন এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কর্মচারীর শিক্ষা, দক্ষতা, ও অন্যান্য বৌদ্ধিক সম্পদ তার নিজের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে কিনা। যদি এইসব সম্পদ কর্মচারীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে এসব সম্পত্তি থেকে তাদের কতিপয় অধিকারও উদ্ভূত হয়। এখন প্রশ্ন হলো নিয়োগকর্তা অথবা কমচারী কার সম্পত্তি ও অধিকার অগ্রাধিকার পাবে? আবার কার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে? – এ সম্পর্কিত বিতর্ক চলতেই থাকবে। বিশেষত বিতর্কিত চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বেশি লক্ষণীয়। এ কারণে বলা হয় এইসকল বিতর্ক মূলত উপযোগনীতি কেন্দ্রিক। অর্থাৎ নিয়োগকর্তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার কতটুকু সীমীত বা সংরক্ষণ করলে সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত হবে তা নির্ণয় করা নিয়েই এই বিতর্ক।[২৩] কাঁচামাল এবং অর্থের মতো শ্রমকেও ব্যবসায় মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, কাঁচামাল এবং অর্থের সাথে শ্রমিকের (তথা কর্মচারীর) মৌলিক প্রার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, শ্রমিক সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণও মানুষ হিসেবে বিবেচিত এবং তাদেরও কতিপয় সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকারগুলো কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু, নিয়োগকর্তা এবং কর্মাচরীদের মধ্যে অধিকারকে কেন্দ্র করে প্রায়ই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে দেখা যায়। সাধারণত কর্মচারীর ব্যক্তিগত অধিকার এবং নিয়োগকর্তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে কর্মচারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে রেখে মিমাংসা করা কঠিন। এরূপক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষের সহযোগিতায় নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর মধ্যে সমঝোতা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই কর্মক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী একে অপরের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন।

৩.৪ **কর্মচারীর অধিকারের নৈতিক ভিত্তি:** পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নিয়োগকারী ও কর্মচারীর মধ্যে একটা আদর্শিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এই শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসই উৎপাদনশীলতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে এটির বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কারণে নিয়োগকারী ও কর্মচারীর মধ্যকার সম্পর্ককে বৈরিতামূলক বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিন্তু যদি পরস্পরের প্রতি আস্থা অর্জিত হয় তাহলে যোগাযোগের একটি মুক্ত ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত পরিবেশই অভ্যন্তরীণ সহযোগীতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং কোম্পানির পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গতিশীলতা আনয়ন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ কোম্পানিতে নিয়োগকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনা বরং তাদের মধ্যে ক্ষমতা ও

কর্তৃত্বের একটি বিষম সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। আমেরিকার পারডো বিশ্ববিদ্যায় নর্থওয়েস্টের দর্শনের অধ্যাপক জন আর. রোয়ান তাঁর "The Moral Foundation of Employee" প্রবন্ধে বলেন,

> "…comparatively inferior bargaining position with respect to their employers. This inequality opens up possibilities for various sorts of exploitation, such as inadequate compensation, discrimination, and privacy invasions, all of which have been known to occur."[২৪]

অর্থাৎ কোম্পানিতে অবস্থানগত দিক থেকে কর্মচারী নিয়োগকর্তার অধীনস্থ থাকেন। এমন অসমতার কারণে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্নভাবে শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন দুর্ঘটনায় অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, বৈষম্য, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন প্রভৃতি সব ধরনের অধিকার থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত হন। তিনি আরো বলেন,

> "… employee rights are complex, in that managers, as a prerequisite for making ethically sound decisions, must assess which alleged employee rights are legitimate (spurious claims surely arise at times), and must weigh them against the rights of those in other stakeholder groups."[২৫]

অর্থাৎ কর্মচারীর অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তাই এমনক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপকগণের উচিত হবে কর্মচারীদের কোনো অধিকার কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনা করে দেখা এবং একইসাথে ঐ অধিকারকে অংশিজনেদের অধিকাররের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বলতে পারি অধিকার একটি দাবি এবং কোন একটি পক্ষের যেটি অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেটি অন্য কোনো পক্ষের দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনকেই নির্দেশ করে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কর্মচারীর নিরাপদ কর্মস্থল পাওয়ার অধিকার থাকে তাহলে তাকে নিরাপদ কর্মস্থল প্রদান করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব বা কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রত্যেক কর্মচারীই একজন স্বতন্ত্র্য ব্যক্তি–এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কর্মচারীর অধিকারের নৈতিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি হবে এমন যে কাউকে চাকুরিতে নিয়োগ দেয়ার সময় নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি একজন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছেন এবং তাঁকে এটাও অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি যেন কর্মচারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনো না কোনো স্বার্থ রয়েছে। এই স্বার্থই তাকে কোনো লক্ষ্য পূরণের অনুপ্রেরণা দেয়। উদ্দেশ্য পূরণ ও স্বার্থের নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। কল্যাণ বা সমৃদ্ধি না হলে এ দুটো অর্জন করা সম্ভব

হয়না। তাই প্রত্যেক কর্মচারীর সমৃদ্ধি অর্জন অথবা কল্যাণ নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে। যদি চাকুরি ক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কর্মচারীর চাকুরি সংক্রান্ত চাহিদা, উদ্দেশ্য, আকাঙ্খাগুলো পূরণ না হয় তাহলে বলা যেতে পারে তার কল্যাণ নিশ্চিত করার অধিকার হয়তো লঙ্ঘিত হয়েছে। কর্মচারী অধিকারের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ব্যবস্থপনা ও জননীতি (History, Management and Public Policy) বিভাগের অধ্যাপক সেনফোর্ড এম. জেকোবি বলেছেন, "Employees should at all times be treated in a way that respects them as a persons."[২৬] অর্থাৎ কর্মচারীদের সাথে সর্বদা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সম্মান তাদের প্রতি প্রদর্শিত হয়। একই কথা নিয়োগকর্তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং তাঁদেরকেও প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা কর্মচারীদের দায়িত্ব।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, কর্মচারীর প্রথম পরিচয় হলো তিনি একজন মানুষ এবং পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পরিচয় ও যোগ্যতা বহন করেন। ফলে মানুষ হিসেবে তিনি সকল প্রকার মৌলিক অধিকার পাওয়ার দাবি রাখেন। এ সব দিক বিবেচনা করেই ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার ২৩, ২৪, ২৫ ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিরই পছন্দ অনুযায়ী কাজ নির্বাচন করার অধিকারসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশে কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে, বৈষম্যের উর্ধ্বে ওঠে সম মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে, জীবন যাপনের জন্য যৌক্তিক বেতন ও ভাতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। রোনাল্ড ডুস্কা তাঁর "Employee Rights" প্রবন্ধে কর্মচারীদের ১০টি অধিকারের কথা বলেন। অধিকার ১০টি হলো: নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশের অধিকার; চাকুরির নিশ্চয়তার অধিকার; পদায়ন ও অব্যাহতির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অধিকার; গোপনীয়তার অধিকার; হতাহত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার; শ্রমিক-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার; জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে চাকুরিতে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার; অবসরকালীন নিরাপত্তার অধিকার; সম্মিলিত বা সাংগঠনিক আকারে দাবি আদায়ের নিমিত্তে আন্দোলনের অধিকার; হয়রানির শিকার না হওয়ার অধিকার এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি লাভের অধিকার।[২৭] ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের এসব অধিকার নিশ্চিত করতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

৩.৫ কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব: নিয়োগকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো অধিকার এবং দায়িত্ব থাকে। অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তাই নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী উভয়েরই উচিত পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এসব অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত আবার কোন

কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতাও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আইনি দায়িত্বসমূহ পালন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকলেও এই সকল দায়িত্ব পালনে সবাই বাধ্য হয়। অন্যদিকে, নৈতিক দায়িত্বগুলো পালনের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে দেখা যায় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতির কারণে এগুলো প্রায়ই ভুলণ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসবক্ষেত্রে ঐ সকল দায়িত্বের বিপরীতে থাকা অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এমতাবস্থায়, নৈতিক কিংবা আইন উভয় প্রকারের অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। কর্মচারীগণ তাদের বিভিন্ন সাংবিধানিক অধিকার – যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায্য মজুরি, উন্নত কর্মপরিবেশ, গোপনীয়তা ইত্যাদির অধিকার উপভোগ করার দাবি করেন। আবার, নিয়োগকর্তাগণ উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থায়ীত্ব ধরে রাখতে, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করতে, মার্কেট শেয়ার বাড়াতে এবং শ্রমের সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। ফলে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করে অগ্রসর হওয়াই হলো পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে কর্মচারীর অধিকার এবং পরবর্তীতে নিয়োগকর্তার অধিকার অর্থাৎ উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলোঃ

৩.৫.১. কর্মচারীর অধিকার: কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সচল রাখার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্মচারীর অধিকার। কারণ কর্মচারী যদি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়িত্ব পালন না করে তাহলে প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। তাই কর্মচারীর অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের সফলতা একই সূত্রে গাঁথা। নিম্নে কর্মচারীর অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলো:

৩.৫.১.১ কাজের অধিকারঃ কাজের অধিকার ধারাণাটি কিছুটা জটিল। অনেকের মতে, এটি মূলত একজন সম্ভাব্য কর্মীর কাজ পাওয়ার অধিকার। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা লক্ষণীয়। আমি পূবেই উল্লেখ করেছি যে অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তাই কাজ পাওয়া যদি কারো অধিকার হয় তাহলে কাজ দেয়াও অন্য কারো দায়িত্ব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই দায়িত্বটি প্রকৃতপক্ষে কে পালন করবে তা নিশ্চিত করে বলে যাচ্ছে না। তবে কর্মসংস্থান যেহেতু বর্তমান সময়ের মানুষের অত্যন্ত জরুরি একটি মৌলিক প্রয়োজন তাই বলা যেতে পারে সকল যোগ্য ব্যক্তিরই কাজ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, কাজ দেয়ার দায়িত্ব কে পালন করবেন তা অনির্দিষ্টই থেকে যায়। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু দাবি করা যেতে পারে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তথা নিয়োগকর্তার নিকট কোনো একটি চাকুরি

প্রদানের সুযোগ থাকে তবে তা যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঐ চাকুরিতে নিয়োগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়াটাও জটিল। প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই তার ব্যবসায় সর্বাধিক উৎপাদন ও সর্বোচ্চ মুনাফা করতে চান। ধরা যাক, কোনো পরিবারের মালিকানাধীন একটি কোম্পানির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে ঐ কোম্পানির কোনো চাকুরির জন্য যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও চাকুরিতে পরিবারের কোনো সদস্যের নিয়োগ দেয়াটা উল্লিখিত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে যে ঐ সদস্যের উক্ত কাজের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কাজের বা চাকুরির অধিকার যদি থেকেও থাকে তবে তার বাস্তবায়ন কখনো কখনো সীমিত। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ পাওয়ার অধিকার থাকে তাহলে তাকে কাজ দেয়ার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ দেয়ার সুযোগ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই সুযোগ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তুলনামূলক বেশি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উদ্দেশ্যই হলো সকল কর্মক্ষম যোগ্য ব্যক্তির কাজ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।[২৮]

৩.৫.১.২ যথার্থ কাজ পাওয়ার অধিকার: যথার্থ কাজ বলতে বোঝায় কাজ করার মাধ্যমে সৃষ্ট আনন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জন। যথার্থ কাজের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, কাউকে দিয়ে ক্লান্তিকর, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর কাজ করানো যথার্থ কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এ ধরনের কাজ অমানবীয় হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ যা অমানবীয় নয় এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাই যথার্থ কাজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এমন যথার্থ চাকুরি বা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার গুরু দায়িত্বটি কার উপর বর্তায়? আদৌ কি এমন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব? এমন অনেক কাজ রয়েছে যা স্বভাবগতভাবেই ক্লান্তিকর ও অরুচিপূর্ণ অর্থাৎ অমানবীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব কাজ করা সমাজের জন্য আবশ্যক। যেমন ময়লা, পুরনো গাড়ি, আবর্জনা, বাতিল দ্রব্যাদি, অ-বসবাসযোগ্য পুরোনো দালান ইত্যাদি। তাই এসব কাজ অনাকাঙ্খিত হলেও সমাজে তাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব কাজের গ্রহণযোগ্যতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। আর এটিই হলো বণ্টনমূলক ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন কোন একটি কাজ কোন কর্মীর জন্য বোঝা হতে পারে এবং অন্য কোন কর্মীর জন্য তা স্বস্তিকর হতে পারে – সেটা অনুধাবন করে দায়িত্ব বণ্টিন করাই হলো নিয়োগকর্তার দায়িত্বের অংশ। ফলে কর্মীর যোগ্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করে যথাযথ কাজ নির্ধারণ ও বণ্টন করা নিয়োগকর্তার নৈতিক দায়িত্ব। তাই ক্লান্তিকর, অনৈতিক, অমানবীয় কাজ করা থেকে কর্মীদেরকে বিরত রাখা নিয়োগকর্তার উচিত বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩.৫.১.৩ ন্যায্য মজুরি: মজুরী কাঠামো নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ন্যায্য মজুরি নির্ধারিত হয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা। যেমন জনপ্রত্যাশা ও সহযোগিতা, শ্রম বাজারের অবস্থা, প্রতিযোগীতামূলক শ্রম মজুরি, কোম্পানির মুনাফার পরিমাণ, চাকুরি ও কাজের ধরন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম মজুরি, অনুরূপ কাজের জন্য অন্যান্য কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বেতন-ভাতা, বেতন প্রদানের পক্ষপাতহীনতা ইত্যাদি। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি সম্পর্কে ১৮৯১ সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ত্রয়োদশ পোপ লিউর অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর 'Rerurn Novarum' (of New Things) শিরোনাম নামক পোপ পত্রে (Encyclical) কতকগুলো কর্মী অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। তার মধ্যে একটি ছিল জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার অধিকার। তাঁর মতে, "... a living wage enough support a family with children, so that the children were adequately cared for."[২৯] পোপ লিউ ন্যূনতম মজুরি বলতে সেই পরিমাণ অর্থকে বোঝিয়েছেন যার দ্বারা পরিবার ও সন্তানসন্ততির পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন পরিচালনা করা যায়। বর্তমান সময়ে চাকুরিতে যে মজুরি দেয়া হয় তা অনেক সময় চিন্তার উদ্রেক করে।

ন্যায্য মজুরির বিষয়টিকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়: কর্মচারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং মালিক পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে। কর্মচারীর দৃষ্টিতে মজুরি হলো নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ মিটানোর একমাত্র উপায়। এ কারণে সার্বজনীন মানবাধিকারের ২৫ ধারার ১ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."

এ ঘোষণা ইঙ্গিত করে যে, প্রত্যেকে তার নিজের ও নিজ পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটানোর জন্য পর্যাপ্তভাবে অর্থ পাওয়ার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। পক্ষান্তরে, মালিক পক্ষের দৃষ্টিতে মজুরি হলো কোন পণ্যের সর্বনিম্ন উৎপাদন ব্যয়।[৩০] অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির অর্থ হলো কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হলো প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে ছিটকে যাওয়া। তাই পণ্যের সর্বনিম্ন উৎপাদন ব্যয় স্থির করাই হলো মালিক পক্ষ তথা নিয়োগকর্তার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজ তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণে সাতটি মানদণ্ডের কথা বলেন। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি যে অঞ্চলে অবস্থিত হবে সে অঞ্চলের শ্রম

বাজার তথা উক্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, প্রাত্যহিক ব্যয়ভার ইত্যাদি বিবেচনা করে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করা ন্যায় সঙ্গত। (খ) সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি অধিক লাভজনক হয় তাহলে কর্মচারীদের বেতনভাতাও তুলনামূলকভাবে বেশী হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নির্ধারিত হওয়া শ্রেয়। (গ) যেসব চাকুরিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, অধিক অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি আবশ্যক হয় সে সকল চাকুরিতে মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা অধিক হওয়া উচিত। যেমন বাংলাদেশে পুলিশের চাকুরিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় তাঁদেরকে নির্ধারিত বেতনের অতিরিক্ত ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হয়। (ঘ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা কর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত হবে। ফলে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি ঐ দেশের আইনি কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির তুলনায় কর্মচারীদের বেতন কম প্রদান করে তাহলে সেটি অন্যায় হবে। (ঙ) একই প্রকৃতির কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিকেরই সমান বেতন হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামোতে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। (চ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্মতিতে বেতন নির্ধারিত হবে। কিন্তু কোন পক্ষই বল প্রয়োগ, প্রতারণা, লুকোচুরি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না। উভয়পক্ষই দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণ করাই শ্রেয়। (ছ) চাকুরি প্রতিষ্ঠানটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের জীবনধারণের ব্যয়, বাসস্থান ব্যয়, শিক্ষা ব্যয়, যাতায়াত ব্যয় প্রভৃতি ব্যয় খাতের উপর ভিত্তি করে মজুরি নির্ধারিত হবে।[৩১] যেমন বাংলাদেশে সরকারি চাকুরিতে ঢাকা শহরে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের ৫৫% বা ৫০% বাসা ভাড়া প্রদান করা হয় এবং উক্ত কর্মচারীরা যখন জেলা পর্যায়ে অবস্থান করেন তখন তারা বাসা ভাড়া বাবদ মূল বেতনের ৪০% পান।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা বস্তুত পক্ষে কঠিন। কারণ বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মাদণ্ডের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু শ্রমিকদের কর্ম ঘণ্টা সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা আন্তর্জাতিকভাবে ও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ এর ৪২ নং আইনে 'কর্ম ঘণ্টা ও ছুটি' নামক নবম অধ্যায়ে ১০২ নং ধারার ২ অনুচ্ছেদে সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা হিসেবে ৪৮ ঘণ্টা নির্ধারণ করেছে এবং তার অধিক সময় কাজ করবেন না বা তাকে দিয়ে তার অধিক সময় কাজ করানো যাবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ মজুরি দিয়ে সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা হিসেবে ৬০ ঘণ্টা তথা অতিরিক্ত ১২ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন বা বছর হিসেবে সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা হিসেবে ৫৬ ঘণ্টার অধিক কাজ করবেন না।[৩২] এ কারণেই সার্বজনীন মানবাধিকারের ২৩ এর ৩ ধারায় বলা হয়েছে, "Everyone who works has the right to just and favourable remuneration

ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.” ফলে কর্মচারীদের মানসম্মত, যৌক্তিক ও ন্যায্য বেতন পাওয়া তাদের অধিকার যার মাধ্যমে তারা নিজেদের ও পরিবারের ভরণ পোষণ মিটানোর মাধ্যমে মানবিক, মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

৩.৫.১.৪ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশের অধিকার: কাজের ধরণ যেমনই হোক না কেন কাজ করার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রত্যেক নিয়োগকর্তার অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। এই অধিকারের পক্ষে দাবি করা হয় যে, অন্য যে কারো মতই নিয়োগকর্তাও কর্মীদের কাজের পরিবেশ নিরাপদ করতে বাধ্য। কিন্তু এই অধিকারকে বিরোধীতা করে অনেকে দাবি করেন যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক চুক্তিভিত্তিক। এক্ষেত্রে, কর্মচারীর সুযোগ রয়েছে চুক্তির শর্ত মেনে কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা অথবা প্রত্যাখান করার। অর্থাৎ কর্মচারী যদি মনে করেন যে কর্মস্থলের পরিবেশ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত নয় তাহলে তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। এভাবে অধিকাংশ কর্মচারীই যদি অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদন বৃদ্ধি ও রাজস্ব আহরণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হবে। এমতাবস্থায় কোম্পানি বা কর্তৃপক্ষ কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাধ্য হবে নতুবা কর্মচারীদের উচ্চ হারে জীবনের ঝুঁকি ভাতা বা অধিক মজুরি দিতে বাধ্য হবে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠান তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে, যারা নিরাপদ কর্ম পরিবেশকে অস্বীকার করেন তাদের মতে, শহুরে সমাজে প্রত্যাশিত চাকুরির সুযোগের তুলনায় চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে চাকুরির শর্ত একজন কর্মীর জন্য কঠিন ও অনাকাঙ্খিত হোক না কেন জীবনধারণের জন্য তিনি চাকুরি গ্রহণে বাধ্য হন। তাই কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের দাবি পূরণ করা কোম্পানির মালিকের জন্য অনেক সময় অত্যাবশ্যক হয় না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে এই মতবাদের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে এটি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং চুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনযোগ্য হলেও স্বাধীন চুক্তির একটা অত্যাবশ্যক শর্ত হলো কাজে নিযুক্তির পূর্বেই কর্মী তার কর্মস্থলের পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হবেন। কারণ পরবর্তীতে চুক্তির শর্তানুযায়ী কর্মী তার নিয়োগকর্তার নিকট বর্তমান ও ভবিষ্যতে তার প্রাপ্য অধিকার দাবি করতে পারবেন।[৩৩]

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টেকসই হওয়ার জন্য বা দীর্ঘমেয়াদে বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য কর্ম পরিবেশ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও

নিরাপত্তার বিষয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় এবং এটিরই ধারাবাহিকতায় 'Ergonomic' নামক ধারণাটির আবির্ভাব ঘটে। 'Ergonomic' হলো কর্মীদের আচরণ, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, কর্ম পরিবেশে ব্যবহৃত যন্ত্র, উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের প্রয়োগ। এককথায় কর্মক্ষেত্রে নিত্য নতুন যন্ত্র বা তথ্য প্রযুক্তির আর্বিভাব হওয়ায় অনেক শ্রমিক এসব নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত নয়। ফলে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি তথা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং টেকসই ব্যবসায়ের জন্য শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত না করে বরং তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের সংস্থা The Occupational Safety and Health Administration (OSHA)- এর অবদান অনস্বীকার্য। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং তা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয়ভাবে OSHA গঠন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ণয় ও গবেষণার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কৌশল নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও পালন করে থাকে।[৩৪] প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে OSHA বিভিন্ন কোম্পানিকে বাধ্য করে। ফলে নিয়োগকর্তার নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিতকরণে এবং কর্মচারী কর্তৃক তা গ্রহণে বেশ কিছু সমস্যা বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন (ক) স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাব; (খ) পেশাগত ঝুঁকির ধরন অনুযায়ী যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার প্রবণতা এবং (গ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত না করা সত্ত্বেও কর্মচারীদের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থল মেনে নেয়ার প্রবণতা। বিশেষত স্বল্প আয়ের ও চরম বেকারত্ব সম্বলিত অঞ্চলগুলোয় বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অথবা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে কাজের অনুমোদন না থাকার কারণে শ্রমিকেরা প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থলে কাজ করতে বাধ্য হয়।[৩৫] ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশের ঝুঁকির কারণে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়। যেমন আমেরিকায় প্রতি বছর চাকুরির কর্মপরিবেশে দুর্ঘটনাজনিত কারণে ৫০০০ জন কর্মী মৃত্যু বরণ করে এবং ৪৭,০০,০০০ জন কর্মী আহত হয়।[৩৬] আবার আমেরিকার বৃহত্তর শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠন American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)- এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিপজ্জনক কাজের কারণে প্রতিদিন ১৫০ জন শ্রমিক ও ২০১৫ সালে এক বছরে ৪৮৩৬ জন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করে।[৩৭] বাংলাদেশেও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশের কারণে অনেক শ্রমিক অকালেই মৃত্যু বরণ করে। যেমন ২০১৬ সালের ১২ এপ্রিল *দৈনিক প্রথম আলোর* অনলাইন

সংস্করণের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল ধ্বসে পড়ে এবং ৬৪ জন শ্রমিক নিহত হয় ও ৮৪ জন শ্রমিত আহত ও নিখোঁজ হয়। একই পত্রিকার ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, তাজরীন ফ্যাশনসে ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর অগ্নিকাণ্ডের কারণে কমপক্ষে ১১১ জন শ্রমিক নিহত হয় ও পরের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় ১১৩৪ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং আরো অনেকে আহত হয় যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ভয়াবহ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এসকল তথ্য উপাত্ত থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে কতোটা অনিরাপদ। অনিরাপদ কর্মপরিবেশের কারণে শ্রমিকদের অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের সম্ভাবনাময় ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তাগণ ধূমপানকে নিষিদ্ধ করে থাকেন। কারণ ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে ধূমপানের কারণে ক্যান্সারের মতো মরণব্যধি রোগ হয়ে থাকে। এমনকি কোনো অধূমপায়ী ব্যক্তি যদি ধূমপানরত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন তাহলে তিনিও এসব রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় কর্মক্ষেত্রে ধূমপান কি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত? আবার যদি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা উচিত? অংশিজনগণ এসব প্রশ্নের উত্তরে সবাই এক মত পোষণ করেন না। কর্মক্ষেত্রে ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন একটি কার্যনির্বাহী আদেশে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে Environment Protection Agency (EPA)- প্রতিষ্ঠা করেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষ ও পরিবেবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশেও সরকারিভাবে ধূমাপানকে নিরুৎসাহিত করে আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইনে ধূমপানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি কোন উন্মুক্ত স্থানে ধূমপান করে তাহলে উক্ত আইন অমান্যকারীকে অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে,ধূমপানের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যাচ্ছে না। ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে না পরার ব্যর্থতার পিছনে মানুষের বহু পুরোনো অভ্যাস পরিবর্তনে মানুষের অনাগ্রহ তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এক পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী ১৮ বছর বা তদূর্ধ মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে ২৮% মানুষ ধূমপায়ী। ৮০ শতাংশ শ্রমিক কোনো না কোনোভাবে কর্মসংস্থান নীতির অন্তর্ভুক্ত। আবার মাঠকর্মী নয় এমন শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই ধূমপান মুক্ত অফিসে কাজ করে। ডিসট্রিক্ট অব কলম্বিয়াসহ

আমেরিকার প্রায় ২০টি অঙ্গরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হয়েছে। ১৭৯৪ জন ব্যবস্থাপকের উপর পরিচালিতএকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে এদের মধ্যে ৭৫% ব্যবস্থাপক নিজের প্রতিষ্ঠানে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়ভাবে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'The Clean Air Act' নামক একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। OSHA এবং The Clean Air Act সম্মিলিতভাবে কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিয়োগকর্তাদের এ সংক্রান্ত আইন কানুন মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করে এবং এর ব্যতিক্রম হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে।[৩৮]

উপরের উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, শিল্প কারখানায় শ্রমিকেরা বিভিন্ন পেশাগত দুর্ঘটনা অথবা রোগব্যধির শিকার হয়ে থাকেন। প্রত্যেক শ্রমিকেরই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র পাওয়ার যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি সেই কর্মপরিবেশের তথ্য জানারও অধিকার রয়েছে। এক পরিসংখ্যানের সমীক্ষায় দেখা যায় শিল্প কারখানায় প্রতি দশজন শ্রমিকের একজন পেশাগত দুর্ঘটনা অথবা রোগব্যধির শিকার হয়ে থাকেন। তাই চাকুরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মচারীর ঐ কাজের সম্ভাব্য সমূহ বিপদ ও সমূহ ক্ষতির মাত্রা সম্পর্কে সকল ধরনের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। এসংক্রান্ত তথ্য জানানোর পর সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্মচারীদের তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি অঙ্গ রাজ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন পাশ করা হয়েছে। তাই কোনো নির্দিষ্ট পেশা, চাকুরি, কর্মপদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানো, ন্যায্য মজুরি দেয়া, স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচী চালু করা এবং কর্মচারীদের এ সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা নিয়োগকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অনেক নিয়োগকর্তাকে এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে চলতে দেখা গেলেও এটির বিপরীত চিত্রও কম নয়। কিন্তু কোম্পানি যদি কর্মচারীকে নিরাপদ ও অপেক্ষাকৃত কম স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পন্ন কর্মস্থলের নিশ্চয়তা প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কোম্পানির কর্মচারীর কর্মদক্ষতা, পণ্য উৎপাদন, পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাবে না। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে না। তাই কোম্পানি যদি কর্মচারীর কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে যথার্থ বা প্রাসঙ্গিক কাজ বণ্টন করে তাহলে ঐ কাজ নিয়ে কর্মচারী সন্তুষ্ট থাকে। এমন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কর্মচারীকে তার কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। অর্থাৎ কোনো কর্মচারী তার নির্ধারিত কাজ করার সময় যেন নিজের কর্তৃত্ব উপভোগ করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে কর্মচারীর কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা হলে শ্রমিকদের যেমন পেশাগত চাহিদা পূরণ হবে তেমনিভাবে নিয়োগকর্তাও তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। চূড়ান্ত হিসেবে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা উভয়ই লাভবান হবেন যাকে আমরা Win-win situation হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি।

৩.৫.১.৫ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার: এ কথা ঠিক যে, কর্মপরিবেশ শতভাগ নিরাপদ রাখা সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকে যায় যা নিয়োগকর্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। তাই কর্মচারীদের কর্মস্থলে আহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য কর্মক্ষেত্রে কর্মী আহত হলে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষতির ভিত্তিতেও এই অধিকারের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি দেয়া সম্ভব। যদি কোনো ব্যক্তি আহত হয় তবে সে অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কারণে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া সেই ব্যক্তির দায়িত্ব। শিশুরা খেলতে গিয়ে যদি প্রতিবেশীর জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলে তবে তাদের বাবা মা ক্ষতিগ্রস্তদের জানালার কাঁচ পরিবর্তন করে দেয় বা তার বিনিময়ে অর্থ প্রদানের বিষয়টি শিশুকে শেখায়। কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভবনা অনুমেয় থাকে। এ অনুমান থেকে কর্মচারীদের উচ্চ হারে ঝুঁকিভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই অধিকার দাবি করার যৌক্তিকতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি বা সমঝোতার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও কর্মস্থলে আহত হওয়া বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মচারীরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় প্রাণও হারায়। এসব দিক বিবেচনা করে শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের দ্বাদশ অধ্যায়ে কর্মস্থলে 'দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ' শিরোনামে **১৫১** অনুচ্ছেদে কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চম তফসিলের **১৫১** আর্টিক্যালের **১ম** অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) জখমের ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন; (খ) জখমের ফলে সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে শারিরীকভাবে অক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।[৩৯] আবার, অস্থায়ীভাবে অক্ষমতার জন্য পরবর্তী এক বছর অথবা আহতকালীন সময়ে যেটি কম হবে সেটি ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন। যেমন এক্ষেত্রে শ্রমিক প্রথম দুই মাস সম্পূর্ণ বেতনের (আহত হওয়ার পূর্ব মাসের বেতন) সমপরিমাণ অর্থ পাবেন, পরবর্তী দুই মাসের জন্য মাসিক মজুরির দুই-তৃতীয়াংশ এবং তৎপরবর্তী মাসগুলোর জন্য মাসিক মজুরির অর্ধেক হারে বেতন ভাতা লাভ করবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মেয়াদকাল দুই বছরের অধিক হবে না। বাংলাদেশে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি খুবই হতাশাব্যঞ্জক এবং কর্মচারীরাও তাদের ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্য

অধিকার সম্পর্কে তেমন একটা সচেতন নয়। তবে আশার কথা হলো শ্রমিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

৩.৫.১.৬ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত চাকুরিচ্যুত না হওয়ার অধিকারঃ মানুষের জীবনে সবচেয়ে হতাশা ব্যঞ্জক ও পীড়াদায়ক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চাকুরিচ্যুত হওয়া বা চাকুরি হারানো। উপার্জনহীন, সুবিধা বঞ্চনা ছাড়াও অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মীরা সাধারণত সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মী যখন খুব দ্রুত অন্য কোন চাকুরি পেয়ে যান তখন তিনি নতুন চাকুরি থেকে প্রাপ্ত বেতন পুরানো চাকুরি থেকে প্রাপ্ত বেতন ও সুবিধাসমূহ থেকে কমও পেতে পারেন যা তার উপার্জনকে কমিয়ে দিয়ে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি করে তোলে। আবার বিপরীত চিত্রও হতে পারে। কর্মীরা বিভিন্ন কারণে চাকুরি হারাতে পারেন। যার মধ্যে অনেকগুলোকে চাকুরিচ্যুতির জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সমস্ত ন্যায্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অর্থনৈতিক পুনঃর্বিন্যাস। অদক্ষ কর্মী, আকস্মিক অর্থনৈতিক মন্দা, ছোট ছোট কোম্পানিগুলোকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একীভূতীকরণ, নতুন উদ্যোগে ব্যর্থতা, নিম্নগামী মুনাফা হার, চাকুরিতে অশোভনীয় আচরণ ইত্যাদিকে যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনা করে কর্মীদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। ফলে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বৈষম্য যেমন বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, বয়স বৈষম্য ইত্যাদি বিদ্যমান থাকলে কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার অনেক সময় যথাযথভাবে রক্ষিত হয়না। তাই কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীরা যেন সম্মানের সাথে উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩.৫.১.৭ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসৃত হওয়ার অধিকারঃ যথাযথ প্রক্রিয়া বলতে সাধারণত বোঝানো হয় কর্মচারীদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, কিংবা নিয়ম তৈরীর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থপনা যা সম্পর্কে কর্মচারীগণও যথাসময়ে অবহিত হবেন। এসব অধিকার কর্মচারীদেরকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। যথাযথ প্রক্রিয়ার সাথে আরও অধিকার যেমন গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, নিরাপদ কর্মস্থল ইত্যাদি সম্পর্কিত। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ব্যতিরেকে কাউকে তার ব্যক্তিজীবন, স্বাধীনতা অথবা নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। উক্ত অধিকারগুলো রক্ষিত না হলে কর্মচারীদের অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই অধিকারগুলোকে কর্মচারীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে সার্বজনীন মানবাধিকারের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “Everyone has the right to life, liberty and security of person.” আমেরিকার বিখ্যাত

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় নীতিবিদ্যার এমেরিটাস অধ্যাপক প্যাট্রিসিয়া ওয়েরেন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের অধিকারটিকে অধিকতর সুরক্ষিত করার জন্য আরও কতিপয় অধিকার সংযোজনের কথা বলেন। যেমন (ক) মধ্যস্থতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব অবসানের অধিকার; (খ) গণশোনানীর অধিকার; (গ) সমকক্ষ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যায়ন পাওয়ার অধিকার এবং (ঘ) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অভিযোগ জানানোর উন্মুক্ত প্রক্রিয়া তৈরীর অধিকার।[৪০] তাই প্রতিষ্ঠানকে সঠিক ও যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসৃত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং এ সুবিধাটি ভোগ করা হলো কর্মচারীর অধিকার। কারণ আমরা পূবেই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত।

৩.৫.১.৮ সমান সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকার: আমরা ইতোমধ্যে ন্যায় তত্ত্বে আলোচনা করেছি যে, যদি কোন নির্দিষ্ট পেশায় কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমকাজ, সমপরিশ্রম, সমযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেতন, অন্যান্য সুযোগ ও সুবিধার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকে তহলে তা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারকে অসম্মান করে। তাই কর্মচারী যেহেতু মানুষ সেহেতু সকলেই কর্মক্ষেত্রে সমআচরণ, সমসুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং মালিক বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচিত তা মেনে চলা যা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অংশ। যদি মালিক বা নিয়োগকর্তা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রকিদের মধ্যে বিভিন্নরকম বৈষম্য, হতাশা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করবে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটেই সহায়ক নয়। এ কারণে সার্বজনীন মানবাধিকারের সাত নম্বর আর্টিক্যালে বলা হয়েছে, “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.” বৈষম্য কোনভাবেই কাম্য নয়। অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান। সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা অথবা সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে যা চূড়ান্ত হিসেবে নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানেও বৈষম্যের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রত্যেক নাগরিকের সমঅধিকার থাকলেও নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছেন যা উন্নত রাষ্ট্রেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন আমেরিকার সমাজে নারী বা কৃষ্ণাঙ্গ কর্মচারীরা প্রায়ই বঞ্চনার শিকার হন। যেমন বাংলাদেশে সামিনা জাবিন (ছদ্ম নাম) নামে একজন নারী দুঃখের সাথে বলেন আমি আড়াই বছর কাজ করে ১৩ হাজার টাকা বেতন পাই অথচ সদ্য পাস করা একজন পুরুষ ছেলে চাকুরিতে যোগদান করে ১৬ হাজার টাকার বেতন পান যা পরিপূর্ণভাবে বৈষম্যের নামান্তর।[৪১] কর্মস্থলে ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হলেও প্রায়ই দেখা যায় যে, সকল কর্মচারীকে সমান

সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না। কর্মক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগ সুবিধা বা সমান অধিকার পাবে এটিই স্বাভাবিক। ফলে ন্যায় বিচার অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মনে রাখতে হবে কর্মচারীদেরকে এ অধিকারটুকু প্রদান করলে মূলতঃ প্রতিষ্ঠানই লাভবান হবে যা আমি এ যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় বলার চেষ্টা করেছি।

৩.৫.১.৯ গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার: কোন ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত বিষয় বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে না চাওয়ার অধিকার রয়েছে। এমন দাবির উৎপত্তি হয়েছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে। কিন্তু বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে গোপনীয়তা সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আবার কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে কি করণীয় তা বলে দেয়ার অধিকার যেমন অন্য কোনো ব্যক্তির নেই তেমনি ঐ ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে কি করণীয় তা জানার অধিকার অন্য কোনো ব্যক্তির নেই (যদি ঐ কাজ বা কাজসমূহ দ্বারা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘিত না হয়)। একইভাবে একজন কর্মচারী তার কর্মঘন্টা ব্যতীত অন্য সময়ে কিছু করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ে সে এমন কিছু করতে পারে না যা তার নিয়োগকর্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে সর্বপ্রথম ১৮৯০ সালে আমেরিকার বোস্টন ল ফার্ম অব নেচার ম্যাক্লিনেন এন্ড ফিসের (Boston Law Firm of Nature MacClenen and Fish) প্রতিষ্ঠাতা এবং The Right to Privacy আর্টিক্যালের লেখক স্যামুয়েল ওয়ারেন এবং আমেরিকার আইনবিদ ও সুপ্রিম কোর্ট অব ইউনাইটেড স্টেটসের (Supreme Court of the United States) বিচারপতি লুইস ব্র্যান্ডিস *Harvard Law Review* নামক জার্নালে উত্থাপন করেন। তাঁরা বিষয়টিকে 'নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবন যাপনের অধিকার' ('right to be let alone.') বলে অভিহিত করেন। গোপনীয়তার অধিকারের সাথে বেশ কিছু জটিল বিষয়ও জড়িত। যেমন এই অধিকার থেকে নি:সৃত হয় যে, কর্মঘন্টা ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যক্তির অন্য কাজ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি জটিল হয় এবং কর্মচারী যদি কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করার প্রয়াসী হোন তখন অবশ্যই সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কর্মকাণ্ড আর একান্ত ব্যক্তিগত থাকে না।[৪২] কারণ ঐ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সাথে অন্যের ভাল-মন্দ জড়িত।

গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি অত্যন্ত জটিল যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই অধিকার সম্পর্কে প্রায়ই তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারী কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হবেন? কর্মচারীদের নিকট থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপার্জন এবং ব্যয় সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার কোন ধরনের অধিকার আছে? নিয়োগকর্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকার কতটুকু স্বাধীনতা কর্মচারীদের আছে? কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের গোপনীয়তার অধিকার বলতে সাধারণত বোঝায় যে কর্মচারী তার

বিষয়ে কখন, কিভাবে এবং কতোটুকু তথ্য অন্যদের নিকট প্রকাশ করবেন সে সিদ্ধান্ত একান্তই কর্মচারীর নিজস্ব বিষয়।

এখন প্রশ্ন হলো: কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের কতটুকু গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার আছে? এ প্রসঙ্গে স্যামুয়েল ওয়ারেন এবং লুইস ব্র্যান্ডিসের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত 'Griswold V. Connecticut' মামলায় আদেশ জারীর মাধ্যমে গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের বিষয়টির সুরাহা করেন। আদালত মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু 'ব্যক্তিগত বিষয়' (Zone of Privacy) আছে এবং ঐ সকল বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। এই অধিকারের প্রবক্তাদের মতে 'ব্যক্তিগত বিষয়ের' মধ্যে কর্মক্ষেত্রে মানসিক এবং পলিগ্রাফ পরীক্ষা না দেয়ার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এসব পরীক্ষা কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপের শামিল। আবার, অনেকের মতে ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে কর্ম পরবর্তী সময় নিজের মতো করে সময় কাটানো, কর্মক্ষেত্রে শান্তি ও নীরবতার প্রয়োজনীয়তা, পোশাক, নম্রতা, ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'ব্যক্তিগত বিষয়' এর মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত তা নিধারণ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে বিবেচিত। তবে বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় গোপনীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রযুক্তি, পলিগ্রাফ (মিথ্যা সনাক্তকরণ পরীক্ষা) ও মানসিক পরীক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নজরদারি, কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইন্টারনেটের ব্যবহার, মাদকাসক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে অনেকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৩.৫.১.৯.১ প্রযুক্তি এবং কর্মচারীর গোপনীয়তা: বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিশ্ব। সাধারণভাবে তথ্য প্রযুক্তি বলতে তথ্য রাখা বা ব্যবহার করাকে বোঝায়। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির বড় অসুবিধা হলো গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার অভাব। ফলে প্রযুক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের গোপনীয়তার অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা স্পষ্ট নয়। তবে এক্ষেত্রে আমেরিকার আদালত প্রবর্তিত একটি নির্দেশনা রয়েছে। নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে এমন বিষয়গুলো হলো : (ক) ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করে দেয়া; (খ) মেডিকেল রেকর্ড প্রকাশ করে দেয়া; (গ) অনধিকার প্রবেশ; (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মচারীর নাম ব্যবহার করা এবং (ঙ) কর্মচারীর কথোপকথন আড়ি পেতে শোনা, অননুমোদিতভাবে কর্মচারীর ই-মেইল কিংবা মোবাইল কল চেক করা। তবে অনুমোদন সাপেক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীর ব্যক্তিগত তথ্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন (ক) অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে; **(খ)** ঋণ সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে এবং **(গ)** মেডিকেল রেকর্ড দেখার ক্ষেত্রে।[৪৩] এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩.৫.১.৯.২ পলিগ্রাফ এবং মানসিক পরীক্ষা: সাধারণভাবে পলিগ্রাফ বলতে মিথ্যা শনাক্তকরণ যাচাই করাকে (Lie detector test) বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, পলিগ্রাফ পরীক্ষা হলো এক ধরনের মানসিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পরীক্ষাদাতার রক্তচাপ, ঘাম ও শ্বাস নেয়ার মতো বিষয়গুলো পরীক্ষা করে ফল নির্ধারণ করা হয়। ১৯১৭ সালে মার্কিন গবেষক উইলিয়াম মউল্টন মার্স্টন মিথ্যা শনাক্তকরণ যাচাই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। সাধারণত কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নিয়োগকর্তাগণ এ ধরনের পরীক্ষার পক্ষপাতী হয়ে থাকেন। কিন্তু এসব পরীক্ষায় কর্মচারীদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে চুরির মতো অপরাধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। মনস্তাত্ত্বিক এবং পলিগ্রাফ সংক্রান্ত পরীক্ষায় যে সকল সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো হলো: (ক) এমন ধরনের পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য কিংবা যৌক্তিক নয় বরং এগুলো কেবল সূচক; (খ) অনেকক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা পরীক্ষক এসব পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করার ফলে সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে; (গ) এ ধরনের পরীক্ষায় কর্মচারীকে অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে (যেমন লিঙ্গ, ধর্ম, লাইফস্টাইল, ইত্যাদি সংক্রান্ত) যার ফলে এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে; (ঘ) কর্মচারীদের প্রায়ই এসব পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং এসব পরীক্ষার ফলাফল কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হবে তাও তাদের অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে এসব পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ১.৭% এবং সর্বোচ্চ ১৩.৬% নির্ভুল হয়।[৪৪] আবার, ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টম্বর *দৈনিক প্রথম আলোর* অনলাইন ভিত্তিক সংস্করণের কম্পিউটার প্রতিদিন সেকশনে "যন্ত্র দিয়ে সত্য যাচাই" নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত নিবন্ধটিতে ভারতের হেলিক অ্যাডভাইজারি নামের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রুকমনি কৃষ্ণমূর্তির উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, মিথ্যা শনাক্তকরণ যন্ত্রের ফলাফল ৮০ শতাংশ সঠিক। এসব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, এ ধরণের পরীক্ষা ও তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

৩.৫.১.৯.৩ কর্মক্ষেত্রে নজরদারি: নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীকে নজরদারি করার মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এসব ক্ষেত্রে মূলত প্রযুক্তির সাহায্যে কর্মচারীর উপর গোয়েন্দাগিরি করা হয়। তাই কর্মক্ষেত্রে নজরদারি এখন অনেকের কাছে উদ্বেগের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোম্পানির কম্পিউটার টার্মিনালের কর্মচারীদের কম্পিউটারের কার্যবিধির উপর নজরদারি করা হয়। এভাবে নিয়োগকর্তা কর্মচারীর কাজের গতি, মোবাইল কলগুলোর নাম্বার, কথা বলার ব্যপ্তিকাল, কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যপ্তিকাল

প্রভৃতি তথ্য জানতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কতিপয় নজরদারি আইনিভাবে স্বীকৃত এবং জরুরীও বটে। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষা দেয়ার জন্য American Civil Liberties Union (ACLU)- এর অবদান অনন্য। ACLU কতকগুলো নৈতিক সমস্যার কথা বলেছে এবং এসব নৈতিক সমস্যার সারসত্তা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নজরদারির মাধ্যমে ব্যক্তির গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে কর্মচারীগণ অসদাচরণের শিকার হতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৬ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে যেখানে তৃতীয় পক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন তথ্য প্রকাশ করতে পারবে না। এই আইনটি The Electronic Communications Privacy Act নামে পরিচিত। এ আইন অনুযায়ী একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের যোগাযোগ, ব্যক্তিগত ভিডিও কনফারেন্স, সংকেত, লেখা, চিত্র, শব্দ, মোবাইল ফোনে আড়িপাতা ইত্যাদি অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভার্জিনিয়ার আলেক্সান্দ্রিয়া ভিত্তিক সংগঠন Society for Human Resource Management এ সংক্রান্ত একটি জরিপ পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮০% কোম্পানি ইমেইল ব্যবহার করে। তন্মধ্যে মাত্র ৩৬% কোম্পানি ইমেইল সংক্রান্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত এবং এদের মধ্যে মাত্র ৩২% কোম্পানি লিখিত নীতিমালার আওতাধীন।[৪৫] এসব তথ্য উপাত্ত এটাই ইঙ্গিত করে যে কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের গোপনীয়তার বিষয়টি এখানো সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালার আওতাভুক্ত নয়।

৩.৫.১.৯.৪ কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার: কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে বিধিনিষেধগুলো স্পষ্ট নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতি ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ তথ্য আদান প্রদান হয়। এক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে ২০০০ সালে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ৭ ট্রিলিয়ন বার্তা আদান-প্রদান করা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার আরভিন ভিত্তিক সংগঠন Morrison and Foerster এর শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রধান জো টাকার মনে করেন যে যদি কর্মচারী অফিসে বসে কাজের সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাহলে গোপনীয়তার ধরন নির্ধারণ করবেন নিয়োগকর্তা। এ দিক বিবেচনা করে বলা যায় AUP (Appropriate Use Policies) এর উন্নয়ন ব্যতিরেকে কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি অনির্ধারিতই থেকে যাবে। কর্মচারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের নীতিমালা মূলত কোম্পানির উপর নির্ভর করে। কোম্পানি সাধারণত নিজস্ব ব্যবসায়, সংস্কৃতি, ব্যবসায়ের ধরন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। তবে এইসব নীতিমালা অবশ্যই উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব দ্বারা প্রণীত হতে হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা বিষয়ে কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মনিটরিং দক্ষতাও গড়ে তুলতে হবে এবং নীতিমালাটি সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং অদ্বর্থ্যক ভাষায় রচিত হতে হবে নতুবা এর মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। আবার, নীতিমালা তৈরীর ক্ষেত্রে কেবল কর্মচারীই নয় বরং সমগ্র

স্টেইকহোল্ডারের স্বার্থ বিবেচনায় আনা উচিত। ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কিত নীতিমালা কোম্পানির জন্য সদর্থক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। যেমন (অ) কর্মচারীদের কাজের সময় রক্ষা করতে বা বাচাতে পারে; (আ) কোম্পানির জরুরী ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা সংরক্ষিত থাকে; (ই) কোম্পানিকে গোপনীয় তথ্য প্রকাশ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এবং (ঈ) কর্মচারীদের বিভিন্ন অনলাইন হয়রানি থেকে রক্ষা করা তথা সামগ্রিকভাবে কোম্পানির সুনাম অক্ষুন্ন রাখকে সহায়তা করে। তাই কতিপয় নির্দেশনা মেনে নিয়োগকর্তা একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেন। যেমন (ক) কর্মচারীদের জানিয়ে দিতে হবে যে তারা যেন গোপনীয়তার প্রত্যাশা না করেন; (খ) কর্মচারীদের জন্য কোম্পানির গোপনীয়তা নীতিমালা মেনে চলার লিখিত সম্মতি প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে; (গ) কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য কেবল আইনসম্মত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন; (ঘ) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো কর্মচারীর ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কাউকে দেয়া যাবেনা; (ঙ) কর্মচারীদের মেডিকেল তথ্য সম্বলিত ফাইল অন্যান্য কাগজপত্র অন্যত্র নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে এবং (চ) বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক কাজে কোনো কর্মচারীর নাম বা ছবি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তার লিখিত অনুমতি নিতে হবে।[৪৬] অবশ্য এসব বিষয় বাস্তবায়ন করা কোম্পানির সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

৩.৫.১.৯.৫ মাদকাসক্তি পরীক্ষা এবং গোপনীয়তার অধিকার: মাদকাসক্তি পরীক্ষা এবং এ সংক্রান্ত গোপনীয়তার অধিকার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। মাদকাসক্তি পরীক্ষার পক্ষের প্রবক্তারা বলে থাকেন যে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তি পরীক্ষ করা জরুরী। কেননা, কর্মচারী যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ কিংবা মাদকাসক্ত হন তাহলে তার কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, অনেকক্ষেত্রে মাদকাসক্ত কর্মীর বিভিন্ন আচরণের জন্য কোম্পানির সুনাম ক্ষুন্ন হয়। আবার, অনেকক্ষেত্রে কর্মচারী মাদকাসক্ত কিংবা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে অনেক মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ উড়োজাহাজের পাইলট কিংবা পারমানবিক প্রকল্পের কর্মীদের কথা বলা যেতে পারে। ২০১৮ সালের ১২ মার্চ ইউএস-বাংলার যাত্রীবাহী একটি বিমান ৭১ জন যাত্রী নিয়ে নেপালের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুর ত্রিবুবন বিমান বন্দরে উক্ত বিমান বিধ্বস্ত হয় এবং ৭১ জন যাত্রীর মধ্যে ৪৯ জনের মৃত্যু হয়।[৪৭] কোন কোন পত্রিকার ভাষ্যমতে, উক্ত বিমানের পাইলট মাদক নিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে, মাদকাসক্তি পরীক্ষার বিপক্ষের প্রবক্তাগণের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এমন পরীক্ষায় কর্মচারীদের গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে থাকে এবং এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুমান করা হয়না। মাদকাসক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোম্পানি কতিপয় নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে পারে। যেমন (ক) পরীক্ষা শুধুমাত্র

সেইসব চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত যেখানে কর্মচারী কর্তৃক অন্যান্য মানুষের সুস্পষ্ট ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; (খ) পরীক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত এবং যার পরীক্ষা নেয়া হবে সেই কর্মচারীকে অবশ্যই এ বিষয়ে পূর্বেই অবহিত করা উচিত; (গ) পরীক্ষার ফলাফল সেই কর্মচারীকে অবহিত করা উচিত; (ঘ) সংশ্লিষ্ট সেই কর্মচারীকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দেয়া উচিত এবং (ঙ) পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ অথবা প্রয়োজনে নষ্ট করার ক্ষেত্রে কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে তা কর্মচারীকে অবহিত করা উচিত। মাদকাসক্তি পরীক্ষা এবং গোপনীয়তার অধিকার যেন কোন পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে ক্ষুন্ন না করে সে দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিত।

৩.৫.১.১০ হয়রানির শিকার না হওয়ার অধিকার: আমরা জানি কর্মচারীরা সাধারণত তাদের দৈনিক কর্মব্যস্ততার সিংহভাগ সময়ই কমস্থলে ব্যয় করে থাকে। তাই কর্মস্থলে মানসিক, শারীরিক, আর্থিক হয়রানির শিকার না হওয়টা কর্মচারীর আইনগত ও নৈতিক অধিকার বলে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্মস্থলে শ্রমিক হয়রানির নানারকম তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কর্মস্থলে হয়রানির কয়েকটি নমুনা হলো নির্ধারিত সময়ে কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ না করা, প্রাপ্য ছুটি থেকে বঞ্চিত করা বা গড়িমসি বা বিলম্ব করা, অসুস্থতার কারেণ চাকুরিচ্যুত করা, নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা, চাপ সৃষ্টি বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করানো ইত্যাদি। কর্মস্থলে দিনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করার কারণে শ্রমিকদের কর্মস্থলে খাবার খেতে হয়, ধর্মীয় কাজ করতে হয়, বিশ্রাম নিতে হয়। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লটের ব্যবস্থা থাকা, যৌন নির্যাতনের শিকার না হওয়া প্রভৃতি শ্রমিকের নৈতিক ও মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। সম্প্রতি যৌন হয়রানির বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার হয়রানি আরো বহু প্রকার হতে পারে। ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক যুগান্তরের* অনলাইন সংস্করণে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্টের আর্থিক সহযোগিতায় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কেয়ারের সহায়তায় পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের হয়রানি ও নির্যাতনের উপর 'কর্মজীবী নারী' নামক বাংলাদেশী একটি সংগঠন তাদের গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, মালিকপক্ষ শ্রম আইন লঙ্ঘন করে ৫০ শতাংশ শ্রমিককে ৯ ঘণ্টা বা তার অধিক সময় পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করে, ৫০ শতাংশ শ্রমিক ১০ ঘণ্টার অধিক সময় পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়, ওভারটাইম করা বাধ্যতামূলক যা দৈনিক দুই ঘণ্টারও বেশি, ৭০ শতাংশ শ্রমিক বিশ্রামের কোন সুযোগ পায় না, ২৫.৩ শতাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি পায় না, ৩১.৩ শতাংশ নারী শ্রমিকের কোন

নিয়োগপত্র নেই, ৫৩.৩ শতাংশ কারখানায় সার্ভিসবুক নেই, ৯৮.৭ শতাংশের হাজিরা কার্ড রয়েছে, ৮৪.৭ শতাংশ শ্রমিক মৌখিক হয়রানির শিকার হয়, ৭১.৩ শতাংশ শ্রমিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, ২০ শতাংশ শ্রমিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়, ১২.৭ শতাংশ শ্রমিক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এই নির্যাতনের শীর্ষে রয়েছে পোশাক কারখানার সুপারভাইজার যা ৫২ শতাংশ শ্রমিক দ্বারা সমর্থিত। ৭৪.৭ শতাংশ নারী রাতে পালিয়ে কাজ করে এবং ৩২ শতাংশ শ্রমিকই জানে না এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোথায় অভিযোগ করতে হয়। এছাড়াও 'বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ক প্রচার অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২২ শতাংশ নারী শ্রমিক মনে করে তারা কারখানার ভেতর বা বাহিরে, শারীরিক, মানসিক, নিরাপত্তা কর্মীদের অস্বস্তিকর আচরণ, তল্লাশি, পুরুষ সহকর্মীর অপ্রত্যাশিত স্পর্শ ইত্যাদি হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। ৬৬ শতাংশ মনে করে হয়রানির বিচার পাওয়া যাবে না তাই তারা প্রতিকারও চায় না। এসব হয়রানির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সুপারভাইজার ও ব্যবস্থাপক। ৮৩ শতাংশ নারী শ্রমিক মনে করে তারা সুপারভাইজার ও ব্যবস্থাপক দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার।[৪৮] এসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় মালিকপক্ষ যদি এসব অধিকার নিশ্চিত না করে তাহলে তা অনৈতিক ও অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। তাই প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উক্ত হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারীকে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, হয়রানি ও নির্যাতন মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা নিয়োগকর্তার আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ফলে শ্রমিকগণ তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত হবেন এবং নিয়োগকর্তাও শ্রমিকদের কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কাঙ্খিত উৎপাদন ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণে সক্ষম হবেন।

৩.৫.১.১১ জেনেটিক বৈষম্য: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ডিএনএ (DNA) পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে কর্মচারীরা বৈষম্যের শিকার হতে পারেন। যেমন (ক) ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যদি ভবিষ্যতে কোনো কর্মচারীর রোগ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার তথ্য প্রকাশ করে তাহলে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনেক কোম্পানি উক্ত কর্মচারীকে অন্যায্যভাবে চাকুরিচ্যুত কিংবা নানাবিধ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ রয়েছে; (খ) বীমা কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের ডিএনএ পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন কৌশলে সংগ্রহ করে এবং ভবিষ্যতে কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কর্মচারীদের বীমা সুবিধা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। এমনক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় কর্মচারীদের ডিএনএ পরীক্ষা করা কি উচিত? আমেরিকার টেক্সাসের Fort Worthi-এর 'Burlington Northern Santa Fe Railway Company'-এর বিরুদ্ধে এমন একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

মামলাটি ২০০১ সালে নিষ্পত্তি হয়। ঐ মামলায় রেল কোম্পানিকে ভবিষ্যতে জেনেটিক পরীক্ষা বন্ধ করতে বলা হয়। ২০০১ সালে আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটার সিনেটর থমাস ডেসচল এবং নিউইয়র্কের কংগ্রেসওম্যান লুইস স্লটার 'The Genetic Nondiscrimination in Health Insurance and Employment Act'-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৪৯] তাঁরা মনে করেন এই আইনের মাধ্যমে কর্মচারীদের প্রতি সংঘটিত জেনেটিক বৈষম্য রোধ করা সম্ভব হবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার সুসংহত করতে সক্ষম হবে।

৩.৫.১.১২ শ্রমিক সংগঠিত হওয়া এবং ইউনিয়ন করার অধিকার: উন্নত এবং অনুন্নত সকল রাষ্ট্রেই শ্রমিক ইউনিয়ন একটি বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক বিশ্বে শ্রমিক সংগঠনকে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার আদায়ের একটি প্লাটফরম হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) দ্বারা স্বীকৃত। পৃথিবীর কতিপয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, কোরিয়া এবং কতিপয় স্বৈরশাসক কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র যেমন ইরিত্রা ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় মৌলিক আইনগত অধিকার হিসেবে অনুমোদিত।[৫০] মালিক কিংবা ব্যবস্থাপকদের যেমন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগঠিত হওয়ার অধিকার রয়েছে তেমনি শ্রমিকদেরও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগঠিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা, তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন নাগরিক। আবার, একই উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক ব্যক্তি যদি সংগঠিত হতে চায় তখন প্রতিষ্ঠিত হয় সংগঠন। শ্রমিকরাও তেমনি তাদের সম্মিলিত দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে থাকে। অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়ন হলো একটা সংগঠন যেটি শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে। এই সংগঠনটি নিয়োগকর্তার সঙ্গে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদের মজুরি বৃদ্ধি, কাজের অবস্থা, কর্মপরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করা, কাজের অন্যান্য শর্ত শ্রমিক বান্ধব করার জন্য মধ্যস্থতা করে থাকে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের আইনগত মর্যাদার বাইরে এদের বিশেষ কোনো অধিকার নেই। ফলে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ যদি কোন ধরনের ভারসাম্যমূলক সমঝোতায় পৌছাতে না পারে তাহলে শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের দাবি আদায়ের জন্য সাধারণত ধর্মঘট দেয় এবং শ্রমিকেরা ধর্মঘট পালন করে থাকে। এমতাবস্থায় কোম্পানি সমূহ লোকসান বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে অনেকসময় দেখা যায় ইউনিয়নের কতিপয় নেতা মালিক পক্ষ থেকে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করে চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে অথবা ধর্মঘট প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ এর ৪২ নং আইনের 'ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৭৬ নং ধারায় মালিক ও শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার ও পছন্দানুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।[৫১] যেমন *দৈনিক ইত্তেফাকের* ২০১৮ সালের ৪ মার্চের অনলাইন সংস্করণের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এক গবেষণা জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে প্রায় ৯৭% কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই। মাত্র ৩.৩% কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে তবে শ্রম আইন ২০০৬ এর ৪২ নং আইনের বাধ্যবাধকতায় ৯১% কলকারখানায় 'ওয়ার্কার্স পার্টিসেপেটরি কমিটি' রয়েছে। তবে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের শ্রম আইনে বেশ কিছু জটিলতা ছিল এবং বর্তমানে সেখানে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের ক্ষেত্রে ৩০% শ্রমিকদের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে উক্ত আইন সংশোধন করে রেজিস্ট্রিকরণের জন্য ২০% শ্রমিকদের সম্মতির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।[৫২] পূর্বে বাংলাদেশে শ্রমিকদের দাবি আদায় করার লক্ষ্যে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের নিমিত্তে দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিকদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ৫১ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনের মাধ্যমে নিজেদের যৌক্তিক দাবি তুলে ধরার জন্য কর্ম বিরতি বা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে পারবে।[৫৩] ফলে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, স্বাধীনতা, সম আচরণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় কর্মচারীর অধিকার সুসংহত না হলে বা নিয়োগকর্তা যদি কর্মচারীর উপর অন্যায্য সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় তখন ট্রেড ইউনিয়ন আইনগত ও নৈতিক অধিকার বলে তা প্রত্যাখান করে যা একক কোন শ্রমিকের পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে সার্বজনীন মানবাধিকারের ২৩ এর ৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests." এ ঘোষণার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে শ্রমিক সংগঠন গঠন করা ও তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। ফলে শ্রমিক তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আদায়ের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ও অন্যের ক্ষতি না করে প্রতিষ্ঠানে কর্ম বিরতি বা ধর্মঘট পালন করতে পারে। এভাবে ট্রেড ইউনিয়ন মালিকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে যা মালিক-শ্রমিকের সমঝোতার সম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করে। এরূপ অবস্থায় মালিকের কর্তব্য হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে কর্ম বিমূখ শ্রমিকদের কর্মে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করা। এরূপ একটি ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হতে হলে উভয়পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যা পারস্পরিক বিনিময়ের

দিকটিকে ইঙ্গিত করে এবং এই পারস্পরিক বিনিময়ের কারণে শ্রমিক ও মালিক উভয়েই তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে যা চূড়ান্তভবে একটা স্থিতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই উৎসাহিত করে ।

৩.৫.১.১৩ প্রকল্প বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অধিকার: কোম্পানি তার আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে অনেক সময় প্রয়োজনে কোনো প্রকল্প এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর কিংবা বন্ধ করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে। সাধারণত যদি প্রকল্প অন্যস্থানে স্থানান্তরের ফলে কোম্পানির ব্যবসায়িকভাবে অধিক লাভবান হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাহলে কোম্পানি প্রকল্প স্থানান্তর করে থাকে। যেমন নতুন স্থানে যদি শ্রম বাজার বা কাঁচামাল তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হয়, সরবরাহের প্রতুলতা থাকে, পরিবহন ব্যয়, করের হার ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে কোম্পানির অধিকতর মুনাফা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে কোম্পানী তার প্রত্যাশিত লাভ করার সম্ভাবনা কমে যায় সেক্ষেত্রে কোম্পানি প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে থাকে। যেমন প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে, আথির্কভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, রাজনৈতিক কিংবা আইনি কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে কোম্পানি প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ প্রকল্পের শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাদের দৈনন্দিন রুজিরুটির পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন ক্রমগত লোকসানের অজুহাতে ২০০২ সালের ৩০ জুন তৎকালীন সরকারের এক নির্বাহী আদেশে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মিল বন্ধ হওয়ার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও অনেক শ্রমিক আজও তাদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারেনি, অনেকে বেকার জীবনযাপন করছে, অনেকে অর্থ কষ্টের কারণে চিকিৎসা গ্রহণ করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করেছে। তাই কোনো প্রকল্প বন্ধ করার ক্ষেত্রে কতিপয় নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন ঐ প্রকল্প বন্ধের ফলে যেসব শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের কোন ধরনের অধিকার কী রয়েছে? ঐসব ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কোন ধরনের দায়িত্ব কী কোম্পানির রয়েছে? প্রকল্প বন্ধ বা স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য আমেরিকায় ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাস থেকে এ সংক্রান্ত একটি আইন কার্যকর রয়েছে। এই আইনানুযায়ী যদি কোম্পানির কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জনের অধিক হয় তাহলে প্রকল্প বন্ধ করার ন্যূনতম ৬০ দিন পূর্বে কর্মচারীদের নোটিশ দিতে হবে। এছাড়াও প্রকল্প বন্ধ বা স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে কোম্পানির শ্রমিকদের প্রতি কিছু নৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। যেমন কর্মচারীদের প্রতি সদাচরণ করা, কারো প্রতি বৈষম্য না করা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে প্রকল্প বন্ধ বা স্থানান্তরের ফলে চাকুরিচ্যুতি কিংবা অন্যস্থানে বদলি ঘটলে কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার

রয়েছে। পাশাপাশি চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে অন্য কোনো চাকুরি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম জীবন-যাপনের ভাতা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এছাড়া পেনশন, স্বাস্থ্য ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা উত্তোলনকরাও তাদের অধিকার। এছাড়াও অনেকে কর্মচারীদের আরো কিছু অধিকার দেয়া উচিত বলে মনে করেন। যেমন প্রকল্পের নতুন মালিকের সন্ধান করা কিংবা সকল কর্মচারীর সম্মিলিত মালিকানায় প্রকল্পটি চালু রাখা সম্ভব কিনা কর্মচারীদের সে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে দেয়া। কর্মচারীদের এমন অধিকার দেয়ার পক্ষে অনেকই যুক্তি তুলে ধরেন। এসব যুক্তির অন্যতম হলো প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে কর্মচারীরা বেকার হয়ে পড়ে, এমনকি তাদের অনেকে আর কখনো চাকুরি খুজে পায়না। আবার, প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পায়। ফলে স্থানীয় কিংবা জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব সমস্যার কথা বিবেচনায় এনে কর্মচারীদের উল্লিখিত অধিকার দেয়ার কথা বলা হয়ে থাকে।[৫৪] কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কোম্পানি অধিক মুনাফার আশায় প্রকল্প বন্ধ বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অধিকাংশ অধিকার ও স্বার্থকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র স্বীয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতি মনোনিবেশ করে যা পারস্পরিক বিনিময় এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী যা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এরকম কর্মকাণ্ডের কারণে কোম্পানির সুনামও ক্ষুন্ন হয়ে থাকে যা টেকসই ব্যবসায়ের পরিপন্থী ।

৩.৫.১.১৪ ছুটি পাওয়ার অধিকার: আমরা জানি মানুষ যদি সারাদিন কর্ম ব্যস্ত থাকে তাহলে সে অনেকটা যন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কর্মস্থলের অবসাদগ্রস্ততা দূর করা এবং মৌলিক মানবীয় গুণ বিকাশের জন্য শ্রান্তিবিনোদন ছুটিও প্রয়োজন। তাই ছুটি হলো কর্মচারীর মৌলিক মানবাধিকার। এ কারণে সার্বজনীন মানবাধিকারের ২৪ নম্বর আর্টিকেলে বলা হয়েছে, "Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay." মানবাধিকারের এ ঘোষণা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্রাম, যৌক্তিক কর্ম ঘণ্টা, বিভিন্ন মেয়াদে সবেতনে ছুটি পাওয়ার অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন ১৯৮৫ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে ক্রিস্টোফার ডড, উইলিয়াম ক্লে এবং প্যাট্রিসিয়া শ্রোয়েডার FMLA (The family and medical leave act) নামক আইন প্রণয়নের নিমিত্তে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দীর্ঘ আট বছর পরে সেটি আইনে রূপান্তরিত হয়। এরপর ১৯৯৫ সালে চূড়ান্ত বিধিগুলো আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। FMLA অনুযায়ী একজন কর্মচারী বছরে সর্বোচ্চ ১২ সপ্তাহ পারিবারিক ও চিকিৎসাজনিত বিভিন্ন কারণে অবৈতনিক ছুটি নিতে পারবেন। যেমন সন্তান জন্মদান বা লালনপালন, স্বামী-স্ত্রী কিংবা নিকটাত্মীয়ের অসুস্থতায় সেবাযত্ন কিংবা ব্যক্তিগত অসুস্থতার ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য হবে। ১২ সপ্তাহের ছুটি একত্রে নেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি কর্মচারী প্রয়োজন

অনুযায়ী কর্মঘন্টা কমিয়ে আনার মাধ্যমে এই ছুটি গ্রহণ করতে পারবেন। তবে FMLA প্রযোজ্য হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে কর্মচারীর চাকুরির বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে এবং ঐ বছরে অন্তত ১২৫০ কর্ম ঘন্টা থাকতে হবে। ছুটিকালীন সময়ের জন্য পূর্বনির্ধারিত নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা নিয়োগকর্তার দায়িত্ব। ছুটি শেষ হওয়ার পরে কর্মচারীকে তার স্বপদে পুর্নবহাল করতে হবে অথবা 'সমমর্যদা' সম্পন্ন অন্য কোনো পদে নিয়োগ দিতে হবে। এখানে 'সমমর্যদা' বলতে বোঝায় পূর্বের সমান বেতন ও সুযোগ সুবিধা, অনুরূপ কর্মপরিবেশ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পন্ন পদ।[৫৫]

নিয়োগকর্তা প্রয়োজন মনে করলে ছুটি গ্রহণের ৩০ দিন পূর্বে তাঁকে নোটিশ দেয়ার জন্য কর্মচারীকে শর্ত দিতে পারেন। আবার, নিয়োগকর্তা অসুস্থতাজনিত ছুটির ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটও চাইতে পারেন। আমেরিকায় ১০% সর্বোচ্চ বেতনভাতা ভোগ করে থাকে এমন কর্মচারীকে মূল কর্মী হিসেবে বোঝায়। তবে এমনক্ষেত্রে ঐ কর্মচারী যে মূল কর্মীদের একজন সেটি তাকে স্পষ্টভাবে জানানো নিয়োগকর্তার দায়িত্ব। উল্লেখ্য মূল কর্মচারীদের অনুপস্থিতিতে কোম্পানি আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কর্মচারী, নিয়োগকর্তা, সরকার সবই FMLA-এর মারাত্মক কিছু সমস্যার কথা বলেন। যেমন অনেক কর্মচারীরা মনে করেন যে মারাত্মক অসুস্থতার সময় FMLA-এর আওতায় ছুটি চাওয়ার প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়না। আবার অনেক নিয়োগকর্তার মতে FMLA প্রবর্তনের কারণে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অন্যদিকে, সরকারের অনেক নীতিনির্ধারক মনে করেন যে FMLA প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় নিয়োগকর্তা অনিচ্ছাকৃতভাবে FMLA-এর কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে ফেলেছেন। অন্যদিকে, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় কর্মচারীদের পক্ষে রায় দেয়ার প্রবণতা বিচারকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এসব মামলার অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় কর্মচারীর অসুস্থতা গুরুতর ছিলোনা। কিন্তু ৭৫০০ জনেরও বেশি মানুষের উপর ৭ বছর ব্যাপী পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সর্বোচ্চ বেতনভোগী আমেরিকার নাগরিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষেত্রে অসুস্থতাজহানিত ছুটি নীতি থেকে বঞ্চিত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৪ শতাংশ, তৃতীয় সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে এই হার ৬৩ শতাংশ, এবং সর্বনিম্ন বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে তা ৭৬ শতাংশ।[৫৬] অর্থাৎ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির কর্মচারীরাই অপেক্ষাকৃত বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশেও সরকারি চাকুরিজীবীদের চিত্ত বা শ্রান্তি বিনোদন নামক ছুটি রয়েছে যা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের প্রতি আরোও দায়িত্বশীল হওয়া অথবা কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করার নিমিত্তে উদ্যমী হওয়ার জন্য প্রত্যেক তিন বছর অন্তর অন্তর সর্বশেষ মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ

পনেরো দিনের ছুটি প্রদান করা হয় যদিও কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সমভাবে প্রযোজ্য নয়।[৫৭] এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি, চিকিৎসাজনিত ছুটি, অর্জিত ছুটি নামে বিভিন্ন রকম ছুটি রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর নবম অধ্যায়ে 'কর্মঘণ্টা ও ছুটি' নামক অধ্যায়ের **১১৫** আর্টিক্যালে কর্মচারীদের প্রতি বছর পূর্ণ মজুরিতে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করার অধিকার রয়েছে। তবে উক্ত অধিকার কোন কর্মচারী ভোগ না করিলে তা পরবর্তী নতুন বছরের সাথে যুক্ত হবে না। আবার **১১৭** আর্টিক্যালের **১ম** অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (ক) কোন দোকান অথবা বাণিজ্য অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা সড়ক পরিবহন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি আঠারো দিন কাজের জন্য মজুরিসহ একদিন করে বারো মাসে কর্মচারীর নামে উক্ত ছুটি জমা হইবে; (খ) চা বাগানের ক্ষেত্রে প্রতি বাইশ দিন কাজের জন্য মজুরিসহ একদিন করে বারো মাসে কর্মচারীর নামে উক্ত ছুটি জমা হইবে এবং (গ) সংবাদপত্রের জন্য 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলী) আইন, ২০১৮ নামে একটি আইন প্রণয়ন হয়। নতুন আইনে নৈমিত্তিক ছুটি ১০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিন করা হয়েছে। এককালীন বা একাধিকবারে ১০ দিনের উৎসব ছুটি পাবেন।[৫৮] নারী গণমাধ্যম কর্মীগণ মাতৃত্বকালীন ছুটি ২ মাসের পরিবর্তে সবেতনে ৬ মাস ছুটি পাবেন। সকল গণমাধ্যম কর্মী প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পূর্ণবেতনসহ শ্রান্তিবিনোদন ছুটি পাবেন। প্রতি এগারো দিন কাজের জন্য একদিন করে অর্জিত ছুটি পাবেন।[৫৯]

এতক্ষণ আমরা কর্মকর্তা-কর্মচারীর অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু অধিকারের ধারণাটি কেবল কর্মচারী-কর্মকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় নিয়োগকর্তারও কতিপয় অধিকার রয়েছে যা পক্ষান্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ববোধকেই নির্দেশ করে। এখন আমরা নিয়োগকর্তার অধিকার নিয়ে আলোচনা করব যা নিম্নরূপ:

৩.৫.২ নিয়োগকর্তার অধিকার: পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে একজন ব্যক্তি হিসেবে কর্মচারীর যেমন কতিপয় নৈতিক, আইনগত ও মৌলিক মানবিক অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনি একই বক্তব্য নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ নিয়োগকর্তাও একজন মানুষ হিসেবে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে তাঁর কর্মচারীর নিকট থেকে প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকটি প্রত্যাশা করতে পারে। কেননা কর্মচারীর ন্যায্য বেতন প্রদান করা যেমন নিয়োগকর্তার দায়িত্ব ঠিক তেমনি নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে একজন কর্মচারী কোন রকমের কূটকৌশলের আশ্রয় না নেওয়াও কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যেরই অংশ। যদি এভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাহলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন তার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে ঠিক তেমনি নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর উভয়ের

কার্যক্রম পাস্পরিক বিনিময় হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নে নিয়োগকর্তার অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলো:

৩.৫.২.১ নিয়োগকর্তার প্রতি কর্মচারীর দায়বদ্ধতা: কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে কাজ করাই হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নৈতিক দায়িত্ব এবং ঐসব লক্ষ্য পূরণে প্রতিকূলতা হিসেবে বিবেচিত অথবা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর যে কোন কার্যাবলী এড়িয়ে চলা। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে কোন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে তাহলে সেটি এক ধরনের অপরাধ যা 'White-collar crime'-এর আওতায় পড়ে। যেমন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক এমনভাবে প্রতিষ্ঠানের তহবিল পরিচালনা করবেন যেন তা কম ঝুঁকিপূর্ণ হয় এবং উক্ত বিনিয়োগ থেকে শেয়ারমালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন। কারণ ব্যবস্থাপক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থাপক সর্বোচ্চ মেধা, মনন ও শ্রম প্রদান করবে যেন প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়। মনে রাখতে হবে একজন ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। একজন ব্যবস্থাপককে তখনই ব্যর্থ বলা হবে যখন তিনি প্রতিষ্ঠানের অর্থ তছরুপ, অপচয়, আর্থিক বিবরণী তৈরিতে অবহেলা, প্রতারণা কিম্বা ভুল তথ্য সন্নিবেশিত করার প্রয়াসী হবেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্বের এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিটি পরবর্তীতে এজেন্সি আইনে (Law of agency) অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আইনে বলা হয়, "… "law of agency"— that is, the law that specifies the legal duties of "agents" (e.g., employees) toward their "principals" (e.g., employers)."[৬৩] অর্থাৎ এটা এমনন আইন যা এজেন্টদের (কর্মকর্তা-কর্মচারী) তাদের প্রিন্সিপালের (নিয়োগকর্তা) প্রতি আইনি দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়। এ আইনের আলোকে অনেকেই বলে থাকেন যে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করতে বদ্ধপরিকর। নিয়োগকর্তার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করা থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিরত থাকবে। অর্থাৎ এক কথায় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে যা জনস্বার্থ বিরোধী হিসেবে পরিগণিত হবে না। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের অবস্থান বা পদ-পদবী ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ঘুষ লেনদেন করা, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের তথ্য হুইসল্ ব্লোয়িং করা, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত ও মূল্যবানসামগ্রী চুরি করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

৩.৫.২.২ ব্যবসায়ের গোপনীয়তা: বিশ্ব বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো ব্যবসায়ের গোপনীয়তা (Trade secret)। সাধারণভাবে গোপনীয়তা হলো কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থেকে নিজের সম্পর্কে তথ্য গোপন করা বা প্রয়োজনানুসারে তথ্য প্রকাশ করার অধিকার। ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য অথবা ব্যবসায় গোপনীয়তা এমন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে গঠিত। প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকিস্বরূপ। কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রম, প্রযুক্তি ব্যবহার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নীতি বা নথি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রতিষ্ঠান জেনে যায় তাহলে তা হবে প্রতিষ্ঠানের জন্য বস্তুগতভাবে ক্ষতিকর। কারণ তা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকে দুর্বল করবে। অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্টতা অথবা কর্মকাণ্ড অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান জেনে যাওয়ার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তার পক্ষে কঠিন হতে পারে। গোপনীয়তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিষয় এবং অধিকারও বটে। কারণ তা কেবলমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রণীত এবং বিকশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কখনোই চায় না প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অবগত হোক। যেমন যে কোন প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সূত্র প্রয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করে যা সে অন্য কাউকে জানাতে ইচ্ছুক নয়। কারণ পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সূত্র, সূত্র সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ব্যবসায় গোপনীয়তা হিসেবে বিবেচিত। এক কথায় যোগানদাতাদের তালিকা, ভোক্তার তালিকা, গবেষণার ফলাফল, পণ্য উৎপাদনের সূত্র, কম্পিউটার ডাটা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, পণ্য বাজারজাতকরণ, পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা ইত্যাদি যে কোন ধরনের তথ্য প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে যখন প্রতিষ্ঠানের বিকাশ বা সমৃদ্ধি সাধন করে তাই ব্যবসায় গোপনীয়তা। কারণ বিশেষ করে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধিকরণে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত থাকে তারা প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত থাকে। প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম সচল রাখা অথবা ক্রমবিকাশের জন্য উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তাকে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রায় সময়ই ব্যবহারের সুযোগ থাকে। তাই কর্মকর্তা-কর্মচারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বহির্ভূত কোন কাজে ব্যবহার করা অনৈতিক। কারণ প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারবে না। ধরুন কোন একজন প্রকৌশলীকে একটি প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অধিকতর উন্নয়ন নিমিত্তে চুক্তিতে আবদ্ধ করল এবং সে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে

প্রতিষ্ঠানের অনেক গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হলো। পরবর্তীতে উক্ত প্রকৌশলী যদি উচ্চতর বেতনের বিনিময়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন যা পূর্বের প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহলে তা হবে অনৈতিক। কিন্তু কোন কোম্পানিতে কাজ করার মাধ্যমে যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা অর্জিত হয় এবং তা নতুনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করেন সেক্ষেত্রে ব্যবসায় গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ ব্যবসায় গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গঠিত হয় তথ্যের সমন্বয়ে — দক্ষতার সমন্বয়ে নয়। তাই কোন কর্মীর দক্ষতা অর্জনকে তার নিজস্ব বলে বিবেচিত হয় এবং তা নিয়োগকর্তার সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু অনেক সময় দক্ষতাকে ব্যবসায় গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বিভাজন করা সহজ হয়ে উঠে না। কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীর সঙ্গে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যেন উক্ত কর্মী চাকুরি ছেড়ে তৎপরবর্তি ১ বা ২ বছরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। কিছু কর্মী বিষয়টিকে আদলতে উপস্থাপন করলে আদলত এরূপ চুক্তির বৈধতাকে প্রত্যাখান করে। আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গোপনীয়তা সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানকল্পে কর্মীদের বিদায়কালীন সময়ে অব্যাহতভাবে পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চুক্তি করে বা কর্মীদের ভবিষ্যৎ পেনশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য না জানানোর শর্তে চুক্তি করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের অপব্যবহারের নৈতিক বিষয়টি বিগত কয়েক দশকে আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ক্রমবর্ধমানহারে নতুন তথ্য প্রযুক্তি (কম্পিউটার) ব্যবহার তথ্যকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করেছে যেখানে কর্মীদের নিয়মিত প্রবেশাধিকার থাকে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ যেহেতু চলমান সেহেতু এই বিষয়টি নৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়টি আলোচনা সম্পন্ন করার পূর্বে এটা বলা প্রয়োজন যে, মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব কিন্তু অসীম নয়। কারণ তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। কারণ অন্যান্যদের ন্যায্য অধিকারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে।[৬১] ফলে তথ্য গোপন করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অধিকারই চূড়ান্ত নয়। কারণ একজনের অধিকার রক্ষা করার অজুহাতে অন্যের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াটাও কাম্য হতে পারে না।

৩.৫.২.৩ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য: প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Insider trading)। সাধারণভাবে অভ্যন্তরীণ তথ্য জেনে প্রতিষ্ঠানের স্টক থেকে কেনাবেচাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ তথ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অথবা অন্যান্য তথ্য যা প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কোন সদস্য জানবে না। যদি জানে তাহলে

তা প্রতিষ্ঠানের স্টকের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জানতে পারেন যে, বহিরাগত যে কোন জনসাধারণ অবগত হওয়ার পূর্বেই উক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের সাথে বহু বিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে অবগত হয়ে যায়। তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি একটা বৃহৎ সংখ্যক স্টক ক্রয় করে এটা জেনে যে, যখন চুক্তির বিষয়টি উন্মুক্ত হবে তখন স্টকের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য ক্রেতারা এটার মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্টকের ক্রয়ই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। সভাপতির কথায় যদি অন্য কেউ তৎক্ষণাৎ স্টক ক্রয় করে তাহলেও তা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংকারদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য বিগত দশকে অনেক স্টকব্রোকার বিচারের মুখোমুখি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অবৈধ হওয়াটা কেবল অনৈতিকই নয় বরং এখানে এটা দাবি করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ তথ্য পেয়ে যিনি ব্যবসায় করেন তিনি তথ্য চুরি করেন বলেই ধরে নেয়া হয়। এভাবে তিনি অন্যায্য সুবিধা প্রাপ্ত হোন। অনেকেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে সামাজিকভাবে উপকারী হিসেবে বিবেচনা করে এটাকে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে উৎসাহিত করা উচিত বলে মনে করেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তিগুলো হলো:[৬২]

প্রথমত: প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভেতরের সদস্য এবং তাঁদের শুভানুধ্যায়ীগণ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ তথ্য শেয়ার বাজারে নিয়ে আাসে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায় করে তাঁরা শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করে শেয়ারের প্রকৃত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শেয়ার বাজার তখনই কার্যকরভাবে কাজ করে যখন বাজারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ বাজারে তথ্য নিয়ে আসেন তখন উক্ত তথ্যগুলো অন্যদের জন্য দিকনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমর্থকগণ আরোও মনে করেন যে, এটা সত্য নয় যে যাঁরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অর্থাৎ যাঁরা অভ্যন্তরীণ তথ্য পান না তাঁদের থেকে অধিক অন্যায্য সুবিধা প্রাপ্ত হন। প্রকৃত ঘটনা হলো অধিকাংশ মানুষই যাঁরা শেয়ার কেনাবেচা করেন তাঁরা অনেক সময় অন্যদের চেয়ে অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ। যেমন বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ অথবা গবেষণা করেন এবং তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছু শেয়ারের মূল্য সম্পর্কে তথ্য দেন যা সাধারণ মানুষ অবগত নন। সুস্পষ্টভাবে এখানে ভুল বা অন্যায় কিছু নেই। আরো সাধারণভাবে বলা যায়, এটা অনৈতিক বা অন্যায্য নয় যখন কেউ শেয়ার বাজারে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই যাঁরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে অনৈতিক দাবি করেন তাঁরা

এই বিষয়টিকে নির্দেশ করেন যে, যাঁরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমর্থক তাঁরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য লুকিয়ে রাখেন। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীরা যেসব তথ্য ব্যবহার করেন সে তথ্যের মালিকানা তাঁরা নন। নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, কর্মী এবং যারা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তাঁরা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ তথ্য সম্পর্কে অবগত হন এবং এই তথ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তারের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কর্মীরা তথ্যসহ যে সম্পদ নিয়ে কাজ করে সে সব সম্পদের মালিক যৌথভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশিদারগণও। প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করে নিজে সুবিধাভোগী হওয়া অথবা শুভানুধ্যায়ীদের সুবিধাভোগী করা থেকে বিরত রাখা প্রত্যেক কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। অংশিজন এবং মালিকগণের লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবহা করা প্রত্যেক কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব এবং সমানভাবে প্রতিষ্ঠানের তথ্যও অংশিজন ও মালিকগণের লাভের জন্য ব্যবহার করা প্রত্যেক কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং যখন কোন কর্মী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় তথ্য নিজের সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে তখন তা অনেকটা চুরির শামিল। অর্থাৎ একজন চোর যেমনিভাবে অন্যের সম্পদ চুরি করে তার নৈতিক অবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ঠিক তেমনিভাবে একজন অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ী তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং অংশিজনেদের নৈতিক অধিকার খর্ব করে।

৩.৫.২.৪ স্বার্থের দ্বন্দ্বঃ স্বার্থের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত একটি প্রত্যয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ প্রত্যয়টি সক্রিয়। বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রত্যয়টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব তখনই ঘটে যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এমন কোন কাজে সম্পৃক্ত থাকে যেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের চেয়ে মুখ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন কর্মরত প্রতিষ্ঠানের কোন নিলাম কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করার পরিবর্তে নিজেই প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করে তখনই কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। কারণ নিলাম কার্যক্রমের অনেক গোপনীয় বিষয় অংশগ্রণকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর জানা থাকে বলে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা নাও হতে পারে। কেননা উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে অধিক মনোযোগী হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি তার নিকট উপেক্ষিত থেকে যায়। স্বার্থের দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র আর্থিক সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয় বিষয়টি এমন নয় বরং অন্যান্য কারণেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হতে পারে। যেমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা একই রকম অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শকারী বা সেবা প্রদানকারী

হিসেবে বা অন্য কোন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখে তখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব হতে পারে। যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন ব্যাংকে কর্মরত থেকে একই ধরনের বা প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি ব্যাংকে চাকুরি নিয়ে সেবা প্রদান করে তখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। অথবা একজন হিসাবরক্ষক বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে স্বাধীনভাবে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানে অডিট সেবা প্রদান করে তখনও স্বার্থের দ্বন্দ্ব হতে পারে। কারণ উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্য প্রতিষ্ঠানের অডিট করতে গিয়ে অনেক গোপনীয় তথ্য বীমা প্রতিষ্ঠানকে সরবাহ করতে পারে।[৬৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন বস্তুনিষ্ঠ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, আত্মবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং প্রকৃত স্বার্থের দ্বন্দ্ব। নিম্নে স্বার্থের দ্বন্দ্বের এসব প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

৩.৫.২.৪.১ বস্তুনিষ্ঠ এবং আত্মবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব: বস্তুনিষ্ঠ স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিভিন্ন কারণে হতে পারে তবে এটি সাধারণত অর্থনৈতিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় সংঘটিত হয়। যেমন পূর্বে উল্লিখিত নিলাম সংশ্লিষ্ট উদাহরণটি এ ধরনের দ্বন্দ্বের উদাহরণ। অন্যদিকে, আবেগ বা আত্মীয়তার বন্ধনের উপর ভিত্তি করে যখন কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন তাকে আত্মবাদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমন কোন একটি প্রতিষ্ঠানে আমার নিকট আত্মীয় বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান এমন পণ্য উৎপাদন করে যা আমার প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে। বিকল্প আরো ভাল প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়নি। কারণ আমি আমার আত্মীয়ের সফলতা ও মঙ্গল কামনা করি। আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করার কারণে আমার প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে যা আত্মবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে বহুলভাবে পরিচিত।

৩.৫.২.৪.২ সম্ভাব্য এবং প্রকৃত স্বার্থের দ্বন্দ্ব: সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব তখনই সংঘটিত হয় যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার জন্য গৃহীত কোন সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং যদিও নিয়োগকর্তা উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য তিনি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করেননি। অন্যদিকে, প্রকৃত স্বার্থের দ্বন্দ্ব তখনই দেখা দেয় যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার জন্য গৃহীত কোন সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উক্ত কাজটি সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব নির্মাণ প্রতিষ্ঠান যদি নিয়োগকর্তার নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য দরপত্রে অংশগ্রহণ করে এবং দরপত্র যাচাই-বাছাইয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোন ভূমিকা থাকে না। তথাপিও এরূপ ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তাই সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব বলে বিবেচিত। অন্যদিকে, দরপত্র যাচাই-বাছাইয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী

যখন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তখন এরূপ ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তাই প্রকৃত স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

প্রতিষ্ঠান সাধারণত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করে যেন তারা তাদের মেধা ও শ্রমকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে। তাই চাকুরি গ্রহণের পর থেকেই কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে যে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজটি স্বীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হবে না বরং তাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তারা নিয়োগপ্রাপ্ত। যদি প্রতিষ্ঠানের কোন কাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বার্থের কারণে বিঘ্নিত হয় তাহলে তা হবে প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীর চুক্তির বরখেলাপ এবং অনৈতিক। উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অনৈতিক বলা যেতে পারে। কারণ যদি স্বার্থের দ্বন্দ্বকে বৈধতা দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে নিয়োগকর্তার স্বার্থের পরিবর্তে কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এভাবে প্রতিষ্ঠান অনেক ধরনের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কার মধ্যে পড়তে পারে যা কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি নিয়োগকর্তার বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিতে পারে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোন ধরনের স্বার্থ নিয়োগকর্তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিষয়টি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন অবস্থানে এবং কোন ধরনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটির দিকেও।[৬৪] এই ধরনের সমস্যা পরিহার করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মপন্থা এবং কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়।

কেউ কেউ মনে করেন দৃশ্যমান স্বার্থের দ্বন্দ্বকে মেনে নেয়ার পরিনাম শুভ নাও হতে পারে। দৃশ্যমান স্বার্থের দ্বন্দ্ব এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রকৃত কোন স্বার্থের দ্বন্দ্ব না থাকা সত্ত্বেও সমাজের সদস্যগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে যে, এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আয়ান আব্দুল্লাহ নামক একজন ব্যক্তির একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠান যেসব কাজ সম্পন্ন করে তা আয়ান আব্দুল্লাহর নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানও করতে চায় ও আয়ান আব্দুল্লাহর প্রতিষ্ঠানও উক্ত কাজের দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। ধরা যাক, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বাছাই বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আয়ান আব্দুল্লাহর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই। দৈবক্রমে নিয়োগকর্তা আয়ান আব্দুল্লাহর প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করেছে যা অন্যান্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিলক্ষিত হয়েছে। এরূপক্ষেত্রে অন্যান্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দাবি করতে পারে যে, আয়ান আব্দুল্লাহ অনৈতিকভাবে অথবা অন্যায্যভাবে তার প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করার জন্য নিয়োগকর্তাকে প্রভাবিত করেছে এবং তারা এটাও ভাবতে পারে যে, আয়ান আব্দুল্লাহর স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য নিয়োগকর্তা তার (আয়ান আব্দুল্লাহ) নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করেছে ও উক্ত

নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ ও অন্যায়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে দৃশ্যমান স্বার্থের দ্বন্দ্ব মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই কারণে দাবি উত্থাপিত হচ্ছে যে, দৃশ্যমান স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অনুমোদন দেয়া যথার্থ নয়। তাই এইরূপ পরিস্থিতি থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেকে তিনটি উপায়ে মুক্ত রাখতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি উক্ত তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকলে স্বার্থের দ্বন্দ্বও বিরাজমান থাকবে। যেমন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী (ক) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুনির্দিষ্ট একটি কাজে নিয়োজিত থাকে; (খ) ঐ কাজের ফলাফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বার্থ থাকে এবং (গ) ঐ স্বার্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই তিনটি উপাদানের অনুপস্থিতির মাধ্যমেই কেবল স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়টি পরিহার করা যেতে পারে। অধিকন্তু যখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন এই তিনটি উপাদান দূর করার মাধ্যমে স্বার্থের দ্বন্দ্বও নিরসন করা যাবে। ধরা যাক, 'ক' একটি বৃহৎ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 'রহিম' নামক একজন ব্যক্তির 'খ' নামক একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পাওয়ার জন্য 'খ' নামক একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি দরপত্র জমা দিয়েছে। কোন্ প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পাবে তা নির্বাচন করার দায়িত্বে 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের মালিকের সাথে 'খ' নামক প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী 'রহিমে'র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই স্বার্থের দ্বন্দ্বকেও বিভিন্নভাবে পরিহার করা যেতে পারে যার মধ্যে তিনটি উপায় উল্লেখযোগ্য– (অ) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে বাছাইয়ের দায়িত্ব থেকে নিজেকে ('রহিম') প্রত্যাহার করা অথবা স্বীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে উক্ত দরপত্রে কার্যক্রমের অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখা; (আ) 'রহিম' কর্তৃক পরিচালিত 'খ' নামক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি অন্য কোন পক্ষের নিকট বিক্রি করে দেয়া বা মালিকানা সত্ত্ব ত্যাগ করা এবং (ই) চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রকার দায়বদ্ধতার সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকা। স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি অনেক উপাদান স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বাণিজ্যিক ঘুষ এমন একটি লেনদেন যা কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এইরূপ আশায় প্রদান করেন যেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী সুবিধামত সময়ে ঘুষ প্রদানকারী ব্যক্তিকে অন্যায্য সুবিধা প্রদান করে। ঘুষ প্রদানের মাধ্যম হতে পারে নগদ টাকা, হিরা ও স্বর্ণালঙ্কার, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, অগ্রাধিকারমূলক আচরণ বা অন্য যেকোন ধরনের সুবিধা প্রাপ্তি। এক কথায় একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও নৈতিক পন্থা এড়িয়ে যদি অন্য পন্থা অবলম্বন করে তাই অন্যায্য যা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত। যেমন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার লক্ষ্যে যখন কোন

ক্রয় প্রতিনিধিকে কোন অর্থ বা অন্যকোন মূল্যবান সামগ্রী বা অন্য কোন সুবিধা প্রদান করে তাই বাণিজ্যিক ঘুষ নামে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায় যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কোন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের কোন সুবিধা অন্যায্যভাবে প্রদানের জন্য তার নিকট থেকে অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করে তখন ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীর আচরণটি বাণিজ্যিক চাঁদাবাজি হিসেবে পরিগণিত হবে। সুতরাং বাণিজ্যিক ঘুষ ও চাঁদাবাজি অবশ্যম্ভাবীভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যা একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নৈতিকভাবে দায়িত্ব পালনকে নিরুৎসাহিত করে। অন্যদিকে উপঢৌকন নৈতিক হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন উপরে উল্লিখিত ক্রয় প্রতিনিধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যখন ক্রয় প্রতিনিধি তার কোনরূপ স্বার্থ ছাড়াই কিংবা ব্যবসায় করার কোন শর্ত ছাড়াই বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেন তখন ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত উপঢৌকন কখনও অনৈতিক হতে পারে না। আবার যখন কোন প্রতিনিধি অন্য কোন প্রতিনিধি থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করার বিনিময়ে ঐ প্রতিনিধিকে কোনরূপ অন্যায্য সুবিধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন কিংবা অন্য যেসব প্রতিনিধি উপঢৌকন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের জন্য ক্ষতিকর কিছু না করেন প্রকৃতপক্ষে তখন কোন স্বাথের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। আমেরিকার স্যান জোস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ. শ এবং বেকারসফিল্ড কলেজের দর্শনের এমেরিটাস অধ্যাপক ভিনসেন্ট ব্যরি উপঢৌকন গ্রহণে মানদণ্ড নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের প্রণীত *Moral Issues in Business* গ্রন্থে উপঢৌকনের নৈতিকতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় উপাদান বিবেচনা করার পরামর্শ দেন যার মধ্যে অন্যতম হলো: (I) উপঢৌকনের মূল্য কত? উপঢৌকনের মূল্য কী নামমাত্র (Nominal) নাকি উল্লেখযোগ্যমানের (Substantial)? এটা কী বস্তুনিষ্ঠভাবে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে যথেষ্ট? (II) উপঢৌকনের উদ্দেশ্য কী? এটা কী ঘুষ হিসেবে গৃহীত হয়েছে? (III) কোন পরিস্থিতিতে উপঢৌকন দেয়া বা গৃহীত হয়েছে? এটা কী প্রকাশ্যে দেয়া হয়েছে? এটা কী কোন অনুষ্ঠান (ঈদ, বড়দিন, পূজা) উপলক্ষ্যে প্রদান করা হয়েছে? (IV) উপঢৌকন গ্রহণকারীর অবস্থান কী? উপঢৌকন গ্রহণকারী কী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে? (V) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের ব্যবসায়িক আচরণ চলমান? উপঢৌকন সংক্রান্ত বিষয়টি কি ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কোন বিষয়? (VI) উপঢৌকন সংক্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীতি কী? ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপঢৌকন গ্রহণ কি নিষিদ্ধ? এবং (VII) আইন কী? উপঢৌকন কী রাষ্ট্র বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকারের আইন দ্বারা অবৈধ ঘোষিত?[৬৫] এইসব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে উপঢৌকনের যর্থাথতা বিবেচিত হতে পারে।

৩.৫.২.৫ চুরি এবং কম্পিউটার: প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠানের সাথে শ্রমের বিনিময়ে সুনির্দষ্টি কিছু সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বা স্বার্থে সর্বোত্তম ব্যবহারে সে চুক্তিবদ্ধ। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী চুক্তি বহির্ভূত অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে তাহলে তা এক ধরনের চুরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত উপাদানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই তুচ্ছ। যেমন ছোট যন্ত্রপাতি চুরি, অফিস সরাঞ্জামাদি অথবা বস্ত্র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা যা 'White-collar crime' হিসেবে বিবেচিত হয় যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ 'White-collar crime' হচ্ছে তহবিল তছরুপ বা আত্মসাৎ বা চুরি। ট্রাস্টি পরিচালনায় প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ, জালিয়াতি প্রভৃতি যা ব্যবস্থপনাগত চুরির অন্যান্য রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কী? প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রোগ্রাম নকল করা? প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত তথ্য ব্যবহার কিংবা নকল করা? নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ব্যবহার? যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি না থাকে তাহলে প্রতিটি কর্মই চুরি হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ প্রতিটি কাজেই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহারের বিষয়টি সম্পৃক্ত যার মালিক অন্য কোন ব্যক্তি এবং তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত ঐ সম্পত্তি ব্যবহার চুরির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। তথ্য ভাণ্ডারে রক্ষিত তথ্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রোগ্রাম অবশ্যই স্পর্শনীয় (Tangible) সম্পত্তি নয়। সুতরাং কম্পিউটার তথ্য বা প্রোগ্রামের পরীক্ষা, ব্যবহার, নকল, কম্পিউটার ব্যাংকে তথ্য ধারন, কম্পিউটার প্রোগ্রামের মানোন্নয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি চুরিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ এগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। সম্পত্তির প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের চুরিকে ভালোভাবে বুঝা সম্ভব হবে। সম্পত্তিকে একগুচ্ছ অধিকারের সমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এই অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, এই সম্পদ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ অধিকার। অর্থাৎ অন্যরা এই সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, বিক্রি করার অধিকার, ব্যবসায় করার অধিকার, সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জনের অধিকার, সম্পদ পরিবর্তন করার অধিকার প্রভৃতি। এই ধরনের অধিকার কম্পিউটার, কম্পিউটার ডাটা, কম্পিউটারের প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে যা প্রতিষ্ঠান তার স্বীয় উন্নয়নে ব্যবহার করে থাকে। ফলে এই তথ্য এবং প্রোগ্রাম হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি যা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানই ব্যবহারের অধিকার রাখে।[৬৬] সুতরাং সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ধরনের অধিকার যদি কেউ খর্ব করে তাহলে তা হবে চুরি এবং অনৈতিক। অনৈতিক কাজে

অংশ গ্রহণ নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর যা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়োগকর্তা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত না হলেও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তা লক্ষণীয়। বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে ঘুষ গ্রহণ বা সহয়তা কিংবা চাঁদাবাজি কিংবা উপঢৌকন গ্রহণ কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ তথ্য পাচার করে দেয়ার ঘটনা ইতোপূর্বেই আমরা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি। বলা বাহুল্য স্বর্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীও নিয়োগকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। চুক্তিভিত্তিক শর্ত পূরণ করা কর্মচারীদের দায়িত্ব। যেমন কোম্পানির উদ্দেশ্য, নিয়মনীতি, কর্মপরিকল্পনা মেনে চলা, কোম্পানির লক্ষ্য পূরণে ও কর্মক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতার পরিচয় দেয়া এবং সৃজনশীল উপায়ে কাজ করা। চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব ছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীর আরো কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যেমন নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা, অনুপস্থিতি পরিহার করা, কর্মক্ষেত্রে নৈতিক ও আইনগত দায়বদ্ধতা বজায় রাখা এবং নিয়োগকর্তার যৌক্তিক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি। তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে নিয়োগকর্তা কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী — কার স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছে অথবা পূরণ হয়েছে। ধরা যাক, একজন কর্মচারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বেশি বেতন লাভের আশায় প্রতিযোগী অন্য একটি কোম্পানিতে যোগদান করেছেন। এমতাবস্থায় পূর্বের কোম্পানির মালিক দাবি করতে পারেন যে ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারী অভ্যন্তরীণ গোপনীয় তথ্য অন্য কোম্পানির নিকট পাচার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে এটি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে তাদের মধ্যে কার স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছে অথবা কার স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। অনেক আদালত এমন জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযোগী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি 'ভারসাম্য নমুনা'র সাহায্য নিয়ে থাকে।[৬৭] সুতরাং স্বার্থের দ্বন্দ্ব একটি জটিল ও বহুমাত্রিক ধারণা। কারণ স্বার্থ নিয়ে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে বিভেদ রয়েছে। তাছাড়া সকল নিয়োগকর্তা অথবা উদ্যোক্তারাও তাঁদের স্বার্থের প্রকৃতি নিয়ে একমত পোষণ করেন না। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানকে টেকসই করতে হলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আত্মস্বার্থবাদ পরিণতিতে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না বরং পারস্পরিক সহযোগিতাই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায় যে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে নৈতিক ও যৌক্তিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি ফার্ম বা কর্পোরেশন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের

মৌলিক কার্যক্রম হলো অর্থনীতিকেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মচারীরা শ্রম বিনিয়োগ করে এবং নিয়োগকর্তাও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতিতে সহায়তা করে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে। বর্তমানে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার সম্পর্ক সামাজিক, নৈতিক, আইনগত, জননীতি প্রভৃতির দিক বিবেচনা করে গড়ে ওঠে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় কর্মচারীরা হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ কর্মচারীরা হলো বাজার অংশিজন যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বাজার অংশিজন ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা ক্রিয়াশীল করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ পণ্য উৎপাদান, সেবা সরবরাহ, বাজারের ক্রেতা, প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণভাবে সচল রাখা ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিভাবে জড়িত। আবার, অন্যদিকে কর্মচারীরাও তাদের নিয়োগকর্তার উপর নির্ভরশীল। কর্মচারীর জীবন-জীবিকা, বিনোদন, স্বাস্থ্য সেবা, অবসর ভাতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি সব কিছুর জন্য একান্তভাবেই নিয়োগকর্তার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নিয়োগকর্তাগণও কর্মচারীর গোপনীয়তা রক্ষা, অবাধে কথা বলার স্বাধীনতা, কর্মস্থলের বাহিরে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধা প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। অন্যদিকে, কর্মচারীরাও কর্মস্থলে নেশা জাতীয় বিভিন্ন মাদক থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত। অর্থাৎ নেশার কারণে যেন কর্মপরিবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। তাই সৎ, ন্যায্য ও বৈষম্যহীন প্রক্রিয়ায় ক্রেতা ও সহকর্মীদের সঙ্গে কর্মচারীদের লেনদেন করা উচিত। এছাড়াও কর্মচারীদের উচিত প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য বাহিরে প্রকাশ করা থেক বিরত থাকা যদি না সেটি জনস্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বা হুমকিস্বরূপ না হয় যা পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। তাই কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার সম্পর্কের দিক থেকে বলা যায় কর্মচারীর জন্য যেটি অধিকার সেটি পূরণ করা নিয়োগকর্তার কর্তব্যের অংশ এবং বিপরীতভাবে নিয়োগকর্তার জন্য যেটি অধিকার হিসেবে বিবেচিত সেটি পূরণ করা কর্মচারীর কর্তব্যের অংশ যা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কের দিকটিকে নির্দেশ করছে যা এককভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন। ফলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কের বিষয়টি যৌক্তিক ও নৈতিক সম্পন্ন হলে তা থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রত্যেকেরই উপকৃত হবার সুযোগ রয়েছে এবং প্রত্যেকে তার কাঙ্খিত সুবিধা লাভে সক্ষম হলে ব্যবসায় টেকসই হবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্যই লাভজনক হবে যাকে আমরা Win-win অবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

---

১. Weiss, J. W. (2014), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*, 6th ed., San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., P. 445.

২. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ (২০০২), *পরিবেশ ও নৈতিকতা*, কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, পৃ.২১।

৩. Duska, R. (1999), "Employee Rights" in Robert E. F. (ed.), *A Companion to Business Ethics*, Malden, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc., p. 257.

৪. *Ibid.*

৫. চাকমা, নীরু কুমার (২০১২), ''মানবাধিকার ও নৈতিকতা'', *বিশ্ব দর্শন দিবস* ২০১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ২০।

৬. *Ibid.*

৭. Desjardins, J. (2011), *An Introduction to Business Ethics*, 4th ed., New York: McGraw-Hill, p. 124.

৮. *Ibid.*

৯. *Ibid.*

১০. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 76.

১১. *Ibid.*

১২. Duska, R., op. cit., p. 259.

১৩. Velasquez, M. G., op. cit., p. 76.

১৪. *Ibid.*

১৫. Weiss, J. W., op. cit., p. 442.

১৬. Duska, R., op. cit., p. 261.

১৭. *Ibid.*, pp. 261-62.

১৮. *Ibid.*, p. 262.

১৯. *Ibid.*

২০. Weiss, J. W. (2003), *Business Ethics; A Stakeholder and Issues Management Approach*, 3rd ed., UK: Thomson South-Western, P. 215.

২১. *Ibid.*

২২. *Ibid.*

২৩. *Ibid.*, p. 217.

২৪. Rowan, J. R. (2000), "The Moral Foundation of Employee Rights", in *Journal of Business Ethics*, Vol. 24, No. 4, p. 355.

২৫. *Ibid.*

২৬. Weiss, J. W., op. cit., p. 218.

২৭. Duska, R., op. cit., p. 264.

২৮. *Ibid.*, p. 263.

২৯. *Ibid.*, p. 267.

৩০. Velasquez, M. G., op. cit., p. 361.

৩১. *Ibid.*, p. 363.

৩২. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৮০।

৩৩. Duska, R., op. cit., p. 264.

৩৪. Weiss, J. W., op. cit., p. 229.

৩৫. *Ibid.*, p. 221.

৩৬. Velasquez, M. G., op. cit., p. 363.

৩৭. Quinnell, K., (2017), "150 Workers Die Each Day From Hazardous Work Conditions: The Working People Weekly List" in American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)

৩৮. Weiss, J. W., op. cit., p. 229.

৩৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এর সংশোধিত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ২১ অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ১৩১৩৭।

৪০. Weiss, J. W., op. cit., p. 224.

৪১. পারভীন, ফারহানা (২০১৬), "বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে?", *BBC News*, বাংলা, মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টম্বর।

৪২. Desjardins, J., op. cit., p. 141.

৪৩. Weiss, J. W., op. cit., p. 225.

৪৪. *Ibid.*, p. 226.

৪৫. *Ibid.*, p. 226.

৪৬. *Ibid.*, pp. 226-27.

৪৭. "নেপালে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উড়োজাহাজ" (২০১৮), *দৈনিক প্রথম আলো*, মঙ্গলবার, ১৩ মার্চ, পৃ. ১।

৪৮. "৮৩% নারী শ্রমিক যৌন হয়রানির শিকার" (২০১৮), *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, মঙ্গলবার, ২৮ আগস্ট, পৃ. ১।

৪৯. Weiss, Joseph W., op. cit., p. 228.

৫০. Lawrence, A. T. and Weber, J. (2014), *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*, 14th ed., Irwin: McGraw –Hill, p.358.

৫১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১২০।

৫২. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন),-এর সংশোধিত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ২১ অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ১৩১৩২।

৫৩. *Ibid.*, p. 13135.

৫৪. Weiss, Joseph W., op. cit., p. 230.

৫৫. *Ibid.*

৫৬. *Ibid.*, p. 231.

৫৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-১) ভাতা-১৬/৯৫-১৭৬, ১২.০৭.২০৯৯।

৫৮. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৮৫।

৫৯. "জরিমানার বিধানসহ গণমাধ্যম কর্মী আইন অনুমোদিত" (২০১৮), *দৈনিক জনকণ্ঠ*, মঙ্গলবার, ১৬ অক্টোবর, পৃ. ১।

৬০. Velasquez, M. G., op. cit., p. 353.

৬১. *Ibid.*, pp. 357-358.

৬২. *Ibid.*, pp. 359-361.

৬৩. *Ibid.*, pp. 353-354.

৬৪. *Ibid.*, p. 354.

৬৫. Shaw, W. H., and Barry, V. (2014), *Moral Issues in Business*, 13th ed., Canada: Cengage Learning, pp. 508-09.

৬৬. Velasquez, M. G., op. cit., pp. 356-357.

৬৭. Weiss, Joseph W., op. cit., pp. 222-223.

চতুর্থ অধ্যায়

হুইসল্ ব্লোয়িং: পেশাগত দায়িত্ব ও অধিকার

৪.১ ভূমিকা: বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও পেশাজীবীদের মধ্যে যে সকল প্রত্যয় বা ধারণা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হুইসল্ ব্লোয়িং। হুইসল্ ব্লোয়িং বিষয়টি প্রকৃতিগত কারণে একাডেমিক আলোচনার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনায়ও স্থান করে নিয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, পেশাজীবী অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্নভাবে দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্তব্যপরায়ণতার দায়িত্ব (Duty of obedience), বিশ্বস্ততার দায়িত্ব (Duty of confidentiality), আনুগত্যের দায়িত্ব (Duty of loyalty) ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ দায়বদ্ধতা সম্প্রতি বিভিন্নভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হচ্ছে। কারণ একজন পেশাজীবীকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক, নৈতিক, জাতীয় ইত্যাদি দায়িত্বও পালন করতে হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পেশাজীবী অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রায়ই নৈতিক উভয়সংকটের মুখোমুখি হন। এইরূপ দায়বদ্ধতার অর্থ এমন নয় যে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ভুল, অবৈধ কর্মকাণ্ড, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংঘটিত হতে দেখেও নীরব থাকবেন। কারণ একজন পেশাজীবীর নানাবিধ দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হলো জনগণের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সম্পদের সুরক্ষা দেয়া। একদিকে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং অন্যদিকে তৃতীয় পক্ষ বা জনগণের স্বার্থ বা জনস্বার্থ। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ প্রাধান্য দিতে গিয়ে যেমন জনগণের ক্ষতি সাধন করা যাবে না তেমনি জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলে গেলেও চলবে না। এইভাবে একজন পেশাজীবী নৈতিক উভয়সংকটের মুখোমুখি হন। এইরূপ নৈতিক উভয়সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকেই হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সূত্রপাত ঘটে।

৪.২ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি: 'হুইসল্ ব্লোয়িং' ('Whistle blowing') ধারণাটি পুরানো হলেও লন্ডনের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস এণ্ড অরগানাইজেশনাল বিহেভিয়ার (Human Resources and Organisational Behaviour) বিভাগের অধ্যাপক ভিম ভেন্ডেকারচেকোভ এবং লন্ডনের মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড লুইস তাঁদের "The Content of Whistleblowing Procedures: A Crtical Review of Recent Official Guidelines" প্রবন্ধে দাবি করেন যে, উক্ত ধারণাটি আশির দশকে একাডেমিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১] 'হুইসল্ ব্লোয়িং' শব্দটি ক্রীড়াসংক্রান্ত আলোচনা থেকে গ্রহণ করা

হয়েছে। কোন খেলায় যখন খেলোয়াড় অসদাচরণ করেন তখন রেফারি বা আম্পায়ার খেলা বন্ধের জন্য বাঁশি বাজান এবং ঐ খেলোয়াড়ের শাস্তি ধার্য্য করেন। একইভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িং করার মাধ্যমে তাঁর নিয়োগকর্তার জালিয়াতি, অর্থ অপচয় ও অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিহত বা প্রতিরোধ করেন এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা আদালতের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিচারের আওতায় এনে জনকল্যাণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। এ দিক বিবেচনা করে আমেরিকার অহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডেভিড স্টুয়ার্ট তাঁর *Business Ethics* গ্রন্থে অনৈতিক তথ্য প্রকাশের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন, "When an employee publicly exposes an employer's misconduct, that act is called "whistle blowing"."[২] ডেভিড স্টুয়ার্টের বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানের অসদচারণের ব্যাপারে নৈতিক উদ্বেগের কথা জানান। ফলে 'হুইসল্ ব্লোয়িং' শব্দটি অনেক ধরনের কর্মকাণ্ডকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব কর্মকাণ্ড একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। কখনো কখনো কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নির্বাহীদের নিকট 'হুইসল্ ব্লোয়িং' বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মধ্যে থাকতে পারে কোন সহকর্মী অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অসদাচরণ, কিংবা কোন উর্ধ্বতনের অর্থ জালিয়াতি, ছোট কিংবা বড় ধরনের চুরি সংক্রান্ত তথ্যাদি।[৩] ম্যানুয়াল জি ভেলাসকোয়াজ তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে হুইসল্ ব্লোয়িং সম্পর্কে বলেন, "Whistleblowing is an attempt by a member of an organization to disclose wrongdoing in or by the organization."[৪] অর্থাৎ কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সদস্য বা সাবেক সদস্য যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশ করেন তখন তাকে হুইসল্ ব্লোয়িং বলে। ম্যানুয়াল জি ভেলাসকোয়েস মতোই একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আমেরিকার প্রখ্যাত ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক জেমস সি পিটারসেন এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড্যান ফেরেল তাঁদের *Whistleblowing Ethical and Legal Issues in Expressing Dissent* গ্রন্থে হুইসল্ ব্লোয়িং সম্পর্কে বলেন, "Whistleblowing is a special form of dissent in which a member or former member of an organization or outside the organization or outside normal organizational chennels to reveal organizational wrongdoing, illegality, or actions that threaten the public."[৫] তাঁরা উভয়ই মনে করেন যে, জনস্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ কোন তথ্য বর্তমান বা সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশই হলো হুইসল্ ব্লোয়িং। যেমন ধরা যাক্, 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের সহকারী ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের অর্থ তছরুপ করেছেন এবং এটি 'খ' নামক একজন

কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে। দৃষ্টিগ্রাহ্যকৃত বিষয়টি যখন 'খ' নামক একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে অভিহিত করবেন তখনই এটি হুইসল্ ব্লোয়িং বলে বিবেচিত হয়। ফলে এখানে অর্থ তছরুপ হচ্ছে জনস্বার্থ পরিপন্থী একটি কাজ।

হুইসল্ ব্লোয়িং শব্দটি পরবর্তীতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের অব্যবস্থাপনা কিংবা দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়গুলো জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি এখন বেসরকারি কর্মক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমেরিকার সান জোস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের Organization and Management বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক অ্যান টি. লরেন্স এবং আমেরিকার ডিক্যান্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় নীতিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জেমস ওয়েভার তাঁদের *Business and Society: Stackeholders, Ethics, Public Policy* গ্রন্থে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

> "... there may be situations in which society's interests override those of the company, so an employee may feel an obligation to speak out. When an employee believes his or her employer has done something that is wrongful or harmfull to the public, and he or she reports alleged organizational misconduct to the media, government, or high-level company officially whistle-blowing has occured."[৬]

অ্যান টি. লরেন্স এবং জেমস ওয়েভারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন তার নিয়োগকর্তাকে সমাজের স্বার্থ বিরোধী কোন অন্যায়, ক্ষতিকর কাজ করতে দেখেন তখন তার নিয়োগকর্তার অসদাচরণ কোন মিডিয়া, সরকারি বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করলে তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের প্রকাশ ঘটে থাকে। একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা কর্মীর মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই নয় বরং এটিকে জনসম্মুখে প্রকাশ করাই কেবল হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণত কোন কর্তৃপক্ষ তার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা কর্মীকে কোন ধরনের অনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করুক কিংবা না করুক তারা তাদের নিয়োগকর্তার অনৈতিক তথ্য কিংবা অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রায়শই ওয়াকিবহাল থাকে। এক্ষেত্রে যখন কোন নিয়োগকর্তা তার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা এজেন্টকে অনৈতিক বা অবৈধ কর্মকাণ্ড করতে নির্দেশ প্রদান করে অথবা কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে তখন তার করণীয় কী? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি তা নিজের কাছেই গোপন রাখবেন, না কি তা জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন? যদি জনসমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে

তিনি তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকাশ করেন তখনই কেবল এটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য হবে।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়িং হচ্ছে কোন সংস্থার অবৈধ এবং অনৈতিক আচরণ সম্পর্কে ঐ সংস্থার বর্তমান কিংবা সাবেক সদস্য কর্তৃক নৈতিক প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ চ্যানেলের বাহিরে জনসম্মুখে নিয়ে আসা। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কিংবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংগঠিত অন্যায় কাজ সম্বন্ধে ঐ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তথ্য প্রকাশের প্রচেষ্টাকে হুইসল্ ব্লোয়িং বলে।

প্রাসঙ্গিক উদাহরণঃ[৭] Bay Area Rapid Transit (BART) বার্ট হলো সানফ্রান্সিসকো ভিত্তিক আধুনিক রেল নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালে রেল লাইন নির্মাণের সময়কালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তিনজন প্রকৌশলী নির্মাণ পদ্ধতির ক্রটির জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। হোলজার জর্টসব্যাঙ্গ ওয়েস্টিংহাউস কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত স্বয়ংক্রিয় রেল নিয়ন্ত্রণ (Automatic Train Control - ATC) পদ্ধতিতে কিছু ক্রটির কথা প্রতিবেদন আকারে দাখিল করেন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অপর প্রকৌশলী রবার্ট ব্রুডার ওয়েস্টিংহাউস কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির পরীক্ষা না করার ব্যাপারে অবগত হলেন। আরও কিছু সময় পর জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রামার ম্যাক্স ব্লানকেনজির সাথে হোলজার জর্টসব্যাঙ্গ তার উদ্বেগের বিষয়টি প্রকাশ করলেন। তাঁরা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উদ্বেগ লিখিত প্রতিবেদন আকারে দাখিল করার পরও কোনোরূপ সাড়া পেলেন না। তখন তিনজন প্রকৌশলী বার্টের পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর প্রকৌশলীবৃন্দ কিছু গোপনীয় তথ্য বিনিময় করলেন এবং তাদের পক্ষে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন পরামর্শকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ প্রকৌশলীবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের বাহিরের এডওয়ার্ড বারফাইন নামের একজন প্রকৌশলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং এডওয়ার্ড বারফাইন নিজেই এটিসি (Automatic Train Control) কে মূল্যায়ন করে তিনজন প্রকৌশলীর অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ড্যানিয়েল হেলেক্স তিনজন প্রকৌশলীর বক্তব্য শুনেন। ড্যানিয়েল হেলেক্স তিনজন প্রকৌশলী থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য উপাত্ত পরিচালনা বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন এবং কন্ট্রা কোস্টা টাইমস (Contra Costa Times) নামক একটি স্থানীয় পত্রিকায় উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ অস্বস্তিতে পড়েন এবং তিনজন প্রকৌশলীকে নিয়ে নানারকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেন। পরবর্তীতে তিনজন প্রকৌশলীকে ১৯৭২ সালের মার্চের ২ এবং ৩ তারিখে পদত্যাগ করবে না চাকরিচ্যুত হবে তা পছন্দ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু বার্ট কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় অর্থাৎ তাঁরা পদত্যাগ না করায় বার্ট কর্তৃপক্ষ

তাঁদেরকে চাকরিচ্যুত করেন। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে যখন ট্রেনের কার্যক্রম ওয়েস্টিংহাউজ এর অধীনে চলে আসে তখন স্বয়ংক্রিয় ট্রেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টার্মিনালে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয় এবং পাঁচ জন ব্যক্তি আহত হয়। তারা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে পঁচিশ হাজার (২৫০০০/=) ডলার করে ক্ষতিপূরণ জিতে নেন। পরবর্তীতে তাদের সন্তোষজনক চাকরি খুঁজে পেতে আট থেকে বারো মাস সময় লেগে যায়। অর্থনৈতিক চাপের পাশাপাশি অনেক দিন পর্যন্ত মানসিক চাপেও ছিলেন।

৪.৩ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বৈশিষ্ট্য: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা নিম্নরূপ:[৮]

হুইসল্ ব্লোয়িং হচ্ছে এমন একটা বিষয় যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন সাক্ষী যদি অপরাধের ব্যাপারে পুলিশকে অবহিত করে কিংবা আদালতে সাক্ষ্য দেয় এবং কোন সংবাদ প্রতিবেদক যদি তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ করে তবে তা হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী নন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীদের জন্য অবস্থাটা একটু ভিন্নতর। কারণ তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক আচরণ অথবা অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন এবং তারা তাদের নিয়োগকর্তার নিকটও দায়বদ্ধ। ফলে তথ্য প্রকাশ করলে তা হবে এই দায়বদ্ধতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং হুইসল্ ব্লোয়িং হচ্ছে এমন একটি কাজ যা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা সংঘটিত হয়।

হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনসব তথ্য প্রকাশ করা হয় যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা জনসাধারণের নিকট পূর্বে উন্মোচিত হয়নি এবং এক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লোয়ারদের উদ্দেশ্য থাকে অন্যদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে উক্ত অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা ও সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ থেকে বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়ারদের ধারণা হলো তাদের দেয়া তথ্য এমন অনেককেই সচেতন করে যারা ঐ তথ্য সম্পর্কে অবগত নয় অথবা তথ্য গোপন থাকার কারণে ঐ তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন নয়।

হুইসল্ ব্লোয়িং কোন প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আচরণের তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। হুইসল্ ব্লোয়িং সাধারণত অনৈতিক, অবৈধ, অযথার্থ, অপ্রথাগত ও আইন লঙ্ঘনের ঘটনাকে প্রকাশ করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশের জন্য ক্ষতির বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশে প্রতিটি শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষকে ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি কারখানার মালিকই তাদের প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করলেও তারা

অধিকাংশ সময়ই তা বন্ধ রেখে দূষিত বর্জ্য অপসারণ করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এ ধরনের তথ্য সম্পর্কে সাধারণত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবগত। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রকাশ করে দেন তখন সেটি হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের তথ্য জনসাধারণকে সচেতন করে তুলে এবং সম্ভাব্য নতুন আইন বা বিধি প্রণয়নে বাধ্য করে সমাধান খোজার চেষ্টা করা হয়।

হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয় প্রথাগত যোগাযোগ মাধ্যম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাহিরে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবীদের নির্দেশনা দেয়া হয় যে যখন তিনি কোন অনৈতিক কিংবা অবৈধ কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন তা যেন তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অভিহিত করেন অথবা তারা যেন তাদের উদ্বেগ নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করেন। কিছু প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত নীতি হলো যখনই কোন অন্যায্য আচরণ দেখা যাবে তা যেন লিখিত আকারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয় এবং তা গোপন রাখা হয়। যিনি পেশাজীবীদের এই অভিযোগগুলো সুরাহা করেন এরূপ পদস্থ কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলা হয়। হুইসল্ ব্লোয়িং প্রাথমিক ধাপেই জনগণের কাছে তথ্য প্রকাশকে অনুমোদন করে না এবং প্রতিষ্ঠানের বাহিরে তথ্যপ্রকাশকে স্বীকৃতি দেয় না। হুইসল্ ব্লোয়িং অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক উভয় প্রকারের হতে পারে। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ক্ষেত্রেই তথ্য এমন পন্থায় প্রকাশ করতে হবে যাতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন অনেকটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য শুধুমাত্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা তৃতীয় পক্ষের কাছে সরবরাহ করলেই তা হুইসল্ ব্লোয়িং হবে না, উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে। যেমন কোন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি তাঁর মালিকের দেউলিয়া সংক্রান্ত তথ্য ঋণ প্রদানকারী কোন সংস্থার নিকট প্রচার করেন তাহলে তা হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের আওতায় পড়বে না বরং এটা হবে এক ধরনের গোয়েন্দাগিরি। কারণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই অন্যায় প্রতিরোধের কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয় অথবা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাও নয়।

হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করতে হবে স্বেচ্ছায় বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। আইনগতভাবে বাধ্য হয়ে তথ্য প্রকাশ করাকে হুইসল্ ব্লোয়িং বলে না। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের অপরাধ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নির্দিষ্ট অনিয়ম বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তিনি যদি সংঘটিত অপরাধের বিবরণ প্রদান করেন তবে তা হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত না হয়ে এটি হবে এক ধরনের সাক্ষ্য যা আইনগতভাবে বাধ্য হয়ে সম্পাদন করতে হয়েছে। কিন্তু কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি নিজ উদ্যোগে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য জনস্বার্থে প্রদান করেন তবে তা হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ এখানে

কর্মকর্তা-কর্মচারী জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে তথ্য প্রকাশ করেছেন যা করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না।

হুইসল্ ব্লোয়িং এক ধরনের নৈতিক প্রতিবাদ। অন্যভাবে বলতে গেলে, নৈতিক প্রতিবাদ হলো অনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যেমন বার্টের তিন জন প্রকৌশলী ক্রমাগতভাবে তাঁদের অভিযোগ দাখিল করেই গেছেন যেটি নৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে বিবেচিত। কারণ হুইসল্ ব্লোয়িং করা হয় কিছু কাঙ্খিত পরিবর্তনকে সামনে রেখে। এখানে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা কিংবা স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় বিদ্যমান থাকবে না।

হুইসল্ ব্লোয়িং এবং অভিযোগ প্রদান একই বিষয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীরা সাধারণত ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু হুইসল্ ব্লোয়ারকারীগণ জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিষয় প্রকাশ করে থাকেন। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি নিজের বেতন ভাতা সংক্রান্ত কোন সমস্যা প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অভিহিত করেন তাহলে এটি হবে অভিযোগ। অন্যদিকে, একই কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত কোন জালিয়াতি বা অর্থ তছরুপ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন যা উক্ত প্রতিষ্ঠান বা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তখন তা হবে হুইসল্ ব্লোয়িং।

হুইসল্ ব্লোয়িং কোন অপরাধ কর্মের সাক্ষ্য প্রদান নয়। কোন তদন্ত প্রক্রিয়ায় আদালতে সাক্ষী দেয়াকে হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কারণ একজন হুইসল্ ব্লোয়ার একজন সাক্ষীর চেয়েও বেশি তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি কোন ব্যক্তির নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেন এবং তা যদি অন্যকোন ব্যক্তি অবলোকন করেন এবং পরবর্তীতে সাক্ষ্য প্রদান করেন তা হবে উক্ত ঘটনার একজন সাক্ষী। অন্যদিকে, ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি বিভিন্ন শর্তাবলী মেনে উক্ত ঘটনা প্রকাশ করেন তখন তা হবে হুইসল্ ব্লোয়িং। তাই হুইসল্ ব্লোয়িং করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত পূরণ করতে হয়। এইরূপ শর্তসমূহ হলো নৈতিক দায়বদ্ধতা, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, জনসাধারণের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়া, যথাযথ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করা, তথ্যের দালিলিক প্রমাণ সরবরাহ করা ইত্যাদি। কারণ উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী জানেন কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কী কারণে, কোন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ঐ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কাজটি করেছেন। পক্ষান্তরে, সাক্ষী উৎকোচের বিবরণ ব্যতীত অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

৪.৪ হুইসল্ ব্লোয়ারঃ হুইসল্ ব্লোয়ার (Whistle blower) বলতে এমন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝায় যিনি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত অবৈধ, অনুপযুক্ত, অনৈতিক বা অসামঞ্জস্য আচরণসমূহ

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। হুইসল্ ব্লোয়ার সম্পর্কে যোসেফ ডেসজার্ডিন্স তাঁর *An Introduction to Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, "A whistle-blower is an employee or other insider who informs the public or a government agency of an illegal, harmful, or unethical activity done by their business or firm."[৯] যোসেফ ডেসজাডিন্সের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কোন সরকারি বা বেসরকারি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোন ফার্মের মধ্যে যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী অর্থাৎ অবৈধ, ক্ষতিকর, অনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তা যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মী কর্তৃক তথ্যটি জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় তখন তথ্য উন্মোচনকারী ব্যক্তিকে হুইসল্ ব্লোয়ার বলে।

আমেরিকার বিখ্যাত টেক্সাস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডেবি এম থর্ণ ও অন্যান্যরা তাঁদের *Business and Society: A Strategic Approch to Social Responsibility* গ্রন্থে হুইসল্ ব্লোয়ার সম্পর্কে বলেন, "An employee who reports individual or company wrong-doing to either internal or external sources is considered a whistle-blower."[১০] অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অন্যায় বা অপকর্ম অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক উৎসসমূহের মাধ্যমে যে কর্মকর্তা-কর্মচারী উন্মোচন করেন তিনি-ই হুইসল্ ব্লোয়ার।

হুইসল্ ব্লোয়ার এমন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী যিনি জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় কর্মসমূহের তথ্য প্রকাশ করে থাকেন। তবে এটা মনে করার কারণ নেই যে, হুইসল্ ব্লোয়ারের সকল দাবিই সত্য এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সকল অভিযোগ মিথ্যা। অর্থাৎ অনেক সময় এমনও হয় যে, হুইসল্ ব্লোয়ার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার বা নিজেদের ক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে এরূপ অবস্থায় প্রয়োজন হুইসল্ ব্লোয়ার একটি সতর্ক ও যথার্থ সংজ্ঞা প্রণয়ন। হুইসল্ ব্লোয়ারের একটি যথার্থ ও সার্থক সংজ্ঞা প্রদান করেন নরম্যান ই বাউই এবং রোনাল্ড এফ ডুস্কা। তাঁদের মতে,

> "A whistle blower is an employee or officer of any institution, profit or non-profit, private or public, who believes either that he/she has been ordered to perform some act or he/she has obtained knowledge that the institution is engaged in activities which a) are believed to cause unnecessary harm to third parties, b) are in violation of human rights or c) run counter to the defined purpose of the institution and whom inform the public of this fact."[১১]

নরম্যান ই বাউই এবং রোনাল্ড এফ ডুস্কা কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনায় বলা যায় যে, কোন লাভজনক বা অলাভজনক, সরকারি বা বেসরকারি, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, যিনি কিছু কাজ

করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন অথবা তিনি জেনেছেন যে, প্রতিষ্ঠানটি এমন কাজে লিপ্ত যা ক) তৃতীয় পক্ষের জন্য ক্ষতিকর; খ) মানবাধিকারের জন্য হুমকি এবং গ) প্রতিষ্ঠানটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন না ঘটিয়ে বরং এটির পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে তখন যদি সেই কর্মকর্তা-কর্মচারী এই ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে অভিহিত করেন তবে তিনিই হবেন হুইসল্ ব্লোয়ার। হুইসল্ ব্লোয়িং তখনই প্রয়োজন যখন কোন মারাত্মক নৈতিক লঙ্ঘন দেখা যায় যা জনস্বার্থের পরিপন্থী। একজন হুইসল্ ব্লোয়ারের দায় হচ্ছে তিনি তথ্যটি শুধুমাত্র জনসম্মুখে নিয়ে আসবেন এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোন কিছু করবেন না। ফলে হুইসল্ ব্লোয়ারকে অবশ্যই অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৪.৫ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের উপায়সমূহ: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের প্রকারভেদ নিয়ে নীতিদার্শনিকবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ভিনসেন্ট ব্যরি তাঁর *Moral Issues in Business* গ্রন্থে বিভন্ন প্রকার হুইসল্ ব্লোয়িং নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলোর ব্যাপারে অনেকেই একমত পোষণ করেন। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার হুইসল্ ব্লোয়িং আলোচিত হলো:[১২]

৪.৫.১ অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িং: প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন সহকর্মী বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন বা প্রকাশ করেন তখন তাকে অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িং (Internal whistle-blowing) বলে। যেমন ধরা যাক্, 'X' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ শাখায় 'ক' নামক একজন কর্মকর্তা জাল বা নকল সনদ বিক্রি করেন। অন্যদিকে, একই শাখার 'খ' নামক একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। 'খ' নামক ব্যক্তিটি যখন 'ক' নামক ব্যক্তিটির এইরূপ অনৈতিক কর্মকাণ্ড সনদ শাখার প্রধানকে (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) অভিহিত করেন তখন 'খ' নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এই ধরনের তথ্য প্রকাশ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই সংঘটিত হয়। তবে অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িংকে অনেকে হুইসল্ হিসেবে গ্রহণ করতে চান না। কারণ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞাতেই স্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ডের প্রকাশকে বোঝানো হয়। একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন অভ্যন্তরীণ অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোন কর্মকর্তার নিকট হুইসল্ ব্লো করেন প্রকৃতপক্ষে সেটা উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্বে অঙ্গীকারকৃত দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কারণ প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিভিন্ন

ধরনের দায়বদ্ধতা থাকে। তথাপিও অনেক নীতিদার্শনিকগণ অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িংকে যথার্থ হিসেবেই বিবেচনা করেন।

৪.৫.২ বহিঃস্থ হুইসল্ ব্লোয়িং: প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে অভিহিত করার পরও প্রতিষ্ঠান যদি কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন কিংবা উদাসীন বা সময়ক্ষেপণ করেন তখন ঐ অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কর্তৃপক্ষ (যেমন সংবাদকর্মী, আইন প্রয়োগকরী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃপক্ষ) কে অভিহিত করা হয় তখন তাকে বহিঃস্থ হুইসল্ ব্লোয়িং (External whistle-blowing) বলে। যেমন উপরে উল্লিখিত উদাহরণে ‘খ’ নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যদি ‘ক’ নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তখন ‘খ’ নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি সেটি সংবাদপত্রে বা অন্যকোন গণমাধ্যমে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসি (UGC) এর নিকট প্রকাশ করেন তখন সেটিকে বহিঃস্থ হুইসল্ ব্লোয়িং বলা হয়। অনেকের মতে বহিঃস্থ হুইসল্ ব্লোয়িংই হলো প্রকৃত হুইসল্ ব্লোয়িং।

৪.৫.৩ পরিচয় প্রকাশপূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং: যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ পরিচয় প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে উন্মুক্ত হুইসল্ ব্লোয়িং (Open whistle-blowing) বলে। যেমন উপরে উল্লিখিত উদাহরণে ‘খ’ নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য যদি নিজের নাম গোপন না করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানায় তখন সেটি পরিচয় প্রকাশপূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন এডওয়ার্ড স্নোডেন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন বিধায় তাঁকে পরিচয় প্রকাশপূর্বক হুইসল্ ব্লোয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৪.৫.৪ পরিচয় প্রকাশহীন হুইসল্ ব্লোয়িং: বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবসময় পরিচয় প্রকাশ করে তথ্য প্রকাশ সম্ভব হয় না। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তির চাকুরি হারানোর সম্ভবানা থাকে, পদোন্নতি বিলম্বিত বা পদাবনতির সম্ভাবনা থাকে, আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং সর্বোপরি জীবনের নিরাপত্তাহীনতার সম্ভাবনা থাকে। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজ পরিচয় গোপন করে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে পরিচয় প্রকাশহীন হুইসল্ ব্লোয়িং (Anonymous whistle-blowing) বলে। যেমন উপরে উল্লিখিত উদাহরণে ‘খ’ নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি নিজের নাম গোপন করে অনৈতিক কর্মকাণ্ড

সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানায় তখন এটি পরিচয় প্রকাশহীন হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৫.৫ আংশিক প্রকাশ এবং আংশিক গোপন পূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং: আংশিক উন্মুক্ত এবং আংশিক অপ্রকাশিত রেখে যখন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয় তখন তাকে আংশিক উন্মুক্ত এবং আংশিক পরিচয় গোপন পূর্বক হুইসল্ ব্লোয়িং (Partly Open and partly anonymous whistle-blowing) বলে। যেমন অনেক সময় আমরা পরিচয় গোপন রেখে পত্রিকায় বিভিন্ন অনৈতিক বা অপরাধমূলক সংবাদ প্রকাশ হতে দেখি যা এ ধরনের হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকা বা গণমাধ্যমে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে নানারকম অনৈতিক বা অপরাধমূলক তথ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে যদিও সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয় জানা থাকে। এ প্রক্রিয়াটি আংশিক পরিচয় প্রকাশ যেমন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পরিচয় প্রকাশ এবং আংশিক পরিচয় অপ্রকাশিত অর্থাৎ সম্পাদক ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারা সম্ভব নয়।

৪.৫.৬ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক হুইসল্ ব্লোয়িং: বর্তমানে কর্মরত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান করা হয় তখন তাকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক হুইসল্ ব্লোয়িং (Current whistle-blowing) বলে। যেমন আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার (CIA) কর্মকর্তা-কর্মচারী এডওয়ার্ড যোসেফ স্নোডেন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যই এই ধরনের অনৈতিক তথ্য প্রকাশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ তিনি কর্মরত অবস্থায় তথ্য প্রকাশ করেছিলেন।

৪.৫.৭ প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে হুইসল্ ব্লোয়িং: চাকুরিরত অবস্থায় অনেক সময় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক বা অসৎ বা অপরাধমূলক তথ্য প্রকাশ করতে চায় না। কারণ এক্ষেত্রে তার চাকুরিতে নানা রকম আর্থিক বিড়ম্বনা প্রাণনাশসহ অনেক অনভিপ্রেত প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থেকে যায় যা উক্ত ব্যক্তির জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন বা অবসর গ্রহণ অথবা সম্ভাব্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করে থাকেন। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয় কিন্তু কোন এক সময় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন এরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড (যা জনগণের জন্য ক্ষতিকর) জনসম্মুখে প্রকাশ

করার প্রক্রিয়াকেই প্রাক্তন হুইসল্ ব্লোয়িং (Alumni whistle-blowing) বলে। যেমন আমেরিকার বি. এফ. গুডরিচ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ভেন্ডিভিয়ার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যই এই ধরনের অনৈতিক তথ্য প্রকাশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি তথ্য প্রকাশ করেননি বরং প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার পর কংগ্রেসের নিকট তথ্য প্রকাশে প্রয়াসী হন।

৪.৫.৮ **ব্যক্তিগত হুইসল্ ব্লোয়িং:** ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কারণেও কোন কোন সময় হুইসল্ ব্লোয়িং সংঘটিত হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনাকেও কখনো কখনো হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেননা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না। তাই এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অন্যান্যদের নিকট অভিযোগ করেন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির যৌন হয়রানি সংক্রান্ত হুইসল্ ব্লোয়িং করেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে অভিযোগ কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয় বরং নির্দিষ্ট কোন 'ব্যক্তি'র বিরুদ্ধে। ফলে এই ধরনের ঘটনাকে ব্যক্তিগত হুইসল্ ব্লোয়িং বলে। এমন ধরনের ঘটনায় যদি অন্যদের উপর সরাসরি ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হুইসল্ ব্লোয়িং নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য হলেও আবশ্যক নয়। তবে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তার আবশ্যিকতা কোন কোন সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৪.৫.৯ **সরকারি হুইসল্ ব্লোয়িং:** কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রাষ্ট্রীয় কোন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা তদন্তকারী সংস্থার নিকট ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীর দপ্তর কিংবা বিভাগের অনৈতিক তথ্যাদি যেমন উৎকচ গ্রহণ, অনিয়ম ইত্যাদি প্রকাশ করে দিতে পারে। আবার সরকারের সংঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকটও সরকারের জালিয়াতি সংক্রান্ত হুইসল্ ব্লোয়িং হতে পারে। আবার, কখনো কখনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গণমাধ্যম যেমন সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রেডিও ইত্যাদিগুলোতে সরকারি কোন দপ্তর বা সরকারের হুইসল্ ব্লোয়িং করে দেয়। এসব হুইসল্ ব্লোয়িং সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে সরকারি হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে গণ্য করা হয়।

মাক্রেকার্স: মাক্রেকার্স (Muckrakers) হলো সেই ব্যক্তি যিনি অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ান। মাক্রেকার্সের সাথে প্রতিষ্ঠানের কোন বন্ধন বা সম্পর্ক থাকে না কিন্তু হুইসল্ ব্লোয়ার ঐ প্রতিষ্ঠানেরই কর্মকর্তা-কর্মচারী। মাক্রেকার্স এবং হুইসল্ ব্লোয়ারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো হুইসল্ ব্লোয়াররা জনস্বার্থে যথার্থ নৈতিক অবস্থান থেকে কাজটি সম্পন্ন করে এবং অন্যদিকে মাক্রেকার্সরা কোন কিছুর বিনিময়ে বা কোন কিছুর প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করে। তাই মাক্রেকার্সরা পুলিশের

গুপ্তচর বা গোপন সংবাদদাতা হিসেবে বিবেচিত। তাদের দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনেক সময় জনকল্যাণমূলক হলেও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা একজন মাক্‌রেকার্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন নয় বরং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা।

৪.৬ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের শর্তসমূহ: তথ্য প্রকাশের সকল ঘটনাই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন কারণে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িং করতে পারেন যেমন প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির প্রতি প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে অথবা নিজেকে পত্রিকার শিরোনাম বানাতে অথবা প্রতিযোগী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট অনৈতিক বা অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করে একজন ব্যক্তি হুইসল্ ব্লোয়িং করতে পারেন। তাই হুইসল্ ব্লোয়িং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে কতগুলো শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের প্রধান শর্তসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১৩]

৪.৬.১ তথ্য প্রকাশে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে: তথ্য প্রকাশ যে কেবল নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘটিত হয় তা নয় বরং কোন কোন সময় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও হুইসল্ ব্লোয়িংয় সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু হুইসল্ ব্লোয়িংয়কে অবশ্যই যথার্থ নৈতিক উদ্দেশ্য থেকে সংঘটিত হতে হবে। অর্থাৎ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের কারণসমূহ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যদি হুইসল্ ব্লোয়ার প্রকাশিত ঘটনার মাধ্যমে তাঁর স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেন কিম্বা অন্যের প্রতি কোন রকম ক্ষোভ বা হিংসা থেকে তথ্যটি প্রকাশ করেন তখন তা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধরা যাক্, কোন একটি প্রতিষ্ঠানে ‘রহিম’ নামক কোন একজন কর্মচারী কাজ করেন। কোন এক সময় প্রতিষ্ঠানের মালিক ‘রহিম’কে প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের এই সিদ্ধান্ত ‘রহিম’ জানতে পেরে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের কিছু অসৎ, অনৈতিক, অবৈধ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড প্রত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। ‘রহিম’ কর্তৃক প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সত্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই তথ্য উন্মোচন হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হবে না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠান তাঁকে চাকুরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঠিক সেই মুহুর্তে তথ্য প্রকাশের বিষয়টিকে নিজের জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেটির অভিপ্রায়ই হলো প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু অন্যদিকে, নতুন বাজারজাত করা কোন ঔষধ যদি মানুষকে সুস্থ করার পরিবর্তে মরণঘাতি হয় তাহলে এই তথ্য উন্মোচন করা হবে যথোপযুক্ত এবং নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য। এখানে ব্যক্তিগত ফায়দা কিংবা যশ বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, এডওয়ার্ড স্নোডেন যদি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে অথবা মিডিয়া দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার জন্য হুইসল্ ব্লো করে থাকেন তাহলে তথ্য উপাত্ত যথার্থ হলেও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য তৃতীয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীলতা অথবা পেশাগত বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি ছিল না। এভাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা দ্বারা প্রস্তুতকৃত ঔষধ জনসাধারণের মারাত্মক ও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে– এ বিষয়টি উপলব্ধি করে তথ্য প্রকাশ করায় এটি নৈতিক অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে। এ দিক বিবেচনা করেই হয়তো আমেরিকার খ্যাতনামা কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এথিক্স ইন বিজনেসের (International Center for Ethics in Business) সহকারী পরিচালক রিচার্ড টি ডিজর্জ তাঁর *Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, "The firm, through its product or policy, will do serios and considerable harm to employees or to the public, whether in the person of the user of its product, an innocent bystander, or the general public."[১৪] এখানে রিচার্ড ডিজর্জের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠান যদি পণ্য তৈরি কিংবা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর কিছু করে তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করা উচিত। মনে রাখতে হবে একজন পেশাজীবীর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করা।

৪.৬.২ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে: তথ্য প্রকাশকারীকে জনসম্মুখে তথ্য উন্মোচিত করার পূর্বেই অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে যা আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। সেই আলোকে তাকে বাহিরে তথ্য প্রকাশ করার পূর্বে অভ্যন্তরীণভাবে চেষ্টা করতে হবে যেন উদ্ভূত সমস্যাটি সমাধান করা যায়। জনসম্মুখে বা মিডিয়ায় হুইসল্ ব্লোয়িং প্রথম পদক্ষেপ নয় বরং শেষ পদক্ষেপ হওয়া উচিত। কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ যথাযথ প্রক্রিয়ায় শেষ না হলে সাধারণত আদালতেও বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। দ্বিমত কিংবা ভিন্নমত প্রকাশের জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ব্যবস্থা রয়েছে। এই ধরণের পদক্ষেপ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় এবং প্রতিষ্ঠানের বাহিরে তথ্য প্রকাশকারীদের সুযোগ সংকুচিত করে দেয়। কিন্তু যখন পুরো সংস্থা কোন অন্যায় অথবা অবৈধ অথবা অন্যান্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তা প্রকাশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে তখন হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিষয়টি বৈধ হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে পরিহার করে জনগণের সামনে তথ্য প্রকাশ তখনই বৈধ হয় যখন সমস্যাসমূহ গুরুতর বা মারাত্মক এবং রোধ করা আশু প্রয়োজনীয় হয়। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তথ্য প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত কিংবা ধীরগতিরও হয়। সেক্ষেত্রে অন্যায়কার্য সন্নিকটে হলে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহ নিঃশেষ করার

প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার প্রতিষ্ঠান মর্টন থিওকলের দুইজন প্রকৌশলী চ্যালেঞ্জার নামক মহাকাশ যানের ত্রুটি নিয়ে তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সতর্ক বার্তা উপযুক্ত সময়ে নাসার কর্মকর্তাদের নিকট কখনো পৌঁছেনি। চ্যালেঞ্জার বিস্ফোরণের পরে তাঁরা পূর্বোক্ত ঘটনা খুলে বলার কারণে মর্টন থিওকল তাঁদের বহিস্কার করে। তাঁদের তথ্য প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ার কারণে দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনা প্রতিহত করার জন্য মহাকাশযান উৎক্ষেপণের পূর্বেই এই তথ্য প্রকাশ করা উচিত ছিল এবং প্রতিষ্ঠানকে জানানোর পরে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাৎক্ষণিকভাবে নাসা কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার প্রয়োজন ছিল। এবার পূর্বে উল্লিখিত বার্ট কেসের উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, হোলজার জর্টসব্যাঙ্গ তাঁর উদ্বগের কথা প্রথমে রবার্ট ব্রুডারকে জানান। পরবর্তীতে জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রামার ম্যাক্স ব্লানকেনজিকে অভিহিত করার পরও যখন সমস্যা সমাধানে কাঙ্খিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি তখন সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালক সদস্য ড্যানিয়েল হেলেক্সকে জানান। এ প্রক্রিয়াটিই অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পরিসমাপ্তি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বার্ট কর্তৃপক্ষ তিনজন প্রকৌশলীর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে ওয়েস্টিং হাউজের বক্তব্য গ্রহণ করে উক্ত প্রকৌশলীত্রয়কে চাকুরিচ্যুত করে। এখানে রিচার্ড ডিজজের্র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর *Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, "Once employees identify a serious threat to the user of a product or to the general public, they should report it to their immediate superior and make their moral concern known. Unless they do so, the act of whistle-blowing is not clearly justifiable."[১৫] এই বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতির হুমকি চিহ্নিত করেন তখন তার উচিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অভিহিত করা এবং নৈতিক উদ্বেগ প্রকাশ করা। অর্থাৎ হুইসল্ ব্লোয়ার তাঁর আপত্তির বিষয়টি অভ্যন্তরীণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। কারণ এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। যেমন আনুগত্যতা, বিশ্বস্ততা, গোপনীয়তা যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ফলে যেকোন আপত্তিমূলক তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশের পূর্বে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অপরিহার্য। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যদি কার্যকরী পদ্ধতি কার্যকর হয় তাহলে প্রত্যেক হুইসল্ ব্লোয়ার তা মেনে চলতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় জনসম্মুখে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ঝুঁকি কম থাকে।

৪.৬.৩ পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণ থাকতে হবে: হুইসল্ ব্লোয়ারকে তার তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং প্রকাশিত তথ্যের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণ থাকতে হবে। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে

সাধারণত বিষয়সমূহ অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে থাকে যা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। অর্থাৎ উত্থাপিত বিষয়সমূহ যদি ভিত্তিহীন কিংবা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় তখন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বরং আরো বৃদ্ধি পায়। তাই একজন সম্ভাব্য হুইসল্ ব্লোয়ার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশায় কঠোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কারণ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তারা যে অন্যায্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত তা প্রমাণের জন্য সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। হুইসল্ ব্লোয়ারের নিকট যতটুকু সম্ভব দালিলিক এবং সমর্থনযোগ্য প্রমাণ থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন হুইসল্ ব্লোয়ার কর্তৃক উত্থাপিত অন্যায়সমূহ তখনই শক্তিশালী হয় যখন তা যাচাইযোগ্য তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত এবং শুধুমাত্র গুজব দ্বারা পরিচালিত নয়। কারণ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মামলা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আদালতে প্রায়ই ভুল প্রমাণিত হয়। তাছাড়া মনে রাখতে হবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় উক্ত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অনেক সময় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়।

৪.৬.৪ যেকোন অনৈতিক কাজ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের আওতাভুক্ত নয়: যেকোন অনৈতিক বা অবৈধ কাজের জন্য হুইসল্ ব্লোয়িং করা সমীচীন নয়। অর্থাৎ প্রকাশিতব্য হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতির মাত্রা বা গ্রহণযোগ্যতা বিচার বিশ্লেষণ করার পরই কাজটি করতে হবে। যেমন নৈতিকতার লঙ্ঘন কতটুকু মারাত্মক?; নৈতিকতার লঙ্ঘন কতটুকু আসন্ন? এবং নৈতিকতার লঙ্ঘন কতটা সুনির্দিষ্ট? অর্থাৎ লঙ্ঘনের মাত্রা কতটুকু মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। নৈতিকতার লঙ্ঘন মারাত্মক বলতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজটি কতটুকু ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক সে বিষয়টাকে বুঝায়। অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় সেক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লো করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া অনৈতিক বা অবৈধ কাজটি সংঘটিত হওয়ার সময়কাল কতটা নিকটবর্তী তার উপর নির্ভর করে নৈতিকতার লঙ্ঘন কতটা আসন্ন সে বিষয়টি। নৈতিকতার লঙ্ঘন সুনির্দিষ্ট বলতে বুঝায় উক্ত অনৈতিক কাজের বিষয়ে প্রাপ্ত দালিলিক তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণের পর্যাপ্ততাকে নির্দেশ করে। অন্য যে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা হলো নৈতিকতার লঙ্ঘন আসলে কতটুকু আসন্ন। নৈতিকতা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটার পূর্বে যত বেশি সময় থাকবে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ করার সুযোগ তত বেশি থাকবে। সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করা যেতে পারে। তাছাড়া অনৈতিক বা অবৈধ কাজের মূর্ত দৃষ্টান্ত থাকতে হবে। ঢালাওভাবে মন্তব্য করা চলবে না যে 'পি' নামক প্রতিষ্ঠান অবৈধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে আমরা জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসিসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকেন তাহলে উক্ত বিষয়টি

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জানানো হলে তা হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ যদি উক্ত ঘটনাটির নৈতিকতার লঙ্ঘনের মাত্রা বিবেচনা করা হয় তাহলে এটির প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুদূর প্রসারী। অর্থাৎ পরীক্ষার পূর্বে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা কলুষিত হবে। উক্ত কাজটি একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি করবে ঠিক তেমনি ফাঁসকৃত প্রশ্নপ্রত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। ঘটনাটি যেহেতু পরীক্ষার ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে ঘটে সেহেতু বিষয়টি অতিদ্রুত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জানানো উচিত। আবার ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের নমুনা পরীক্ষার পূর্বেই হুইসল্ ব্লোয়ারের নিকট সংরক্ষণ করতে হবে যা উক্ত ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৪.৬.৫ হুইসল্ ব্লোয়িং একটি নৈতিক দায়িত্ব যা সম্পাদন করা অপরিহার্য: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সুযোগ পেয়েও যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ না করেন তবে তাঁর সাথে অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। ধরা যাক্, কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ‘ক’ নামক কর্মচারী দীর্ঘদিন যাবৎ জাল সনদ বিক্রি করছেন যা একই শাখার ‘খ’ নামক কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও ‘খ’ নামক কর্মচারী কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। ফলে ‘খ’ নামক কর্মচারীর কার্যক্রম এবং ‘ক’ নামক কর্মচারীর কার্যক্রমের মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ‘ক’ নামক কর্মচারী জাল সনদ বিক্রি করে জেনে-শুনে-বুঝে নৈতিকতা লঙ্ঘন করছেন এবং তার উপর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করছেন। আবার অন্যদিকে, ‘খ’ নামক কর্মচারীও পরোক্ষভাবে জেনে-শুনে-বুঝে নৈতিকতা লঙ্ঘন করছেন। কারণ ‘খ’ নামক কর্মচারীর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করছেন না। ফলে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করছেন। এখানে, ‘ক’ নামক কর্মচারী সরাসরি নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করছেন এবং অর্পিত দায়িত্বকে অবজ্ঞা করছেন। অনুরূপভাবে, ‘খ’ নামক কর্মচারীও নৈতিকতাকে উপক্ষো করছেন এবং দায়িত্ব অবহেলা করছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে অন্যায় কর্ম সংঘটিত না করেও ‘খ’ নামক কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সুযোগকে উপেক্ষা করায় ‘ক’ নামক কর্মচারীর সমপর্যায়ভূক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪.৬.৬ সম্ভাব্য পরিণতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় সফলতা লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে। হুইসল্ ব্লোয়িং অনেক কারণেই ব্যর্থ হতে পারে। কখনো হুইসল্ ব্লোয়ারের নিজস্ব ত্রুটির কারণে তিনি সর্বত্র মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন অথবা কার্যকর

কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে পারেন না। অভিযুক্ত সংস্থা যদি খুব ক্ষমতাধর হয় তখন হুইসল্ ব্লোয়িং করলেও এটিকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পরে। আবার কখনো কখনো জনসাধারণ যথাযথভাবে সাড়া দেয় না। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পর যদি সমাজ, রাষ্ট্র বা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি না হয় তাহলে কেউই তার পরিবার পরিজনকে সমূহবিপদে রেখে উক্ত কার্য করার জন্য আগ্রহী হবে না। তবে এটি বলা উচিত হবে না যে সফলতার সুযোগ নেই বলে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িং করবে না। তবে এটিও সত্য যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সফলতার সুযোগ না থাকলে তা অনেক সময় আবেদন হারিয়ে ফেলে। হুইসল্ ব্লোয়ারগণ যদি ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন তাহলে তাঁদের নিজেদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা উপাত্ত ম্যানুয়াল জি ভেলাসকোয়েজ তাঁর *Business Ethics; Concepts and Cases* গ্রন্থে উপস্থাপন করে বলেন যে, হুইসল্ ব্লোয়ারদের গড় বয়স ৪৭ বছর এবং যাঁরা হুইসল্ ব্লোয়িং করেছেন ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার বেলায় তাঁদের ১০০% নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। জরিপে আরও লক্ষ্য করা গেছে ২০% এখনও চাকরি খুঁজে পায়নি, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ২৫% লোকের ভোগান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৭% লোক গৃহহারা হয়েছে, ৫৪% লোক তাদের সহকর্মী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে, ১৫% লোকের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, ৮০% লোকের শারীরিক অবনতি ঘটেছে, ৮৬% লোক আবেগপ্রবণ চাপ, হতাশা গ্রস্ত হওয়া, শক্তিহীনতা হওয়া, একাকীত্ব বোধ করা প্রভৃতি মানসিক চাপ ভোগ করে এবং ১০% লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তারপরও অনেকে হুইসল্ ব্লোয়িংকে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংস্থা উভয়ের সম্ভাব্য বড় ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন।[১৬] উপরের তথ্য উপাত্ত এটাই নির্দেশ করে যে, হুইসল্ ব্লোয়ারদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাটীর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকাশিত তথ্য হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রধানত উপরের ছয়টি শর্ত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে প্রকাশিত তথ্য হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে বিবেচিত হবে না। কারণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, যেকোন তথ্য প্রকাশকেই হুইসল্ ব্লোয়িং হিসাবে গণ্য করা যায় না। তাই হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উপরের শর্তসমূহ অনুসরণ করা উচিত।

৪.৭ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত: হুইসল্ ব্লোয়িং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার অনেক সুদূর প্রসারী ফলাফল রয়েছে। নৈতিকভাবে সাংঘর্ষিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং পেশাগত চাহিদা ও পছন্দ ইত্যাদি সংকটের মধ্যেই হুইসল্ ব্লোয়িং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে একক কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের

পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। বিবেচনাযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১৭]

- হুইসল্ ব্লোয়িং করার পূর্বে হুইসল্ ব্লোয়ার তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হুইসল্ ব্লোয়িং করার জন্য উপযুক্ত কিনা তা বিবেচনা রাখতে হবে। যেমন পূর্বে উল্লিখিত বার্টের তিনজন প্রকৌশলীর জন্য পরিবেশ তাঁদের অনুকূলে ছিল না যার কারণে তিনজন প্রকৌশলীই একত্রে চাকুরিচ্যুত হন।
- অভিপ্রায় পর্যালোচনা করতে হবে। অর্থাৎ হুইসল্ ব্লোয়ার যে তথ্যটি জনসম্মুখে উপস্থাপন করছেন তা দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করছেন না বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন তা বিবেচনা করতে হবে। তাই হুইসল্ ব্লোয়ারের উদ্দেশ্য এবং প্রকাশিতব্য তথ্যের সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। যেমন পূর্বে উল্লিখিত বার্টের তিনজন প্রকৌশলীর অভিপ্রায় ছিল নৈতিক। কারণ তাঁরা নিজেদেরকে নায়কোচিত করার জন্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে কাজটি করেননি।
- হুইসল্ ব্লোয়ারকে তার তথ্যসমূহ সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ তথ্য-উপাত্ত আদালতে আইনগতভাবে শুনানিতে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে। যেমন পূর্বে উল্লিখিত বার্টের তিনজন প্রকৌশলীর তথ্য-উপাত্ত যথার্থ ছিল বলেই আদালত এর কর্তৃপক্ষকে ২৫০০০ ডলার জরিমানা প্রদানের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আবার, যদি তথ্য উপাত্ত ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে হুইসল্ ব্লোয়ারকে আদালতের নির্দেশিত শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- অন্যায় কর্ম কোন ধরনের এবং কার নিকট প্রতিবেদন পেশ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায় কর্মটি দ্বারা সমাজ কতটুকু প্রভাবিত সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।
- হুইসল্ ব্লোয়ার কর্তৃক উত্থাপিত অন্যায় বা অন্যায্য বা বেআইনি প্রভৃতি বিষয়সমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে এবং দাবির সমর্থনে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রাখতে হবে।
- ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ হুইসল্ ব্লোয়ারকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অন্যথায়, ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা ক্রোধের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
- অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় নাকি বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় হুইসল্ ব্লোয়িং করা হবে সে বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যদি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত হয় তাহলে তা প্রথমে নির্বাচন

করতে হবে। যেমন বার্টের প্রকৌশলীগণ অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বোর্ডের সদস্যবৃন্দের নিকট হুইসল্ ব্লোয়িং করেছিলেন।

- হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন নাকি গোপন রাখবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ নাম প্রকাশ করলে যদি অনাকাঙ্খিত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লোয়ারে নাম গোপন রাখাই শ্রেয়। যেমন বার্টের ইঞ্জিনিয়ার হোলজার জর্টসব্যাঙ্গ প্রথমে স্বীয় নাম গোপন রেখে তথ্য-উপাত্ত দাখিল করেছিলেন।
- হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের কাজটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় প্রকাশ করা হবে নাকি প্রতিষ্ঠানের চাকুরি থেকে অবসর বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের পরে করা হবে সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। যদি কর্মরত অবস্থায় তথ্য প্রকাশ করলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবসর গ্রহণ বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। যেমন বি. এফ. গুডরিচ প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী ভেন্ডিভিয়ার প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের পর হুইসল্ ব্লোয়িং করেছিলেন।
- হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ যে কর্মকর্তা-কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িং করতে চান তাঁকে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য কর্তৃপক্ষের নিকট জানাতে হবে। বার্টের প্রকৌশলী হোলজার জর্টসব্যাঙ্গ ওয়েস্টিংহাউজে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সিনিয়র প্রকৌশলী রবার্ট ব্রুডারকে প্রথমে জানান এবং পরবর্তীতে রবার্ট ব্রুডারেরও তাঁর জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী ম্যাক্স ব্লানকেনজিকে জানান। এভাবে অভ্যন্তরীণ ধাপসমূহ অনুসরণ করে অবস্থার কাঙ্খিত উন্নতি না হওয়ায় পরবর্তীতে বোর্ডের সদস্য ড্যানিয়েল হেলেক্সকে অভিহিত করেছেন।
- প্রতিটি পদক্ষেপের সময় একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ কোন কোন সময় হুইসল্ ব্লোয়ার যথাযথ প্রক্রিয়া বা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অপারগ হতে পারেন। তাই এসকল ক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লোয়ার নিজেকে সুরক্ষিত করে আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করে অগ্রসর হতে পারেন।
- প্রতিশোধ পরায়ণতার বিষয়টি সম্পর্কে সম্ভাব্য ধারণা লাভের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সম্ভাব্য খারাপ পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যেমন বার্টের তিনজন প্রকৌশলীকে চাকুরিচ্যুত করার উদাহরণটি প্রতিশোধ পরায়ণতার বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে।

৪.৮ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ন্যায্যতা: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ন্যায্যতা বা যথার্থতা নিয়ে সকলেই একই জায়গায় অবস্থান করেন না। তাই এ সম্পর্কে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পক্ষে। আবার কেউ কেউ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিপক্ষে। 'হুইসল্ ব্লোয়িং করা যাবে না' - বলে যার বিশ্বাস করেন তারা হুইসল্ ব্লোয়িংকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন এবং 'হুইসল্ ব্লোয়িং করা যাবে' - বলে যার বিশ্বাস করেন তারা হুইসল্ ব্লোয়িংকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। যা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:

৪.৮.১ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: হুইসল্ ব্লোয়িংকে যারা যৌক্তিক বলে গ্রহণ করতে চান না তারা হুইসল্ ব্লোয়ারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন। তারা হুইসল্ ব্লোয়ারকে অপ্রকৃতিস্থ, ভারসাম্যহীন, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। *ফরচুন* ম্যাগাজিনে হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে 'রেটস'('rats') বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[১৮] ফলে হুইসল্ ব্লোয়িং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তাদের মতে, এটা অপরাধ বন্ধের কোন পন্থা হতে পারে না। অর্থাৎ নৈতিক কারণে হুইসল্ ব্লোয়িং করলেও তাদের কর্মকাণ্ড সব মহলে প্রশংসিত হয় না। যেমন এডওয়ার্ড স্নোডেন, জুলিয়ান এসেঞ্জ হুইসল্ ব্লোয়িং করার কারণে তাঁদেরকে যথাক্রমে রাশিয়ায় এবং ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে। কোন কোন সময় তাঁদের কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠানের তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবার বিষয়টিকে একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্য করা যাক। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান জেনারেল মটরসের চেয়ারম্যান জেমস এম রচির বক্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

> "Some critics are now busy eroding another support of free enterprise—the loyalty of a management team, with its unifying values of cooperative work. Some of the enemies of business now encourage an employee to be disloyal to the enterprise. They want to create suspicion and disharmony, and pry into the proprietary interests of the business. However this is labeled—industrial espionage, whistle blowing, or professional responsibility—it is another tactic for spreading disunity and creating conflict."[১৯]

জেমস এম রচির বক্তব্য বিশ্লেষণে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের কিছু শত্রু রয়েছে যারা পেশাজীবীদেরকে সংস্থার প্রতি অনুগত না হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। তারা হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ছদ্মাবরণে পারস্পরিক সন্দেহ, অনৈক্য সৃষ্টি করতে কর্মকর্তা-কর্মাচারীদের উৎসাহিত করে এবং ব্যবসায়ের মালিকানাসংক্রান্ত স্বার্থ বিঘ্নিত করে। যাই হোক, এটাকে রচি বিবেচনা করেন, শিল্পের গুপ্তচরবৃত্তি হিসেবে। এটা এক অনন্য সাধারণ কৌশল যার লক্ষ্যই হলো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, অনৈক্য ছড়িয়ে দেয়া

এবং মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রচি হুইসল্ ব্লোয়ারদের ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান শত্রু মনে করেন। যাদের অন্যতম কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে নিজের ফায়দা হাসিল করা যা গুপ্তচর ভিত্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ হুইসল্ ব্লোয়িং মালিক-শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ককে নষ্ট করে। এছাড়া তাঁর মতে এটি দুর্নীতি রোধের জন্য গ্রহণযোগ্য পন্থা নয় বরং হুইসল্ ব্লোয়িং অপরাধকে উৎসাহিত করে।

জেমস এম রচির বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক হলেও এটি সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নয়। কারণ আমরা জানি উপযোগবাদী মানদণ্ড অনুযায়ী যে কাজের মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তাই যথার্থ। সে অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে মালিক বা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধন করে থাকে। সে বিবেচনায় হুইসল্ ব্লোয়িংকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং হুইসল্ ব্লোয়ারকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে উৎসাহিত করা উচিত।

উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বৈধতা দানের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আনুগত্যের দায়িত্ব লঙ্ঘন। একজন ব্যক্তি কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কর্মরত থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের অবস্থান থেকে তার কি তথ্য প্রকাশ করার কোন দায় থাকে? জনসাধারণের নিকট আমাদের দায় রয়েছে বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিহীন। অন্যের গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য আমাদের দায় রয়েছে যদি তা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। ফলে কোন সংস্থার প্রতি আনুগত্যের দায় বিষয়টি বেশ জটিল। এটা ঐ সমস্ত দায়ের ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং আনুগত্যের ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমন একজন নিয়োগকর্তার নিকট একজন পেশাজীবী কতটুকু ঋণী? অন্যকথায় বলতে গেলে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কি ঐ সংস্থার অন্যায্য আচরণ জনসম্মুখে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা উচিত? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে নিম্নের যুক্তির মাধ্যমে যা অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি নামে পরিচিত।

৪.৮.১.১ অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির পক্ষে যুক্তি: অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তিটি (Loyal agent's argument) ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় প্রয়োগ বা ব্যবহার করেন এলেক্স সি. মাইকেলস।[২০] এ যুক্তি অনুসারে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মী প্রভৃতি হবেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর বা নিয়োগকর্তার বাধ্যগত বা অনুগত। অর্থাৎ এই যুক্তির মূলমন্ত্র হলো নিয়োগকর্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বা চাহিদানুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করবে। অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তিটি পর্যালোচনা করলে যে সমস্ত দিকগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:[২১]

- অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি অনুসারে একজন পেশাজীবী নিয়োগকর্তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। অর্থাৎ যিনি অন্য ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাকেই আমরা এজেন্ট বা কর্মকর্তা-কর্মচারী বলি এবং তিনি অন্য পক্ষের কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অন্য পক্ষের সুবিধার্থে কাজ করার দিকটিই পেশাগত সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ আইনজীবী এবং হিসাবরক্ষকদের কথা বলা যেতে পারে। তারা তাঁদের কাজের দক্ষতার মাধ্যমে মক্কেলদের সেবা প্রদান করেন। একইভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পেশাজীবীদেরকেও বিবেচনা করা হয় নিয়োগকর্তার এজেন্ট হিসেবে। কারণ নিয়োগকর্তা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করেন মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে। তাই কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষ করার দায় রয়েছে। সর্বোপরি, অনুগত থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যখন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের হুইসল্ ব্লোয়িং করে তখন তা আপাতদৃষ্টিতে আনুগত্য লঙ্ঘনের শামিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়।
- অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি আইনগতভাবেও সমর্থনযোগ্য। কর্মকর্তা-কর্মচারী হলেন তিনিই যিনি নৈতিকতা অবলম্বন করে কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারী তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তা নির্দেশিত নীতিমালানুযায়ী অনেক সময় কাজ করতে বাধ্য থাকেন। কারণ নিয়োগকর্তার নির্দেশিত পথে কাজ করার জন্যই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়োগ প্রাপ্ত হন। যেমন আইনি ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন আইনজীবী আমরা নিয়োগ দেই। কারণ এই কাজ যথাযথভাবে করতে আমরা অভিজ্ঞ নই। সেজন্য আইনজীবী সবসময় আমাদের দ্বারা নির্দেশিত পথ অবলম্বন করেই তাঁকে কাজ করতে হয়।
- একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রধান দায়িত্ব হলো চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা। অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মসম্পাদন অথবা অন্যের স্বার্থে কাজ করার জন্য একটি চুক্তি। আইনজীবীরা যেমন টাকার বিনিময়ে মক্কেলদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন ঠিক একইভাবে নিয়োগকর্তার সুবিধার্থে কাজ করার জন্য পেশাজীবীরাও নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং নিয়োগকর্তার প্রত্যাশা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে বলা হয় "… pursue the interests of their firms and should ignore ethical considerations is embodied… ."[২২] এই বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে দু'টি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একটি হলো একনিষ্ঠ চিত্তে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অন্বেষণ করা এবং অপরটি

হলো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নৈতিক বিষয়সমূহকে প্রয়োজনে অগ্রাহ্য করা অথবা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা।

- 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি' অনুযায়ী, হুইসল্ ব্লোয়াররা বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হন। কারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সময় সকল প্রকার শর্তসমূহ মেনে নিয়েই প্রতিষ্ঠানতে যোগদান করেন। কিন্তু যোগদান করার পর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের কোন তথ্য-উপাত্ত প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোন উৎসকে প্রদান করার অর্থই হলো চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা এবং এমতাবস্থায় উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪.৮.২ হুইসল্ ব্লোয়িং সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথম অংশে আলোচিত হবে 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি'টি যে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় যা 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির বিপক্ষ যুক্তি' হিসেবে বিবেচিত এবং দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হবে হুইসল্ ব্লোয়িং সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণ।

৪.৮.২.১ অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি: 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তির বিপক্ষ যুক্তি' নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি'টির অসাড়তা প্রমাণে নিম্নে যুক্তিগুলো তুলে ধরা হলো:

- 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি'র সমর্থকরা অনুমান করে নেয় যে, একজন নিয়োগকর্তা যা-ই চাইবেন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী সেভাবেই দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোন নৈতিক মানদণ্ডেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিয়োগকর্তার এই ধরনের সিদ্ধান্ত তখনই নৈতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন নিয়োগকর্তা তার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন কাজ করার নির্দেশ দিবেন। অন্যভাবে বললে, নৈতিক নির্দেশনার আলোকে নিয়োগকর্তা যে আদেশ দিবেন তা-ই কর্মকর্তা-কর্মচারীর করা উচিত। অর্থাৎ নৈতিক নীতি অনুযায়ী নিয়োগকর্তার সকল প্রকার যৌক্তিক নির্দেশনা প্রতিপালনের ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায় রয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মকর্তা-কর্মচারীর হুইসল্ ব্লোয়িং করার স্বাধীনতা রয়েছে।
- 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি' অনুযায়ী, নিয়োগকর্তার দায়িত্ব পালনে কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোন সীমা রেখা নাই। কিন্তু আইনগত দিক দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব নির্ধারিত। অর্থাৎ 'Law of agency' দ্বারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব নির্ধারিত। এ কারণে বলা যায় যে,

"in no event would it be implied that an agent has a duty to perform acts which are illegal or unethical."[২৩] এই বক্তব্য পর্যালোচনায় বলা যায়, নিয়োগকর্তা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যা-ই করতে বলুক না কেন 'Law of agency' কিন্তু কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপর চূড়ান্ত দায় আরোপ করে না। ফলে 'Law of agency' অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার এমন কোন আদেশ পালনে বাধ্য করা যাবে না যা অবৈধ, অন্যায্য ও অনৈতিক। অর্থাৎ কোন আদেশ দ্বারা যদি কারও ক্ষতি বা অনৈতিক কোন কিছু ঘটার সম্ভাবনা অস্পষ্ট হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রান্তীয় চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আবার, কোন আদেশ দ্বারা যদি স্পষ্টভাবে কারও ক্ষতির বা অনৈতিক কোন কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাহলে 'Law of agency' অনুসারে মালিক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ পালনে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাধ্য নয়। এ কারণে বলা হয় "An employee has no obligation to obey."[২৪]

- 'অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি' অনুযায়ী, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য সম্মত হয় তখন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে কাজই করুক না কেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্তনীতি। কারণ কারও পক্ষে অন্যায় কাজ করাকে স্বয়ংক্রিভাবে কখনও ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। যেমন আমার নিজের লাভের জন্য কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুন করা কোন ভাবেই ন্যায়সঙ্গত হবে না। ধরা যাক্, 'অ' নামক এক ব্যক্তির সাথে 'আ' নামক এক ব্যক্তি একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। কিছু সময় পর দেখা গেল যে, 'অ'এর স্বার্থ রক্ষার জন্য 'আ' কে 'ই' নামক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুন করতে হয়েছে। এখন 'আ' যদি বলেন তিনি ('আ') 'অ' এর স্বার্থ রক্ষার্থে 'ই' কে হত্যা করেছেন – তাহলে এটি কি গ্রহণযোগ্য হবে? প্রকৃতপক্ষে এরূপ কর্মকাণ্ড কখনও গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না। এই হত্যাটি আইনগত ও নৈতিক কোন ভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়। তেমনি কর্মকর্তা-কর্মচারীরও যখন নিজ স্বার্থের বাহিরে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার্থে কোন অন্যায্য কাজ করবে তখনও তা অনৈতিক বা অবৈধ কাজ হিসেবেই বিবেচিত হবে (যদিও কর্মকর্তা-কর্মচারী চুক্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে সম্মত)। এভাবেই অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তি ভুল বার্তা প্রদান করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হুইসল্ ব্লোয়িং করলে আনুগত্যের লঙ্ঘন হয় না বরং সমাজ বা জাতির বৃহত্তর কল্যাণই নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়।

- ‘আনুগত্য’কে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন কিংবা সত্যিকারের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়; সেই ক্ষেত্রেও হুইসল্ ব্লোয়াররা খুবই অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদিক থেকে হুইসল্ ব্লোয়িং আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং প্রকৃতপক্ষে কিছু ক্ষেত্রে আনুগত্যই পেশাজীবীদের তাদের প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া অন্যায়কে প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। যুক্তিসঙ্গতভাবে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হুইসল্ ব্লোয়ার তথ্য প্রকাশ করতে পারেন। যেমন একটি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়ে থাকে মূলত সমাজের সদস্যবৃন্দের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকে কেন্দ্র করে। যদি ঔষধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বা তাদের উৎপাদিত ঔষধ জনগণের স্বাস্থ্য সেবার পরিবর্তে জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় সেক্ষেত্রে সেটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে এইরূপ দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রকাশ করেন তবে তা আনুগত্য লঙ্ঘন নয় বরং প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। কারণ অনৈতিক অথবা অবৈধ অথবা অনভিপ্রেত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে ব্যবসায়কে টেকসই করতে এবং ভোক্তাদের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়াতে হুইসল্ ব্লোয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৪.৮.২.২ হুইসল্ ব্লোয়িং সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক প্রমাণ: হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের নৈতিক ভিত্তিকে দেখা যেতে পারে প্রশংসনীয় জননীতির সহায়তকারী হিসেবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রায়ই চরম মূল্য দিতে হয়। আমেরিকার এনরন প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট উন্নয়ন শাখার সহসভাপতি শেরন ওয়াটকিন্স, আমেরিকার ওয়ার্ল্ডকম প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার সহসভাপতি সিনথিয়া কুপার এবং আমেরিকার এফ.বি.আই. স্পেশাল এজেন্টের সাবেক কর্মকর্তা কলিন রলির মত হুইসল্ ব্লোয়ারদের আপেক্ষিকভাবে কোনো ক্ষতি না হলেও অধিকাংশ হুইসল্ ব্লোয়ার ততটা সৌভাগ্যবান নয়। এ প্রসঙ্গে জন আর বোট রাইট এবং বিভু প্রসন পাত্র তাঁদের *Ethics and the Conduct of Business* গ্রন্থে কোন একজন হুইসল্ ব্লোয়ারের বক্তব্যকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন,

> “ For every Sherron Watkins, there are hundreds of whistle-blowers who never make even the back pages of newspapers, so they lack that protection of visibility and are gotten rid of, sometimes legally, sometimes not. Then they spend the next 20 years of their lives trying to figure out what happened to them.” [২৫]

অর্থাৎ শেরন ওয়াটকিন্সের মতো এমন শত শত হুইসল্ ব্লোয়ার রয়েছেন যাদের খবর পত্রিকার পেছনের পৃষ্ঠায়ও আসে না, সুতরাং উক্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্য কোনো সমর্থন পান না এবং কখনো আইনগতভাবে আবার কখনো অন্য উপায়ে তাদেরকে হয়রানি করা হয়। তারা জীবনের পরবর্তী বিশ বছর অতিবাহিত করার পর তখন বুঝতে পারেন যে তাদের জীবনে কী ঘটে গেল। সুতরাং এ বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়াররা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "... blowing the whistle is often a brave act of conscience that can carry heavy personal costs."[২৬] ম্যানুয়াল জি ভেলাসকোয়েজের এ বক্তব্য পর্যালোচনায় বলা যায় যে, দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির প্রয়োজনে স্বীয় জীবনকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রেখে হুইসল্ ব্লোয়াররা বিবেকনিষ্ঠ হয়ে কাজটি সম্পন্ন করেন। যেমন মেরন গ্লাজার নামে একজন সমাজবিজ্ঞানি যিনি ৫৫ জন হুইসল্ ব্লোয়ারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তিনি দাবি করেছেন যে, হুইসল্ ব্লোয়াররা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত এবং কখনো কখনো এমনকি কোন কোন সময় বেশীই অনুগত থাকেন। তিনি এই দাবির স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করেছেন এবং তাঁর একটি পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

> "They [whistle blowers] found that their earlier service and dedication provided them [employers] with little protection against charges of undermining organizational morale and effectiveness."[২৭]

এই বক্তব্য পর্যালোচনায় বলা যায়, নৈতিক প্রতিবাদকারীরা বিশ্বাস করতেন যে যদি উর্ধ্বতনদের নিকট কোন অন্যায় বা বেআইনি বা অবৈধ বা অনৈতিক প্রভৃতি বিষয়সমূহ উত্থাপন করা হয় তাহলে সেখানে যথোপযুক্ত সাড়া মিলবে। এই সরলতাই তাদের বিপদজনক ফাঁদে পা দিতে উৎসাহিত করে। কিন্তু সংস্থার প্রতি তাদের পূর্ববর্তী সেবা এবং ত্যাগস্বীকার, এসব ক্ষেত্রে খুব কমই সুরক্ষা দেয়। এছাড়া হুইসল্ ব্লোয়াররা মনে করে যে তারাও অনুগত পেশাজীবী এবং সেজন্যই তারা হুইসল্ ব্লোয়িং করার প্রথম পদক্ষেপ নেন এই বিশ্বাসে যে তারা তাদের নির্ধারিত কাজটি করছেন এবং তা প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম স্বার্থে। Associated Milk Producers Incorporated কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী যোসেফ রোজের ক্ষেত্রে এটি সত্য। তিনি এএমপিআই (AMPI) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ ক্যাম্পেইন সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এই ভাবে,

> "I [Joseph Rose] never set out to be a whistle-blower; I [Joseph Rose] merely tried to alert the appropriate officials at AMPI to the misconduct I [Joseph Rose] became aware of—I [Joseph Rose] felt that was my duty as AMPI's in-house counsel."[২৮]

যোসেফ রোজের অনুভূতি পর্যালোচনায় বলা যায়, তিনি (যোসেফ রোজ) কখনোই হুইসল্ ব্লোয়ার হতে চাননি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন AMPI কর্তৃপক্ষকে তাদের অন্যায্য আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করতে। এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন AMPI এর একজন পরামর্শদাতা হিসেবে এটি তাঁর দায়িত্ব। এমনকি AMPI হঠাৎ তাঁকে এই দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দিলেও তাঁর ব্যক্তিগত নৈতিক তাড়না থেকে এ্যাটর্নি-ক্লায়েন্টের সম্পর্ককে উর্ধ্বে রেখেই তিনি প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। যদি তিনি হুইসল্ ব্লোয়ার হিসেবে অভিহিত হন তাহলে সেটি তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়।

অর্থনীতিবিদ আলবার্ট ও হার্শম্যান তাঁর *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States* গ্রন্থে বলেন যে, হুইসল্ ব্লোয়িং এবং আনুগত্যের সম্পকের্র বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও জটিল। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, সংস্থার সদস্যগণ এবং সংস্থার সাথে জড়িত অন্য ব্যক্তিবর্গ (যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের ভোক্তা) তাদের অসন্তুষ্টির বিষয়টি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। যেমন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা থেকে বিরত থেকে; অথবা পবির্তন আনয়নের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে এবং অসন্তুষ্টির বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করার মাধ্যমে। আনুগত্য হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সংস্থা থেকে বিদায় নিতে নিরুৎসাহিত করে এবং একই সাথে এটা প্রতিবাদ করার পথকেও সুগম করে তুলে। আলবার্টের মতে,

> "…the likelihood of voice increases with the degree of loyalty. In addition, the two factors are far from independent. A member with a considerable attachment to a product or organization will often search for ways to make himself influential, especially when the organization moves in what he believes is the wrong direction; conversely, a member who wields (or thinks, he weilds) considerable power in an organization and is therefore convinced that he can get it "back on the track" is is likely to develop a strong affection for the organization in which he is powerful." [২৯]

অর্থাৎ আনুগত্যের মাত্রার সাথে সমান্তরালভাবে প্রতিবাদ করার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু এ দুটি বিষয় একে অন্য থেকে আলাদা। একজন সদস্য যিনি কোন পণ্য কিংবা সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে যান তিনি প্রায়ই নিজেকে প্রভাবশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পন্থা খুঁজেন, বিশেষ করে তিনি যখন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোন পদক্ষেপকে অন্যায্য মনে করেন। অন্যদিকে একজন সদস্য যখন সংস্থার বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সন্তুষ্টি অর্জন করেন তখন তিনি ভাবেন যে সবকিছু

সঠিকভাবে করতে পারবেন। এভাবে সংস্থার প্রতি তার একটি গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয় যেখানে তিনি নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান মনে করেন। আলবার্ট ও হার্শম্যানের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, দ্বিমত প্রকাশের মাধ্যমে সংস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উগ্রবাদী আচরণ। অন্যদিকে, প্রতিবাদ করেও প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে যাওয়া আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন। অনেক সময় প্রতিবাদকারীদের সংস্থা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি কার্যকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে যে, দীর্ঘ সময়ে প্রতিষ্ঠানতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের জন্য ঐসব প্রতিবাদকারীদের প্রতিষ্ঠানতে প্রয়োজন রয়েছে। আনুগত্যের ফলস্বরূপ, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রভাবশালী সদস্য ও ক্রেতা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি সময় প্রতিষ্ঠানতে কাজ করবে এই আশায় যে, প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। তাই হুইসল্ ব্লোয়িং করা মোটেই অযৌক্তিক নয় এবং আনুগত্যের সঙ্গে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সম্পর্ক মোটেই সাংঘর্ষিক নয়। কেননা হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে সামাজিক লক্ষ্যগুলো পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, পেশাজীবীদের সাধারণত সংস্থার ভিতরে কিংবা বাহিরে নানান ধরনের আনুগত্য থাকতে পারে যা একটা অপরটার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এই ক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ড্যানিয়েল এলসবার্গের কথা বলা যেতে পারে যিনি পেন্টগণ পেপারস কেলেঙ্কারী সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ড্যানিয়েল এলসবার্গ তাঁর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেন,

> "I [Daniel Ellsberg] think the principle of "company loyalty," as emphasized in the indoctrination within any bureaucratic structure, governmental or private, has come to sum up the notion of loyalty for many people. This is not a healthy situation, because the loyalty that a democracy requires to function is a somewhat varied set of loyalties which includes loyalty to one's fellow citizens, and certainly loyalty to the Constitution and to the broader institutions of the country. Obviously, these loyalties can come into conflict, and merely mentioning the word "loyalty" doesn't dissolve those dilemmas that one faces." [৩০]

অর্থাৎ আমি [ড্যানিয়েল এলসবার্গ] মনে করি যেকোনো সরকারি, বেসরকারি, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অনুশাসনে প্রতিষ্ঠান আনুগত্যের যে ধরনের নীতির উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, অনেকে আনুগত্য বলতে কেবল সেই নীতিকেই বোঝেন। এটা সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা নয়, কারণ গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন, সহ নাগরিকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সংবিধান মেনে চলা এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করা ইত্যাদি। এই আনুগত্যগুলোর মধ্যে অবশ্যই দ্বন্দ্ব

দেখা দিতে পারে। ড্যানিয়েল এলসবার্গ এর মত ইঙ্গিত করে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি গতানুগতিক আনুগত্যের সাথে সমাজের প্রতি আনুগত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এসবক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য হুইসল্ ব্লোয়িংকে বিশ্বাসঘাতকতা বোঝায় না বরং উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় অনুসরণ করা জরুরী যা নিম্নরূপ:[৩১]

- প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক কোন আইন, নিয়ম, নীতি, বিধি লঙ্ঘিত হলে;
- প্রতিষ্ঠানটিতে সামগ্রিকভাবে অব্যবস্থাপনা হলে;
- প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যাপক আকারে অপচয় বা তছরুপ হলে;
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে;
- সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে এবং
- সুনির্দিষ্ট ও প্রকৃতভাবে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

সুতরাং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সাথে আনুগত্যের কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে হইসল ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও জনগণ উভয়ের স্বার্থই নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়।

৪.৯ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন কি?: বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় – হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া উচিত হবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কেউ কেউ হুইসল্ ব্লোয়িংকে নৈতিকভাবে সমর্থন করার বিরোধিতা করেন– আবার কেউ কেউ তাদেরকে সুরক্ষা দেয়ার পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যারা সমর্থন করেন না তারা যেমন তাদের অবস্থানের পক্ষে নানারকম যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন তেমনি যারা সমর্থন করেন তারাও তাদের অবস্থানের স্বপক্ষে নানাবিদ যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। নিম্নে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিপক্ষে ও পক্ষের যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো:

৪.৯.১ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা আইনের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ: হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়নে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন:[৩২]

- হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষায় প্রণীত আইনের অপব্যবহার হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কিংবা নিয়োগকর্তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ক্ষুব্ধ কর্মীরা হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের নামের অপব্যবহার করতে পারে। কখনো কখনো পেশাজীবীরা তাদের অদক্ষতা ধামাচাপা দিতে হুইসল্ ব্লোয়িংকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

- হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা আইন নিয়োগকর্তাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনার অধিকারকে খর্ব করতে পারে। আবার, নিত্যনতুন আইন তৈরি করলে ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।
- হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে যদি আইন দ্বারা সুরক্ষা দেয়া হয় তাহলে যেসব কর্মীরা অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুতির শিকার হয় তাদের জন্য আইনি প্রতিকার কি হবে? অন্যায়ভাবে কোন কর্মীকে অব্যহতি দেয়া হলে এটির আইনগত প্রতিকার হচ্ছে ঐ কর্মীকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা। কিন্তু হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের দায়ে যদি কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীকে একবার বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করা হয় তার ক্ষেত্রে এই সাধারণ প্রতিকারটি বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে। যদিও বিকল্প হিসেবে হুইসল্ ব্লোয়ারদের অন্যায়ভাবে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিকার হিসেবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। সমঝোতা কিংবা দরকষাকষির মাধ্যমে আর্থিক বিষয়টির সুরাহা হতে পারে অথবা আদালতে ক্ষতিপুরণের মামলা করার জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৪.৯.২ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা আইনের পক্ষে যুক্তিসমূহ: হুইসল্ ব্লোয়ারদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার অংশ হিসেবে অনেক প্রতিষ্ঠানে নানা রকম প্রণোদনা থাকে। যেমন কোন কোন প্রতিষ্ঠান হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন নীতির প্রচলন করে থাকে। উক্ত নীতির কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। তবে নীতি কার্যকর করার জন্য কর্মীদের এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তাদের রিপোর্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে এবং অন্যায্যভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর কোনো প্রকারের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ প্রকাশিত ঘটনার সত্যতা যাচাই বাছাই করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাতে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাটি জনসন্মুখে আসার পূর্বেই সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ হুইসল্ ব্লোয়াররা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন। এ অধ্যায়ের ৪.৬.৬ তে এ সংক্রান্ত একটি তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীরা তাদের জীবন, জীবিকা, চাকুরি, পরিবার, ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে হুইসল্ ব্লোয়িং করে থাকেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়িং করলে শুধু যে তার চাকুরি হারানোর ঝুঁকি থাকে তা নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই হুইসল্ ব্লোয়িং করার পরে নিয়োগকর্তা দ্বারা যেন ঐ ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতি সাধিত না হয় এটি নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা

প্রয়োজন। তাই, হুইসল্ ব্লোয়ারদের আইনি সুরক্ষা দেয়ার জন্য অনেক শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে যা নিম্নরূপ:[৩৩]

হুইসল্ ব্লোয়াররা যেহেতু তথ্য প্রকাশ কারার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে তাই তাদের সুরক্ষায় যথাযথ আইন প্রণয়নের যুক্তিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আচরণ, অব্যবস্থাপনা এবং জনসাধারণের জন্য হুমকি এরূপ কোনো বিষয় জনসম্মুখে প্রকাশ করলে তা দ্বারা সমাজ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়। কিন্তু সমাজ তখনই উপকৃত হবে যদি হুইসল্ ব্লোয়ারদের হুইসল্ ব্লোয়িং করার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। আমেরিকার বিশিষ্ট লেখক ও অ্যাটর্নি রালফ নাদের (Ralph Nader) বলেছেন যে, পেশাজীবীদের কথা বলার স্বাধীনতা দিলে বিদ্যমান আইন প্রয়োগ সহজতর হয় এবং কর্পোরেট আচরণে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নও সহজতর হয়। তিনি বলেন,

> "Corporate employees are among the first to know about industrial dumping of mercury or fluoride sludge into waterways, defectively designed automobiles, or undisclosed adverse effects of prescription drugs and pesticides. They [employees] are the first to grasp the technical capabilities to prevent existing product or pollution hazards."[৩৪]

রালফ নাদেরের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কর্পোরেট কর্মীরাই প্রথম যারা পানিতে কারখানার বর্জ্য অপসারণ, অটোমোবাইলের ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন অথবা কিটনাশক জাতীয় ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হন। বিদ্যমান দূষণ কিংবা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা সর্বপ্রথম তারাই অর্জন করেন। কিন্তু তাদের অভিমতকেই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেয়া হয় এবং নীতিমালা তৈরিতে প্রায়ই তাদের মতামত উপেক্ষিত হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালনে এভাবে নিশ্চুপ থাকলে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা ও পরিবেশ বিপর্যয়ে এটির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ক্ষতির সাথে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাবলীর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

হুইসল্ ব্লোয়ারদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করার বিষয়টি বাক স্বাধীনতার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। বাক স্বাধীনতার আইনগত অধিকার এবং নৈতিক অধিকারের মধ্যে একটা পার্থক্য টানা প্রয়োজন। সাংবিধানিক অধিকার আমাদেরকে কেবল সরকারি কার্যকলাপ থেকে সুরক্ষা দেয় যা বেসরকারি নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা হুইসল্ ব্লোয়ারদের নিয়োগকর্তা কর্তৃক গৃহীত প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেয় না। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র তার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু নাগরিক হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা দেয় না। তাই এভাবে বলা যায় যে, বাক স্বাধীনতার একটি নৈতিক অধিকার রয়েছে যা হুইসল্ ব্লোয়ারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কারণ হুইসল্ ব্লোয়ারেরা জনস্বার্থ ও বিবেকর তাড়নায় তথ্য উন্মোচিত করেন; ব্যক্তি স্বার্থে নয়।

৪.১০ বিশ্বজুড়ে হুইসল্ ব্লোয়ারদের জন্য বিদ্যমান আইনি সুরক্ষা: গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সংঘটিত কর্তৃক হুইসল্ ব্লোয়িং কোনোভাবেই রোধ করা যাবে না। আইনী সুরক্ষা হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিকে আরো বেশি শক্তিশালী করে। হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পরবর্তী ঘটনা আরো বেশী সমস্যা তৈরি করে যা পরিহার করা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ উত্থাপিত গ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ আমলে নিয়ে যখন হুইসল্ ব্লোয়ারকে চাকুরি থেকে অব্যহতি দেয়া হয় তখন তা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পেশাজীবীদের নিকট ভুল বার্তা প্রদান করে। আবার, হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে যদি কর্মক্ষেত্রে রেখে দেয়া হয় তখন তা উদ্বেগ এবং ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একটি কার্যকর হুইসল্ ব্লোয়িং নীতি প্রণয়ন ঐ প্রতিষ্ঠানের উত্তম নৈতিকতা ও সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং যা নৈতিক কর্পোরেট পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে সাহসী কর্মীরা যারা নিজেদের স্বার্থ উপেক্ষা করে জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে তারা প্রায়ই নিয়োগকর্তা অথবা সহকর্মীর প্রতিশোধের শিকার হন। তাই এক্ষেত্রে একটি আইন থাকা আবশ্যক যা তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করবে। আশার ব্যাপার হচ্ছে এসব সমস্যা সমাধানকল্পে বিশ্বজুড়ে অনেক আইন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ধরনের আইনগুলো মূলত ২০০০ সালের পরে গৃহীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দেশ হিসেবে সংসদে এই আইন পাশ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এমন আইনের সংখ্যা সর্বাধিক। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে Civil Service Reform Act, 1978 দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের যেসকল কর্মী সরকারের দুর্নীতি প্রকাশ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একই আইন দ্বারা Merit System Protection Board (MSPB) গঠন করা হয়েছে। MSPB এর কাজ হচ্ছে প্রতিশোধ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই আইনের বিধানগুলোকে Whistleblower Protection Act, 1989 দ্বারা আরো শক্তিশালী ও যুগপোযোগী করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০১১ সালের ২২ জুন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ নামে একটি আইন পাশ করে। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষার জন্য অনেক ফেডারেল আইন রয়েছে। যেমন The National Labour Relations Act, 1935 (NLRA) অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী National Labour Relations Board (NLRB) এর কাছে অভিযোগ দায়ের করলে নিয়োগকর্তা ঐ সমস্ত পেশাজীবীদের বিরেুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবেন না।

Title VII of the 1964 Civil Rights Act ঐ পেশাজীবীদের সুরক্ষা প্রদান করে যারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, তদসংশ্লিষ্ট তদন্তে সহায়তা প্রদান করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যসৃষ্টিকারী সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে। The Occupational Safety and Health Act, 1970 পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকে নিষিদ্ধ করেছে যারা Occupational Safety and Health Administration এর নিকট অভিযোগ দায়ের কিংবা বিচারকার্যে সাক্ষ্য প্রদান করে। এমন আরো কিছু আইন হচ্ছে – Surface Mining Act, The Railway Safety Act, The Surface Trampontation Safely Act, The Safe Drinking Water Act, The Toxic Substance Control Act,, The Clean Air Act, The Water Pollution control Act, The Energy Reorganization Act, The Solid Water Disposal Act., The Sarbanes-Oxley Act, 2002 দ্বারা বেসরকারি খাতে হুইসল্ ব্লোয়ারদের প্রথমবারের মত সুরক্ষা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। Enron, WorldCom এবং অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে এই আইনটি পাশ করা হয়েছে। এই আইন পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের প্রতিশোধকে নিষিদ্ধ করেছে। অধিকন্তু এই আইনে সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি স্বাধীন নিরীক্ষা কমিটি গঠনের কথা বলেছে যার কাজ হবে প্রতারণা চিহ্নিত করা। আইনটি অভ্যন্তরীণ হুইসল্ ব্লোয়িংকে সমর্থন করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে প্রতারণামূলক কার্যকলাপের তথ্য সরবরাহের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে চলমান রাখে। এখন হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষায় আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন আইনটি আমেরিকায় Whistle Blower Protection Act, 1989, অস্ট্রেলিয়ায় Public Service Act, Sec 16, Public Interest Disclosure Bill, 2013, মালয়শিয়ায় Whistle Blower Protection Act, 2010, ভারতে Interest Disclosure (Protection of Informers), Act, 2002 ও (Renamed as Whistle Blower Protection Act, 2011) এবং বাংলাদেশে The Public-interst Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011 নামে পরিচিত।

৪.১১ হুইসল্ ব্লোয়ারদের কখন সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়ঃ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা ইতোমধ্যে আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়সমূহ আলোচনা করেছি। তবে সকল ক্ষেত্রেই হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে নির্বিচারে সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়। কারণ আমরা জানি তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত ও বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। যদি সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা না হয় তখন হুইসল্ ব্লোয়িং যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয় না। এছাড়া হুইসল্ ব্লোয়ারদের উত্থাপিত বিষয়সমূহ যদি মিথ্যা হয় এবং তাদের অভিপ্রায় যদি নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হয় তখন তাদের

সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হুইসল্ ব্লোয়ারদের তাদের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে বাক স্বাধীনতা উপভোগ করা উচিত নয় যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৩৫]

- প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেসকল আইনগত, নৈতিক পরিকল্পনা, ব্যবসায় অনুশীলন, ব্যবসায় আচরণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখা উচিত যা সবাইকে অনুশীলন করতে হবে। যেমন ধরা যাক্ 'প্রাণ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য জুস তৈরির সূত্রটি যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী ড্যানিশ প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করে তাহলে এই ধরনের অসৎকার্যক্রম আইনগত, ব্যবসায় অনুশীলন, ব্যাবসায় পরিকল্পনা, নৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এখানে বলা যেতে পারে যে, 'কোকা কোলা' নামক প্রতিষ্ঠানের পানীয় প্রস্তুতকরণ সূত্রটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।
- যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নীতি ও চর্চা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন এবং উক্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ যদি অপ্রাসঙ্গিক, বেআইনি, দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে প্রতীয়মান হয় তখন উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়। যেমন আমের জুস তৈরির ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এরকম গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেন যে, এখানে আমের স্থলে পেপে দিয়ে জুস তৈরি হয় এবং তদন্তে যদি উক্ত ঘটনা প্রমাণিত না হয় তাহলে তা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে বলে প্রতীয়মান হবে। এক্ষেত্রে ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সুরক্ষা প্রদান করা কাম্য নয়।
- কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ দ্বারা যদি কোন অন্যায় কাজ সংগঠিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান না হয় বরং এই ধরনের অভিযোগ প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সুনামকে ক্ষতি করছে মর্মে প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়। যেমন 'জুস তৈরির সূত্রটি যদি প্রকৃতপক্ষে ড্যানিশ প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহের বিষয়টি তদন্ত প্রতিবেদনে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তখন এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির সংকট সৃষ্টি হবে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে।
- কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যখন ব্যাবস্থপকের সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতার বিরুদ্ধে বেআইনি, অনৈতিক অভিযোগ উত্থাপন করে তখন সেটি হুইসল্ ব্লোয়িং হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং এসব ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সুরক্ষা দেয়া উচিত নয়।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অবৈধ কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে উন্মোচিত করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদি নিশ্চিত করা এবং সেটা সম্ভব তখনই যখন হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে তথ্য প্রকাশের অধিকার

দেয়া হবে। কারণ অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। হুইসল্ ব্লোয়ারকে যদি তথ্য প্রকাশের অধিকার দেয়া হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের দায়িত্ব হবে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়া। এ অধিকার প্রদানের বিষয়টিকে দুটো দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পার। প্রথমত হুইসল্ ব্লোয়ারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা; দ্বিতীয়ত পেশাজীবীদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পথ সুগম করা।

হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে তথ্য প্রকাশের অধিকার দেয়া উচিত। কারণ অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যা ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। হুইসল্ ব্লোয়ার এমন সব বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করবেন যা তৃতীয় পক্ষ বা জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ পেশাজীবীদের অনেক দায়িত্ব থাকে। এসব দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা ও জনসম্পত্তি সুরক্ষা দেয়া। অন্যদিকে, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে তথ্য প্রকাশকারীর নিজেরও সুরক্ষা প্রয়োজন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা যদি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা লঙ্ঘিত হয় তাহলে তা যথাযথ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো পেশাজীবীর দায়িত্ব। যদি পেশাজীবীকে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের অধিকার দেয়া না হয় তাহলে কেউ নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কিংবা নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী হবেন না। পূর্বে উল্লিখিত উপাত্ত থেকে বলা যায়, যদি হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের অধিকার প্রদান করা না হয় তাহলে কেউ স্বেচ্ছায় বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের ঝুঁকি গ্রহণে উদ্যোগী বা উৎসাহী হবেন না। কারণ তথ্য প্রকাশকারী তার সামাজিক, মানবিক, পেশাগত জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলেদিয়ে জনগণরে কল্যাণে এগিয়ে আসবে না। এতে রাষ্ট্রের বা সাধারণ জনগণের বৃহত্তর ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। নিম্নে আমার বক্তব্যের সমর্থনে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি সংবাদ মাধ্যমের বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে চাই:

ক) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা *দৈনিক প্রথম আলো* ২০১২ সালের ৯ সেপ্টম্বর 'হলমার্ক কেলেঙ্কারিঃ তারপর?' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, হলমার্ক নামক অখ্যাত প্রতিষ্ঠান জালিয়াতির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, রূপসী বাংলা শাখা, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ৩৬০৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।[৩৬] এ কথা অনস্বীকার্য যে উক্ত ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা ছাড়া এ ধরণের অবৈধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক অডিট করার পূর্বে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা এ অনিয়ম প্রকাশিত হয়নি। কারণ উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে, চাকুরি হারানোর সম্ভাবনা নিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ তথ্য প্রকাশে এগিয়ে আসেননি। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, যদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হুইসল্ ব্লোয়িং করার অধিকার দেয়া হতো এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার

নিশ্চয়তা দেয়া হতো তাহলে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমূহক্ষতি প্রতিরোধে উৎসাহিত হতো।

খ) একই পত্রিকায় ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর "পেট্রোবাংলার তদন্তেও তিতাসের দুর্নীতির চিত্র" শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিষ্ঠান লিমিটেডের শীর্ষকর্মকর্তাদের যোগসাজশেই গাজীপুর অঞ্চলের শতাধিক প্রতিষ্ঠান ২০০% থেকে ৬০০% পর্যন্ত অনুমোদনের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। 'ফার সিরামিক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ২০১২ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুমোদনের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে যার মূল্য ৭৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা।[৩৭] এ তথ্য উপাত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিতাসের কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্র ও জনগণের অনেক বড় ক্ষতি করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যদি হুইসল্ ব্লোয়িং করার অধিকার দেয়া হতো এবং রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান যদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশার নিশ্চয়তা অথবা জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা অথবা সামাজিক মর্যাদা, আইনি সহায়তা প্রভৃতি নিশ্চিত করতে পারতো তাহলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করতো এবং রাষ্ট্রও তার রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হতো না। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণের এ ধরণের সম্ভাব্য ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো না। কারণ এরূপ ঘটনা ঘটার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো এবং ভবিষ্যৎ এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতো। এটা সম্ভব তখনই যখন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পেশাজীবীগণকে হুইসল্ ব্লো করার অধিকার দেয়া হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য একটি আইন পাশ হয় যা "The Public-interst Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011" নামে পরিচিত যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু উক্ত আইন সম্পর্কে জনসাধারণের খুব নগন্যই জানা আছে। তবে বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হুইসল্ ব্লোয়ার ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্তে এই আইনটি প্রয়োগ করছে। যেমন "The Ibn Sina Pharmaceutical Industry Ltd." নামক প্রতিষ্ঠানটি তাদের ২০১৮-১৯ বার্ষিক প্রতিবেদনে দাবি করেছে যে, হুইসল্ ব্লোয়িং পলিসির মাধ্যমে ব্যবসায়, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।[৩৮] অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থ যেন কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সফলতার সঙ্গে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায় যে, হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের কারণে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাবই সমাজে লক্ষ্য করা যায়। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যবসায় নীতিবিদ্যার আলোচনা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ান শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ন্যায় চূড়ান্ত জ্ঞান নয়। অর্থাৎ এ সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লব্ধজ্ঞানকে যেমন গবেষণাগারে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় ঠিক একইভাবে ব্যবসায় নীতিবিদ্যা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে প্রমাণ করা অনেকাংশে সম্ভব নয়। ফলে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ইতিবাচক বলা না গেলেও এটির ইতিবাচক প্রভাব দ্বারা সমাজে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। এবার বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপিত হলো। ধরা যাক্, 'ক' নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'খ' নামক একটি নতুন ঔষধ উৎপাদন করছে এবং উক্ত ঔষধ বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'খ' নামক ঔষধ বাজারজাত করার পূর্বেই উৎপাদন শাখার 'গ' নামক একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর হয় যে, যে সকল উপাদনের আনুপাতিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে উক্ত ঔষধ প্রস্তুতকৃত করার কথা তা ফার্মাসিস্টদের অজ্ঞাতে রেখেই 'খ' নামক ঔষধ প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ ঘটনাটি 'গ' নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী লক্ষ্য করা অথবা অবহিত হওয়ার পর বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অভিহিত করেন। এর পর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর 'গ' নামক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, একজন হুইসল্ ব্লোয়ার তার কর্মকাণ্ডের কারণে সাময়িকভাবে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এটির চেয়েও সমাজের ভবিষ্যৎ ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরই সংবাদ পরিবেশিত হলো যে, 'ক' নামক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের 'খ' নামক ঔষধ সেবনের কারণে পাঁচ জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে। হুইসল্ ব্লোয়ারকে চাকুরিচ্যুত করে প্রতিষ্ঠান হয়তো সাময়িকভাবে লাভবান হয়েছে। কারণ প্রতিষ্ঠানের ভেজাল ঔষধের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ পায়নি বলে উক্ত ঔষধ তৈরির কারণে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রস্তুতকৃত 'খ' নামক ঔষধ সেবনের মাধ্যমে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তখন প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের সফলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, যশ, খ্যাতিকে কলঙ্কিত করেছে। অথচ 'গ' নামক কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে যদি একটি তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে করা হতো তাহলে হয়তো ভবিষ্যৎ ঘটনাটি (পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু) না ঘটার সম্ভাবনা থাকত। ফলে প্রতিষ্ঠান যেমন তার অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে পারত ঠিক তেমনি হুইসল্ ব্লোয়াররাও চাকুরিচ্যুত হতো না। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির মারাত্মক ভুলের জন্য জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থই হলো চূড়ান্তভাবে

প্রতিষ্ঠানেরই ক্ষতি। অর্থাৎ পাঁচ জন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ভাবমূর্তি এক নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল। আবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে উক্ত ক্ষতির দায় কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপরও বর্তায়। কারণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত সদর্থক ভাবমূর্তি যেমন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপভোগ করেন ঠিক তেমনি এটির অবৈধ, অনৈতিক, অসৎ কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লজ্জিত হয় কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পীড়া দায়ক অবস্থানে নিপতিত হয়। এইরূপ বিশ্বাস থেকে যদি একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধ, অনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ মালিককে অভিহিত করে তাহলে বিষয়টি উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক অবস্থা (Win-win situation) হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে হুইসল্ ব্লোয়াররা স্বীয় জীবনকে চরম ঝুঁকির মধ্যে রেখে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এ কারণে হুইসল্ ব্লোয়ারদের সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অর্থাৎ সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকবৃন্দ যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেন ঠিক তেমনিভাবে হুইসল্ ব্লোয়াররা প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া উপযোগবাদী মানদণ্ড অনুযায়ী কোন কাজের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নির্ধারিত হয় সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ মঙ্গল বা কল্যাণের মাধ্যমে। এ বিবেচনায় হুইসল্ ব্লোয়ারদের মাধ্যমেও সমাজের বৃহত্তর জনস্বার্থ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। তাই হুইসল্ ব্লোয়িংকে নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় এবং হুইসল্ ব্লোয়ারদের আইনি সুরক্ষা দেয়া উচিত যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং হুইসল্ ব্লোয়িং পেশাগত দায়িত্ব পালনে শিল্পের গুপ্তচরবৃত্তিতো নয়ই বরং সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় সিপাহসালার ভূমিকায় অবতীর্ণ।

---

১. Vandekerckhove, W. and Lewis, D. (2012), "The Content of Whistleblowing Procedures: A Crtical Review of Recent Official Guidelines", *Journal of Business Ethics*, Vol. 108, No. 2, p. 253.

২. Stewart, D. (1996), *Business Ethics*, Singapore: The McGraw Hill Companies, p. 221.

৩. DeGeorge, R. T (2011)., *Business Ethics*, 7th ed., India: Batra Art Press, p. 300.

৪. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 377.

৫. Petersen, J. C. and Ferrell, D. (1986), *Whistleblowing Ethical and Legal Issues in Expressing Dissent*, Dubuque, Lowa: Kendall-Hunt Publishing Company, pp. 5-6.

৬. Lawrence, A. T. and Weber, J. (2014), *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*, 14th ed., Irwin: McGraw –Hill, p.370.

৭. Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), *Business Ethics*, 2nd ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, p. 73.

৮. Boatright, J. R. and Patra, B. P. (2011), *Ethics and the Conduct of Business*, 6th ed., India: Dorling Kindersley Pvt. Ltd., pp. 125-127.

৯. Desjardins, J. (2011), *An Introduction to Business Ethics*, 4th ed., New York: McGraw-Hill, p. 170.

১০. Thorne, D. M., Ferreii, O. C. and Ferrell, L. (2008), *Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility,* 3rd ed., New York: Houghton Mifflin Company, p. 236.

১১. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 73.

১২. Barry, V. (1986), *Moral Issues in Business,* 3rd ed., California, USA: Wadsworth Publishing Company, p. 260, Please see detail, DeGeorge, Richard T., op. cit., p. 300.

১৩. Bowie, N. E. and Duska, R. F., op. cit., p. 74.

১৪. DeGeorge, R. T., op. cit., p. 306.

১৫. *Ibid.*, p. 308.

১৬. Velasquez, M. G., op. cit., p. 378.

১৭. Weiss, J. W. (2003), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*, 3rd ed., Australia: Thomson South-Western, pp. 248-249.

১৮. Petersen, J. C. and Ferrell, D., op. cit., p. 6.

১৯. Bowie, N. E. and Duska R. F., op. cit., p. 73.

২০. Velasquez, M. G., op. cit., p. 36.

২১ . *Ibid.*, pp. 36-37.

২২. *Ibid.*, p. 36.

২৩. *Ibid.*

২৪. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 129.

২৫. *Ibid.*, p. 124.

২৬. Velasquez, M. G., op. cit., p. 378.

২৭. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 130.

২৮. *Ibid.*, p. 131.

২৯. Hirschman, A. O. (1970), *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*, Cambridge, London: Harvard University Press, p. 77.

৩০. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 132.

৩১. Thorne, D. M., Ferreii, O. C. and Ferrell, L., op. cit., p. 237.

৩২. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 136-137.

৩৩. *Ibid.*, pp. 137-138.

৩৪. *Ibid.*, p. 137.

৩৫. Weiss, J. W., op. cit., pp. 247-248.

৩৬. ফরাসউদ্দিন, মোহাম্মদ (২০১২), "হলমার্ক কেলেঙ্কারি: তারপর?", *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ৯ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১২।

৩৭. "পেট্রোবাংলার তদন্তেও তিতাসের দুর্নীতির চিত্র" (২০১৮), *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ২৩ সেপ্টেম্বর, পৃ. ৩।

৩৮. Annual Report, The Ibn Sina Pharmaceutical Industry Ltd., 2018-19, p. 34.

পঞ্চম অধ্যায়

চাকুরি বৈষম্য ও প্রতিকার

৫.১ ভূমিকা: পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজের সাম্প্রতিক সময়েও সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকম শ্রেণি বৈষম্য বিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস ও বৈষম্যের ইতিহাস যুগপৎভাবে এগিয়ে চলছে। বহু বর্ণ, জাতি গোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠী এবং ব্যবসায়ে সংখ্যালঘু ও নারীদের প্রতি অসংযত আচরণও এক ধরনের বৈষম্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। বৈষম্য কেবলমাত্র কালো-সাদা, নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন বিষয় নয়। যেমন ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকার সমাজে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্ধেকেরও বেশি নারী কর্মী এবং মোট কর্মীর ১০ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্য ছিল। নারী কর্মীদের অধিকাংশই কম মজুরী প্রাপ্ত বা নিম্ন শ্রেণির কর্মে নিয়োজিত ছিল এবং কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা অদক্ষ ও কম মজুরী সম্পন্ন কর্মে নিয়োজিত ছিল। প্রতিষ্ঠানসমূহ চাকুরি দেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণে প্রয়াসী হতো। সমতা, বৈচিত্র্য এবং বৈষম্য প্রশ্নে আধুনিক সভ্য জগতের পরিস্থিতি আজও বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি বরং বেড়েই চলছে। এই বিতর্ক ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার, নারীদের প্রতি অসমতা, শ্বেতাঙ্গ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত বিতর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক এই বর্ণ এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ইতিহাস বহু পুরানো হলেও সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। এসব দিক বিবেচনায় তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় ন্যায়, সমতা, বর্ণবাদ, অধিকার এবং বৈষম্য নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বৈষম্যের মধ্যে অন্যতম হলো চাকুরি বৈষম্য। চাকুরি বৈষম্য কীভাবে প্রতিকার বা প্রতিরোধ বা সমাধান করে কোন প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেটা ব্যবসায় নীতিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

৫.২ চাকুরি বৈষম্য: সাধারণভাবে 'বৈষম্য' বলতে পার্থক্যকরণকে বোঝায়। বুৎপত্তিগত দিক থেকে বৈষম্য বলতে বোঝায় একটি বস্তু থেকে অন্য কোন বস্তুকে পৃথক করা। এই অর্থে বৈষম্য নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং আবশ্যিকভাবে কোনো নিন্দনীয় কাজ নয়। আলবেনিয়া ফেন এস. নোলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেনটিজা ফ্রাক্সি তাঁর "Job Discrimination and Ethics in the Workplace" প্রবন্ধে বলেন, 'বৈষম্য'

('Discrimination') শব্দটি সতেরো শতকে ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়।[১] এ প্রসঙ্গে রিচার্ড টি. ডিজর্জ তাঁর *Business Ethics* গ্রন্থে বলেন, "The term discrimination is usually used in a pejorative sense with respect to employment, but there is also a morally neutral sense of the term."[২] চাকুরি ক্ষেত্রে সাধারণত 'বৈষম্য' শব্দটি নিন্দনীয়, অন্যায়, বিমাতাসুলভ আচরণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও 'বৈষম্য' শব্দটি নিরপেক্ষ নৈতিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে বৈষম্য শব্দটির অর্থ প্রায় ভিন্ন। যেমন আমরা যে বিষয় চাই এবং যে বিষয় চাই না তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। আবার, ফলের বাজারে গিয়ে আমরা ভাল আম ও খারাপ আমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। আবার, আমরা চাকুরি ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক মানদণ্ড ব্যবহার করে বৈষম্য সৃষ্টি করা অনুমোদনযোগ্য নয়। চাকুরি বাজারে অপ্রাসঙ্গিক মানদণ্ড হলো অপেশাগত (Non-job-related), নিন্দনীয় (Pejorative), অগ্রহণযোগ্য, অনভিপ্রেত ইত্যাদি। তাই চাকুরি বাজারে বৈষম্য কাম্য নয় বরং নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েস তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থে বলেন, "The wrongful act of distinguishing illicitly among people not on the basis of individual merit, but on the basis of prejudice or some other invidious or morally reprehensible attitude."[৩] ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, বৈষম্যমূলক আচরণ তথা বেআইনী কাজটি যদি ব্যক্তির মেধার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত না হয়ে অন্য কোনো কুসংস্কার কিংবা অবিবেচনা প্রসূত বা কল্পনা প্রসূত ধারণার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয় তখনই সমাজে বিপত্তি দেখা যায় – যা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য বলতে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কোনো কুসংস্কার বা সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি বিরূপ আচরণকেই বুঝায়। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে প্রকৃতপক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদই সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে জেনটিজা ফ্রাক্সি বলেন,

> "Today, this term (discrimination) refers to "wrongful discrimination," or distinguishing among people on the basis of prejudice instead of individual merit. Job discrimination is when institutional decisions, policies, or procedures are at least partially based on illegitimate forms of discrimination that benefit or harm certain groups of people."[৪]

জেনটিজা ফ্রাক্সির বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, এখানে তিনি বৈষম্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা: (ক) ব্যক্তির মেধার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না; (খ) জাতিগত বা লিঙ্গগত পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং (গ) সিদ্ধান্তটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে এন্ড্রু এবং ডির্ক ম্যাটেন তাঁদের *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* গ্রন্থে বৈষম্য সম্পর্কে বলেন, "Discrimination in the business context occurs when employees receive preferential (or less preferential) treatment on grounds that are not directly related to their qualifications and performance in the job."[৫] তাঁদের বক্তব্য এটিই প্রমাণ করে যে, কোন প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য তখনই ঘটে যখন কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা নিজের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার মানদণ্ড বা মাপকাঠির উপর ভিত্তি না করে অগ্রাধিকারমূলক আচরণ বা কম পছন্দসই আচরণের মাধ্যমে কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন অথবা কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন কর্মক্ষেত্রে সাধারণত জাতি, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, প্রতিবন্ধী,জাতীয়তা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বৈষম্য সংঘটিত হয়। এ প্রসঙ্গে জন রেমন্ড বোটরাইট এবং বিভু প্রসন পাত্র তাঁদের *Ethics and the Conduct of Business* গ্রন্থে বলেন, "The term "discrimination" describes a large number of wrongful acts in employment housing, education, medical care, and other important areas of public life."[৬] তাঁদের মতে, বৈষম্য পরিভাষাটি নিয়োগ, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জনজীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্যায্য কর্মকাণ্ডগুলোকে বর্ণনা করে। বৈষম্য বিষয়টি উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এসব বিষয়সমূহের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তিকে তার বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন তা বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব বৈষম্য সংঘটিত হয় তা হলো নিয়োগকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি, মজুরির হার, পদোন্নতি, প্রান্তিক সুবিধাসমূহ প্রভৃতি। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের তিনটি আবশ্যিক উপাদান রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.২.১ অসম আচরণ: যদিও বৈষম্য অসম আচরণের একটি রূপ তবুও সকল অসম আচরণ বৈষম্য নয়। কোনো নিয়োগকর্তা যদি পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে পছন্দ বা অগ্রাধিকার দেয় তবে তা হবে সমতার নীতি লঙ্ঘন যা কোনভাবেই বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বৈষম্য তখনই হবে যখন (১) বৈষম্য এমন সিদ্ধান্তকে অন্তর্ভুক্ত করে যা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির নিয়োগ বা নিয়োগের শর্ত বা নিয়োগের মর্যাদা ও অবস্থাকে প্রভাবিত করে; (২) অসম আচরণের কারণে অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ,

ধর্ম, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে এরিস্টটল বলেন, "… equals are treated unequally and also when unequals are treated equally."[৭] এরিস্টটলের মতে, সম আচরণ পাওয়ার উপযোগীকে যদি অসমভাবে বিবেচনা করা হয় এবং অসম আচরণ পাওয়ার উপযোগীকে যদি সমভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলেই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি মনে করেন সম আচরণ পাওয়ার উপযোগীকে সমভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং অসম আচরণ পাওয়ার উপযোগীকে অসমভাবে বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ Equals should be treated equally and unequals unequally। যেমন একজন দক্ষ শ্রমিক যিনি দৈনিক ছয়টি প্যান্ট তৈরি করতে পারেন এবং অন্য শ্রমিক দৈনিক তিনটি প্যান্ট তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে উভয়ের সমান বেতন হওয়া সমীচীন নয়। যদি প্রতিষ্ঠান তিনটি প্যান্ট তৈরি করতে পারা শ্রমিককে বেশি বেতন প্রদান করেন তবে তা হবে বৈষম্য। কারণ এখানে ছয়টি প্যান্ট তৈরি করতে পারেন শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে উপক্ষা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৫.২.২ প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারকদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত: অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের কারণে কোন কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং বিরূপ সিদ্ধান্তের কারণে ভুক্তভোগী কর্মচারী-কর্মকর্তার কর্মজীবন বিপর্যস্ত বা বিপন্ন হয়। যেমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা যখন কর্মীদের ন্যায্য বেতন, ভাতা, পদোন্নতি, জীবন যাত্রার মান, চাকুরিচ্যুতি প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করে তখন সেটি চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করবে।

৫.২.৩ পূর্ব ধারণা প্রসূত: কোন প্রতিষ্ঠান যখন কোন ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, বর্ণ বা লিঙ্গ সংক্রান্ত অযৌক্তিক বিশ্বাস, কিংবা গোত্র বা শ্রেণীর প্রতি নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কোনো ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে কর্মচারী-কর্মকর্তার স্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তা চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে। যেমন মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা কর্মক্ষেত্রে বেশি দক্ষ, বর্ণবাদ, প্রথা, ধর্ম প্রভৃতির কারণে একই চাকুরিতে যখন কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা ভিন্ন ভিন্ন বেতন পান তখন তা চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করে।
উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, চাকুরি বৈষম্যের ইতিহাস অত্যন্ত পুরাতন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বহু গোষ্ঠী চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে ক্যাথলিক ও ইহুদি সম্প্রদায়; জাতিগোষ্ঠী হিসেবে ইতালিয় এবং আইরিশ বংশোদ্ভূত নাগরিকগণ; বর্ণগতভাবে কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয় এবং হিস্পনিকগণ; এবং লিঙ্গগতভাবে নারী এবং সমকামীগণ বহুবছর ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। যেহেতু বৈষম্যের ধরন বহুমাত্রিক

তাই কেবলমাত্র একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সমাধান দেয়া কঠিন। ফলে বৈষম্যের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত বিষয় যেমন লিঙ্গ, ধর্ম, জাতীয়তা, বয়স, প্রতিবন্ধী, প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর অধিকতর স্পষ্টতা প্রয়োজন। এসব বিষয়ের মাধ্যমে কীভাবে চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য সংঘটিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৮]

৫.২.৪ **লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য:** কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা পুরুষ অথবা নারী এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয় যা কিনা যৌন সংক্রান্ত নয়। তবে লিঙ্গ বৈষম্য সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানে নারীদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ কারণে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক নরম্যান ই. বাউই এবং আমেরিকার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালী লেখক মেগ স্নেইডার তাঁদের *Business Ethics for Dummies* গ্রন্থে বলেন, “Gender discrimination usually (but not always) invoves less favorable treatment of women in workplace.”[৯] যেমন একজন নিয়োগকর্তা বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনা করে বিবাহিত প্রতিযোগিদের নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার দিতে পারেন। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ বা নারীকে নিয়োগ দেয়ার অগ্রাধিকার চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ একজন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর কাজের যোগ্যতা বা দক্ষতার সাথে বৈবাহিক অবস্থার সাথে কোন অপরিহার্য সম্পর্ক নেই।

৫.২.৫ **ধর্মভিত্তিক বৈষম্য:** জাতি কিংবা লিঙ্গগত বৈষম্যের চেয়ে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য ভিন্ন। ধর্মভিত্তিক বৈষম্যের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারীদের নিয়োগ দিতে অনীহা প্রকাশ করে। কর্মক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য মূলতঃ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কর্মীদের ধর্ম চর্চার মধ্যে দ্বন্দ্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন কর্মীরা কখনো কখনো ধর্ম পালনের কিংবা চর্চার জন্য কর্মঘণ্টার সূচি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু নিয়োগ কর্তা যদি কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন ধর্মের বিশ্বাস ও অনুশীলনের কারণে চাকুরি প্রদান, পদোন্নতি তথা ধর্ম চর্চা বা প্রার্থনার জন্য অনুমতি প্রভৃতি পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে আপত্তি প্রদান করেন তবে তা চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ প্রথমত: ধর্ম বিশ্বাসের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতার কোন সম্পর্ক নেই। যে কারণে উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ বা পদোন্নতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত: ধর্ম বিশ্বাস একজন ব্যক্তির অধিকার। সুতরাং ধর্ম বিশ্বাসকে পেশার সাথে সম্পৃক্ত করা হলে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যাহত হবে।

৫.২.৬ জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্য: জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্য জাতি, বর্ণ এবং কিছু ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক বৈষম্যকেও ছাড়িয়ে যায়। জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্যে আবেদনকারী বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। এই ধরনের বৈষম্যে ব্যক্তির জাতীয়তা, পূর্বপুরুষ, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি উপাদানসমূহ বিবেচনা করে নিয়োগকর্তা যদি কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে তবে তা চাকুরি ক্ষেত্রে জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন কোন নিয়োগকর্তা তার প্রতিষ্ঠানে স্বজাতীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারেন যা বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু তিনি যখন সমযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একজন ইউরোপিয়ানকে নিয়োগ দেন এবং অন্যজনকে আফ্রিকান বিবেচনা করে নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকেন তখনই তা চাকুরি ক্ষেত্রে জাতীয়তাকেন্দ্রিক বৈষম্য বলে বিবেচিত হবে।

৫.২.৭ বয়স বৈষম্য: একজন নিয়োগকর্তা যখন বয়স্ক কর্মী থেকে একজন তরুণ কর্মীকে অনেক বেশি দক্ষ, কর্মক্ষম ও সৃজনশীল বলে বিবেচনা করেন তখনই বয়স বৈষম্য সংঘটিত হয়। বার্ধক্যবিদ্যায় পণ্ডিত আমেরিকার চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, প্রভাবশালী লেখক এবং ন্যাশনাল ইনস্টিউট অন এজিংয়ের (National Institute on Aging) প্রথম পরিচালক রবার্ট এন. বাটলার প্রথম বয়স বৈষম্য শব্দটি ব্যবহার করেন।[১০] যেমন তরুণ কর্মীদের কম মজুরিতে নিয়োগ দেয়া যায় এবং বয়স্ক কর্মীদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা তরুণদের তুলনায় অধিক প্রদান করতে হয় বলে নিয়োগকর্তা যদি কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত তরুণ ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করে তখন তা বয়স বৈষম্য বলে বিবেচিত হয়।

৫.২.৮ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য: চাকুরি ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা যখন শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায্য আচরণ করেন তখন তা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত। যেমন নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা যদি শর্ত প্রদান করেন যে তাঁর অক্ষমতার জন্য সে অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মজুরি পাবেন তাহলে সেটা বৈষম্যকরণের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

চাকুরি বৈষম্যের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ: American Broadcasting Company (ABC) কয়েক বছর পূর্বে চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার পায় কিনা এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিল। এজন্য তারা ক্রিস এবং জুলি নামের একজন পুরুষ এবং একজন নারীকে নির্বাচন করে। উভয়ই ছিলেন স্বর্ণকেশী, সুদর্শন, পরিপাটি এবং সমশিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। উভয়েরই বয়স ছিল বিশের কোঠায়। পত্রিকায় 'পদশূণ্য' বিজ্ঞাপন দেখে উভয়কেই একই প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকারের জন্য

পাঠানো হয় এবং প্রতিবার সাক্ষাৎকারে পাঠানোর পূর্বে তাদের পোশাকে গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন যুক্ত করে দেয়া হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল 'বিভিন্ন ধরনের পদে জনবল নিয়োগ করা হবে।' জুলি উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে সাক্ষাৎকার দিতে গেলে তাকে বলা হয় শুধুমাত্র ফোনকল রিসিভারের পদ শূন্য রয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরে ক্রিসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ তখন ক্রিসকে ব্যবস্থাপনা খাতে চাকুরির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে ABC ক্রিস এবং জুলির সাক্ষাৎকার গ্রহীতার মুখোমুখি হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহীতা উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কখনো চাইবো না যে একজন পুরুষ আমার ফোন রিসিভ করুক।" অন্য একটি প্রতিষ্ঠান 'Lawn-Care' সার্ভিসের জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু জুলির সাক্ষাৎকারের সময় তাকে রিসিপশনিস্টের চাকুরি এবং ঘন্টায় ৬ ডলার পারিশ্রমিকের বেতনের চাকুরির প্রস্তাব দেয়া হয়। সাক্ষাৎকারের সময় জুলির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং একটি মুদ্রাক্ষরিক পরীক্ষা নেয়া হয়। অন্যদিকে, ক্রিসের সাক্ষাৎকারের সময় তার সাথে দৈহিক যোগ্যতা বা উপযুক্ততা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ক্রিসের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেয়া হয়। তারপর তাকে সপ্তাহে ৩০০-৫০০ ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে 'Lawn-Care' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যখন ABC প্রতিষ্ঠানটি মুখোমুখি হয়েছিল তখন 'Lawn-Care' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, "do not do well [women] as territory managers, which involves some physical labor."[১১] 'Lawn-Care' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আঞ্চলিক ব্যবস্থপক পদের চাকুরিতে যেহেতু শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে তাই নারীর পক্ষে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পদে চাকুরি করা কঠিন। ABC কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, চাকুরিক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। বর্ণ বৈষম্য নিয়েও একই রকম গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং ফলাফলেও অনুরূপ চিত্র ফুটে ওঠে। ১৯৯০ এর দশকে Urban Institute-এর গবেষকগণ সব দিক দিয়ে সমযোগ্যতা সম্পন্ন একদল শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিক পুরুষ নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিক পুরুষগণ ৫০ শতাংশ কম চাকুরির প্রস্তাব পেয়েছিল। ২০০৩ সালে নিম্ন আয়ের চাকুরিগুলোর ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ যুবক আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছিলন যে তিনি ১৮ মাসের জন্য জেলে সাজা ভোগ করেছেন। অন্যদিকে, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরা প্রত্যেকে পরিচ্ছন্ন রেকর্ডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফলাফলে দেখা যায় সাজা ভোগ করার কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গগণ ১৭ শতাংশ ক্ষেত্রে

সাক্ষাৎকারের ডাক পেয়েছেন। অন্যদিকে, পরিচ্ছন্ন অতীত থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গগণ মাত্র ১৪ শতাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের জন্য চিঠি পেয়েছেন। ২০০৩ সালে আরেকটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সেখানে 'চাকুরি চাই' লিখে পত্রিকায় বিভিন্ন নামে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। অর্ধেক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের নাম (যেমন Emily এবং Greg) এবং বাকি অর্ধেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণঙ্গদের নাম (যেমন Lakisha এবং Jamal) ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলাফলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণাঙ্গ নামের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ নামের ক্ষেত্রে ৫০% বেশি প্রতিউত্তর পাওয়া যায়।[১২] উপরের উদাহরণগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যকরণ একটি প্রকট সমস্যা যা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।

৫.৩ আন্তর্জাতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে বৈষম্য: বৈষম্যমূলক আচরণের নানা ধরন থাকতে পারে। বৈষম্য কখনো কখনো ব্যক্তিগত কারণে আবার কখনো কখনো প্রাতিষ্ঠানিক কারণেও সংঘটিত হতে পারে। আবার কোন কোন সময় ইচ্ছাকৃত ও কোন সময় সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেও সংঘটিত হতে পারে। কোনো বৈষম্য উদ্দেশ্যমূলক নাকি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং অনুদ্দেশ্যমূলক নাকি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা তা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা যেতে পারে। এখানে উদ্দেশ্যমূলক বলতে বোঝানো হয়েছে জ্ঞাতসারে বা সচেতনভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত হওয়াকে। আবার অনুদ্দেশ্যমূলক বলতে বোঝানো হয়েছে পূর্বপরিকল্পনাবিহীন বা অজ্ঞাতসারে বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত হওয়াকে। প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যবসায়, কোম্পানি, কর্পোরেশন, পেশা বা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যেখানে বৈষম্য ক্রিয়াশীল থাকে।[১৩] এই ধরনের প্রভেদের উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের চারটি ধরনের কথা উল্লেখযোগ্য যা নিম্নে আলোচিত হলো:

৫.৩.১ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকৃত বৈষম্য: কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকৃত বৈষম্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভিনসেন্ট ব্যরি তাঁর *Moral Issues in Business* গ্রন্থে বলেন, "Intentional individual discrimination is an isolated act of discrimination knowingly performed by some individual out of personal prejudice."[১৪] অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলক ব্যক্তিগত বৈষম্য হলো বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত এক ধরনের বৈষম্য যা ব্যক্তিগত পূর্ব ধারণা থেকে স্বজ্ঞানে কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যক্তিগত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন একক ব্যক্তির আচরণের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে না। অর্থাৎ এটি একটি 'ব্যক্তিনিষ্ঠ' ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ

পূর্বে উল্লিখিত ABC প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, চাকুরি প্রত্যাশী নারী প্রার্থীর প্রতি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পুরুষ সদস্যের আচরণ উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে, কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। আবার, কোন পুরুষ কর্মকর্তা জ্ঞাতসারে মনে করতে পারেন যে, নারী মালিক বা কর্মকর্তা বিরক্তিকর যা কর্মস্থলের জন্য সহায়ক পরিবেশ নাও হতে পারে।

৫.৩.২ ব্যক্তিগত অনিচ্ছাকৃত বৈষম্যঃ বৈষম্য সবসময় ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয় না বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেও ঘটে থাকে। ভিনসেন্ট ব্যরির মতে, "Unintentional individual discrimination is an isolated act of discrimination performed by some individual who unthinkingly or unconsciously adopts traditional practices and stereotypes."[১৫] অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত ব্যক্তিগত বৈষম্য হলো এক ধরনের আচরণ যা পূর্বপরিকল্পিত না হয়ে অসচেতনভাবে প্রথাগত অনুশীলনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন অনেক ব্যবস্থাপক নিজের অজান্তেই নারী কর্মীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন যেটি তাঁর প্রতিষ্ঠানের নীতি বহির্ভূত। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের অধীনে কাজ করতে পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হীনমন্যতায় ভোগেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পুরুষ কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা নারী কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে অথবা নির্দেশ মানতে পছন্দ করে না।

৫.৩.৩ ইচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যঃ কোন কোন সময় বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবেই দেখা যেতে পারে। ইচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভিনসেন্ট ব্যরি বলেন, "Intentional institutional discrimination is an isolated act of discrimination that is part of the reactive behavior of a company or profession which knowingly discriminates out of the personal prejudices of its members."[১৬] ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য হলো এক ধরনের বৈষম্যমূলক কাজ যা প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের মাধ্যমে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ব্যক্তিগত কুসংস্কারের কারণেও সংঘটিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ নামক বেসরকারি ব্যাংকটি তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন গ্রহণের সময় থেকেই দুই জন ইসলামী চিন্তাবিদের সুপারিশ বাধ্যতামূলক করেছিল। কিন্তু ইসলামী ব্যক্তিত্বের সুপারিশের বিষয়টি পেশাগত দক্ষতার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক বহন করে না। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর এইরূপ প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তটি অন্যান্য ধর্মের ব্যক্তিদেরকে চাকুরিতে আবেদন করার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করে যা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

৫.৩.৪ **অনিচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যঃ** প্রতিষ্ঠান যে সবসময় ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তা ঠিক নয়। কোন কোন সময় প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য প্রসঙ্গে বলা যায়, "Unintentional institutional discrimination is an isolated act of discrimination that is part of the routine behavior of a company or profession that has unknowingly incorporated sexually or racially prejudicial practices into operating procedures."[১৭] এ বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, লিঙ্গ বা জাতিগত বৈষম্যমূলক কাজ অনেক সময়ই প্রতিষ্ঠানের অজান্তেই ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবেই নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি পরিহার করে চলে। কারণ প্রতিষ্ঠান মনে করে যে, নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পেলে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে না। আবার, অনেক প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিক বা সংখ্যালঘুদের তুলনামূলক কম মজুরী প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই কম মজুরি প্রদান করাটা যে একটি বৈষম্যমূলক আচরণ তা হয়তো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উপলদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে নানা রকম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন আমেরিকার সমাজে নারীর সমতা বিষয়ক একটি জরিপের কথা বলা যেতে পারে। নারীরা অনেক পেশায় উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নারী চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ থেকে ১৬.৯ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত নারী আইনজীবী এবং বিচারকের সংখ্যা শতকরা ৫.৮ থেকে ২২.৭ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকৌশলী নারীর সংখ্যা শতকরা ১.৩ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপিও নারীদের কম মজুরী প্রদান করা সহ কম মর্যাদা সম্পন্ন চাকুরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত উঁচু বেতনের চাকুরি ও নির্বাহী পদে পুরুষের তুলনায় নারীদের উপস্থিতি কম। প্রশাসনিক সহায়তা ও সেবা খাতের চাকুরির ৪০ শতাংশ মার্কিন স্থানীয় নারীর দ্বারা পূরণ করা হয় যেখানে এই সমস্ত চাকুরিতে ১৬ শতাংশেরও কম পুরুষ নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপকের পদগুলোতে ৬৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সেখানে নারী রয়েছে শতকরা মাত্র ২৫ জন। সংখ্যালঘু পুরুষ শতকরা ৬.৫ জন এবং সংখ্যালঘু নারী শতকরা ৪ জনেরও কম। প্রধান কর্পোরেশনগুলোতে সিনিয়র লেভেলে শতকরা ৫ জনেরও কম নারী রয়েছে।[১৮]

লিঙ্গ এবং জাতিভেদে আমেরিকান সমাজে মজুরীর অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালের এক জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে নারীদেরকে পুরুষের মজুরীর ৭৫ শতাংশ প্রদান করা হয়। আবার ১৯৯৩ সালের এক জরিপে লক্ষ্য করা যায় যে শ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে পুরুষের মজুরীর ৭০.৮ শতাংশ, কৃষ্ণাঙ্গ নারীদেরকে পুরুষের মজুরীর ৬৩.৭ শতাংশ এবং হিস্পানিক নারীদেরকে পুরুষের মজুরীর ৫৩.৯ শতাংশ প্রদান করা হয়। সমযোগ্যতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সহকর্মী থেকে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মজুরী পেয়ে থাকেন।[১৯]

সংখ্যালঘু কর্মীদের অবস্থা আরোও শোচনীয়। ১৯৪০ এর দশকে যেখানে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা ১ ডলার আয় করত সেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা মাত্র ৪০ সেন্ট উপার্জন করত। এমনকি নব্বই এর দশকেও কৃষ্ণাঙ্গদের মজুরি শ্বেতাঙ্গদের মজুরির ৭৫ শতাংশ প্রদান করা হতো। এছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গদের বেকারত্বের হার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং শ্রম শক্তির অংশগ্রহণেও তারা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বহুলাংশে পিছিয়ে ছিল। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতির কারণে এই ধরনের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গদের বেকারত্বের হার এখনও ৬ থেকে ৭ শতাংশ এবং যুবাদের বেকারত্বের হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। শ্বেতাঙ্গদের সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে কৃষ্ণাঙ্গদের বেকারত্বের হার এখনও শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী।[২০]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এসব বৈষম্য কোনটি ব্যক্তিগত, কোনটি অনুদ্দেশ্যমূলক, কোনটি অনুদ্দেশ্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য যা উপরে উল্লিখিত জরিপের তথ্য দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে। চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজের অনুপ্রেরণাকে বাঁধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, আইনগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনভাবেই চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য কাম্য নয়। বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে কেউ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখে দেয় এবং প্রতিষ্ঠানও তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়।

৫.৪ বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিধি: কোনো প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে কি না বা কতটুকু বৈষম্য রয়েছে তা জানার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তথ্য-উপাত্ত বা পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য আছে কিনা বা

থাকলে তার মাত্রাগত দিক চিহ্নিত করার জন্য ভেলাসকোয়েজ তিন ধরনের মানদণ্ডের কথা বলেন যা নিম্নরূপ:[২১]

- প্রথমত: বৈষম্যের শিকার হওয়া গোষ্ঠির সদস্যদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্যদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিশ্লেষণ;
- দ্বিতীয়ত: নিম্নস্তরের পদগুলোতে বৈষম্যের শিকার হওয়া গোষ্ঠির সদস্যদের উপস্থিতির অনুপাত এবং একই পদ মর্যাদার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপস্থিতির অনুপাতের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ; এবং
- তৃতীয়ত: উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের শিকার হওয়া গোষ্ঠির সদস্যদের উপস্থিতির অনুপাত এবং একই পদ মর্যাদার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপস্থিতির অনুপাতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

ম্যানুয়াল জি. ভেলাসকোয়েজ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার বিভিন্ন চাকুরি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে লিঙ্গ এবং বর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান। তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

গড় আয়ের তুলনা: বৈষম্য নির্ণয়ের সবচেয়ে কার্যকর নির্দেশক হচ্ছে গড় আয়ের তুলনা। নিম্নে ম্যানুয়াল জি, ভেলাসকোয়েজ তাঁর *Business Ethics: Concepts and Cases* গ্রন্থ অনুসারে এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হলো:

টেবিল-১: Average family incomes by race and as percent of white (in current dollars), alternate years[২২]

Year	White family income	Black family income	Hispanic family income	Black as % of white	Hisponic as % of white
2001	$73,496	$43,938	$45,229	60	62
1999	68,363	42,793	41,890	63	61
1997	62,308	36,504	37,783	59	61
1995	55,971	34,011	32,654	61	58
1993	51,467	30,036	31,109	58	60
1991	46,715	27,571	29,998	59	64
1989	44,672	26,415	29,197	59	65

অশ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর তুলনায় শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর গড় আয় সবসময় বেশি। অনেকে মনে করেন কয়েক দশক আগের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর গড় আয়ের পার্থক্য অনেক কমে এসেছে। কিন্তু

লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই পার্থক্য পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় ১৯৮৫ এর পর থেকে শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর আয় সে তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। যেমন ১৯৮৫ সালে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল শ্বেতাঙ্গদের গড় আয়ের ৬১ শতাংশ। কিন্তু ২০০১ সাল নাগাদ এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশে।

টেবিল-২: Average earning of men and women (in current dollars), alternate years[২৩]

Year	Male earnings	Female earnings	Female as % of male
2001	$51,535	$35,370	69
1999	47,532	31,116	65
1997	43,678	29,244	67
1995	40,359	26,531	66
1993	38,027	25,303	67
1991	34,354	22,949	67
1989	33,010	21,039	64
1987	29,918	18,856	63
1985	27,414	17,028	62
1983	24,594	15,157	62
1981	22,196	13,112	59

গড় আয়ের দিক থেকে নারীরা অনেক বৈষম্যের শিকার। তবে পূর্বের তুলনায় নারী-পুরুষের গড় আয়ের পার্থক্য কিছুটা কমে এসেছে। যেমন সারণিতে দেখা যায় ১৯৮১ সালে নারীদের গড় আয় ছিল পুরুষের গড় আয়ের মাত্র ৫৯ শতাংশ। কিন্তু ২০০১ সাল নাগাদ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। তবে গড় আয়ের পার্থক্য কমে আসার মূল কারণ পুরুষের গড় আয়ের নিম্নগামীতা (বৈষম্য হ্রাস নয়)। ইতিবাচক কর্মসূচী চালু হওয়ার ১০ বছর পরে নারী পুরুষের প্রারম্ভিক বেতন নিয়ে তথ্য ভিত্তিক গবেষণা করা হয়। ১৯৭৬ সালের ঐ গবেষণা অনুযায়ী সদ্য পাশ করা নারী স্নাতকদের প্রারম্ভিক গড় আয় ছিল $৯৭৬৮। অন্যদিকে, সদ্য পাশ করা পুরুষ স্নাতকদের গড় আয় ছিল $১০২৩৬। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮০ সালে শ্বেতাঙ্গ নারীর গড় আয় ১৯৭০ সালের পরিমাণ থেকে ৩ শতাংশ কমে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের আয়ের ৮৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একই পরিসংখ্যানানুযায়ী ঐ সময়ের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মদক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় ঐ সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

টেবিল-৩: Percent of Whites Blacks, and Hispanics living in poverty, 1978-2002, alternate years[২৪]

Year	% Whites in poverty	% Blacks in poverty	% Hispanics in poverty
2002	8	24	22
2000	7	23	22
1998	8	26	26
1996	9	28	29
1994	9	31	31
1992	10	33	30
1990	9	32	28
1988	8	31	27
1986	9	31	27
1984	10	34	28
1982	11	36	30
1980	9	33	26

১৯৮০র দশক থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই দারিদ্রতার কবলে পড়েছিল মূলত কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পনিক এবং এশীয় জাতিগোষ্ঠির পরিবারগুলো। উপরে উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যায় শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দারিদ্রতার হার ২ থেকে ৩ শতাংশ বেশি।

টেবিল-৪: Median weekly earnings of selected occupations and percent of men and women in those occupations, 2002[২৫]

Occupation	Weekly earnings	Percent of total occupation who are	
		Men	Women
Child-care workers	$251	1	99
Receptionists	429	3	97
Typists	432	5	95
Bookkeepers	502	8	92
Licensed practical nurses	571	7	93
Legal assistants	642	18	82
Finacial processing supervisors	718	19	81
Clinical lab technicians	664	25	75
Personnel managers	970	35	65
Accountants	799	40	60
Physicians' assistants	1,031	42	58
Management analysts	1,077	54	46
College teachers	1,028	62	38
Marketing managers	1,115	64	36
Lawyers	1,492	66	34
Physicians' assistants	1,475	69	31
Computer systems analysts	1,125	73	27
Electrical engineers	1,222	89	11
Aerospace engineers	1,365	90	10
Airplane pilots	1,245	95	5

উপরের প্রদত্ত তথ্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মাঝারি বেতনের চাকুরিগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ যত বেশি তাদের বেতন ভাতা তত কম। অন্যদিকে যেসব পেশায় পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি ঐসব পেশায় আয়ও তত বেশি (যদিও অনেক ব্যতিক্রম বিদ্যমান)। তাহলে বলা যায় চাকুরির বাজারে নারীরা মূলত তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের চাকুরিগুলোতে অংশ নিয়ে থাকেন। কিন্তু বিগত দুই দশকে গুরুত্বপূর্ণ চাকুরিগুলোতে বহু নারী যোগ দিয়েছেন কিন্তু একই সাথে এটাও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারী কর্মীগণ তেমন কোনো পদোন্নতি পান না। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি 'গ্লাস সিলিং' (Glass Ceilling) হিসেবে বিবেচিত। ইন্ডিয়ার নিউ দিলহীর রুকমিনি ডেভি ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড স্টাডিজের (Rukmini Devi Institute of Advanced Studies - RDIAS) সহকারী অধ্যাপক সাক্ষী গোপ্তা তাঁর "Glass Ceiling in 21st Century: Women in Management" প্রবন্ধে বলেন 'গ্লাস সিলিং' শব্দটি ১৯৮৬ সালের ২৪ শে মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্যবসায় কেন্দ্রিক দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা Wall Street Journal-এর দুই জন বিশেষ প্রতিবেদক প্রখ্যাত গবেষক, লেখক, সাংবাদিক ক্যারল হাইমোয়িজ এবং টিমোথী শ্যালার্ট ব্যবহার করেন।[২৬] সাধারণত সমাজের ধারণা হলো নারীদের স্থান আপন নিবাসে (Women's place is at home)। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহী পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাঁধাই হলো 'গ্লাস সিলিং'। অর্থাৎ পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারী কর্তৃক সম্মুখীন সমস্যাবলীই 'গ্লাস সিলিং' নামে বিবেচিত। ফলে, নারী এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত কর্মীদের পদোন্নতি লাভের এমন অদৃশ্য, দুর্ভেদ্য বাঁধাকেই 'গ্লাস সিলিং' হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীরা যেসব অদৃশ্য বাঁধার সম্মুখীন হয় তা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:[২৭]

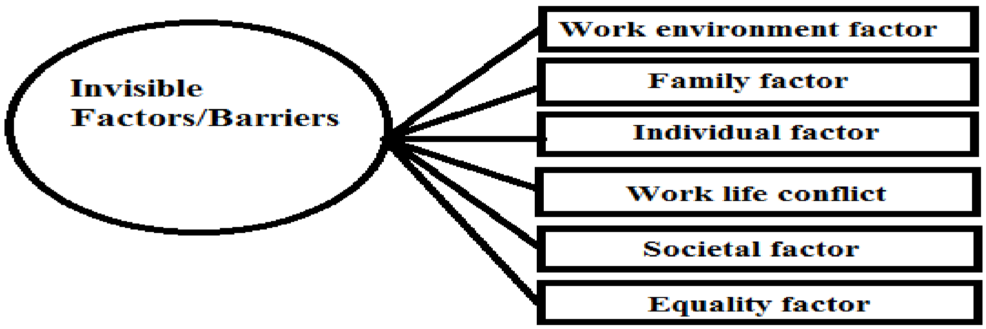

Figure: Invisible barriers women face in organisational settings

উচ্চ বেতনের চাকুরিগুলোতে নারীদের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে, নারীরা স্বেচ্ছায় তুলনামূলক কম বেতন ও কম সম্মানের চাকুরিতে যোগদান করেন। নারীরা মনে করেন যে, গুটিকয়েক চাকুরিই তাদের জন্য উপযুক্ত। যেমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহকারী, স্কুল শিক্ষক, অভ্যর্থনা ইত্যাদি। তারা বিশ্বাস করেন যে এসব পদে চাকুরি করলে সন্তান লালনপালন সহ বিভিন্ন পারিবারিক কাজ করার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে। এ কথা সত্য যে অনেক নারী উচ্চতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এসব চাকুরিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, উচ্চ পদের চাকুরিতে নারীদের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা হিসেবে এটি যথেষ্ট নয়। কেননা, স্বেচ্ছায় তুলনামূলক নিম্ন পদের চাকুরিতে যোগ দেয়া নারীর সংখ্যা মোট কর্মজীবী নারীদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

১৯৯০ এর দশক থেকে বিভিন্ন কারণে নারী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠিগুলোর জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কারণ দুই দশক আগেও চাকুরি বাজার প্রায় সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং শ্রমিক সংখ্যাও বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৮৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে নতুন কাজে যোগ দেয়া শ্রমিকদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক হিসেবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তুলনায় নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ বেশি যোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য, ঐ সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দেয়া নতুন শ্রমিকদের তিন-পঞ্চমাংশই নারী। বর্তমান সময়ে নতুন শ্রমিকদের প্রায় ৪০ শতাংশই স্থানীয় সংখ্যালঘু এবং অভিবাসী জনগণ। নারী ও সংখ্যালঘু জনগণের বিশাল এই জনগোষ্ঠী চাকুরির বাজারে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: [২৮]

- প্রথমত: ইতোমধ্যেই আমরা আলোচনা করেছি যে, অনেক নারী নিম্ন বেতনে তথাকথিত ‘নারী সুলভ’ চাকুরি করতে বাধ্য হয়ে থাকেন।
- দ্বিতীয়ত: চাকুরিতে যোগদানের পর পদোন্নতি লাভের ক্ষেত্রে তথাকথিত ‘গ্লাস সিলিং’র সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট কিংবা ভাইস প্রেসিডেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের ৯০ শতাংশই পুরুষ। আবার কোন কোন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এসব পদে নারীদের পদোন্নতি পাওয়ার হার প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। যেমন বর্তমানে Fortune 500 প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের মাত্র ২ শতাংশ নারী যা সম্পূর্ণ অনৈতিক।
- তৃতীয়ত: প্রত্যেক নারীই মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে চান। কিন্তু সন্তান নিতে চান এমন নারীরা তাদের ক্যারিয়ারে বিশাল বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে,

প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে পদোন্নতি পাওয়া নারীর মধ্যে ৫২ শতাংশ নারীই সন্তানহীন। অন্য একটি পরিসংখ্যানুযায়ী স্নাতক পাশ করার ১০ বছরের মধ্যে যেসব নারী ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের শতকরা ৫৪ জনই ঐ ১০ বছর সন্তানহীন ছিলেন। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে কর্মজীবী নারীরা তাদের স্বামীদের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা পুরুষের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে বেশি বাঁধার অথবা বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যরাও বিভিন্ন রকম বাঁধার সম্মুখীন হন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অধিকাংশ সংখ্যালঘু জনগণ চাকুরিক্ষেত্রে সাধারণত কর্মী বা শ্রমিক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর তারা আবিষ্কার করেন যে অধিকাংশ উন্নত চাকুরিতেই উচ্চ কর্মদক্ষতা ও উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন কর্মী চাওয়া হয়। কিন্তু বৈষম্যের শিকার হয়ে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে যোগদান করা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সাধারণত এর কোনোটিই থাকে না। বিগত কয়েক দশকে যেসব চাকুরির বাজার তৈরী হয়েছে সেগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে হাইস্কুলের পরে অন্তত একটি ডিগ্রি বা স্নাতক ডিগ্রি চাওয়া হয়। বিগত কয়েক দশক যেসব ক্ষেত্রে চাকুরির বাজার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলোতে অত্যন্ত উচ্চ ডিগ্রিধারী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। যেমন প্রযুক্তিবিদ, প্রকৌশলী, সমাজবিজ্ঞানী, আইনজীবী, গণিতবিদ, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশাধারী মানুষের উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। এমনকি মাঝারি মানের চাকুরিগুলোর ক্ষেত্রেও (যেমন ব্যক্তিগত সহকারী, অফিস সহকারী, ক্যাশিয়ার) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ডিগ্রিসহ বিভিন্ন ডিগ্রি চাওয়া হয়। অন্যদিকে, যেসব পেশায় তুলনামূলক কম শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার পড়ে সেগুলোর বাজার দিনে দিনে সংকোচিত হয়ে আসছে। যেমন ম্যাশিন অপারেটর, কায়িক শ্রমজীবী, খনি শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি। কিন্তু দু:খজনক হলেও এ কথা সত্য যে সংখ্যালঘু জনগণ কর্মদক্ষতা ও উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অনেক কম সুযোগ পেয়ে থাকেন। কর্মদক্ষতা সংক্রান্ত এক গবেষণায় দেখা গেছে তিন-পঞ্চমাংশ শ্বেতাঙ্গ, দুই-পঞ্চমাংশ হিস্পানিক এবং এক-চতুর্থাংশ কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ নিউজ আর্টিকেল থেকে কাঙ্খিত তথ্য খুঁজে বের করতে সক্ষম; মাত্র ২৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, ৭ শতাংশ হিস্পানিক, এবং ৩ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ বাসের সূচী অনুধাবন করতে সক্ষম। কর্মদক্ষতার ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পিছিয়ে রয়েছে। পরিসংখ্যানানুযায়ী ২০০৩ সালে ৯৪ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, মাত্র ৮৮ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, এবং মাত্র ৬২ শতাংশ হিস্পানিক শিক্ষার্থী হাইস্কুল ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। একই বছরে ৩৪ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, ১৭ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, এবং ১১ শতাংশ

হিস্পানিক শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে শিক্ষা ও দক্ষতায় পিছিয়ে থাকার কারণে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী চাকুরিক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ছে।[২৯]

আমেরিকার সমাজ ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায়ও চাকুরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ২০১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর *দৈনিক যুগান্তর* অনলাইন ভিত্তিক সংস্করণে একটি সংবাদ পরিবেশন করে। প্রকাশিত সংবাদে দাবি করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় সংবাদ উপস্থাপক ক্যাট স্যাডলার ১১ বছর ধরে *ই-নিউজ* এর অ্যাঙ্কর হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ক্যাট জানতে পারেন যে, তিনি তার পুরুষ সহকর্মীর মতো একই কাজ করার পরও পুরুষ সহকর্মী জেসন কেনেডির তুলনায় অর্ধেক বেতন পান। কিন্তু *ই-নিউজ* এর মুখপাত্র অবশ্য ক্যাড স্যাডলার এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ কথা ঠিক যে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্যের প্রকৃতি এক নয়। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য প্রকট। যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অর্থনীতিবিদ স্টিভেন ক্যাপসস "The Gender Wage Gap in Bangladesh" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্যের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষ সহকর্মী তার নারী সহকর্মীর তুলনায় প্রতি ঘণ্টায় ২১ শতাংশ বেতন বেশি পায়।[৩০] দৈনিক বা মাসিক বেতনের তুলনার ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার হন। যেমন সাবিনা নামের একজন নারী কর্মী ফার্মগেট এলাকার একটি বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন। মাস শেষে তাকে থাকা খাওয়াসহ ২৫০০ টাকা দেয়া হয়। কিন্তু নিরাপত্তা প্রহরী দেলোয়ারকে মাস শেষে থাকা খাওয়াসহ ৬০০০ টাকা দেয়া হয়। আবার পানের বরজে মাটি তোলার কাজে নারী শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২০০ টাকা যেখোনে একই কাজের জন্য একজন পুরুষ শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ৩০০ টাকা।[৩১] অন্য একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিনাজপুরের ধানের চাতালে কাজ করেন এমন নারী শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২০০ থেকে ৩০০ টাকা অথচ উক্ত কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। ২০১৫ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, কৃষিকাজে একজন পুরুষ শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২৯৯ টাকা এবং একজন নারী শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে পান ২২৬ টাকা। 'ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ' ও 'স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট'- এর যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে যে, ৫৬ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক পারিশ্রমিক হিসেবে গড়ে দৈনিক ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পান।

কিন্তু ৬১ শতাংশ নারী শ্রমিক দৈনিক পারিশ্রমিক হিসেবে গড়ে পান মাত্র ১০০ থেকে ২০০ টাকা। একই পরিস্থিতি ইটভাটা, পোশাক শিল্প, নির্মাণকাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।[৩২]

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার। যেমন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে ১২.০৮ শতাংশ ও শিল্প কারখানায় ২০.০৩ শতাংশ নারী শ্রমিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। আবার, লেবার ফোর্স সার্ভে অব বাংলাদেশ ২০১৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী নারী শ্রমিক প্রধান নির্বাহী, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, ও আইন প্রণেতা হিসেবে কাজ করছেন ১২.৯ শতাংশ। এক কথায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব ৮০ শতাংশই পুরুষ সহকর্মীর এখতিয়ারে থাকে।[৩৩] সর্বশেষ *দৈনিক প্রথম আলোর* ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অনলাইন সংস্করণে বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের উদ্যোগে প্রকাশিত গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে বাংলাদেশে বৈষম্য বাড়ছে এবং কাঙ্খিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। তারা দাবি করেছেন যে ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল মোট সম্পদের ১৮.৮৫ শতাংশ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে মোট সম্পদের ২৭.৮৯ শতাংশ। একইভাবে ১৯৯১-১৯৯২ সালের অর্থবছরে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল মোট সম্পদের ১ শতাংশের কিছু বেশি সম্পদ এবং ২০১৫-২০১৬ সালের অর্থবছরে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের হাতে মোট সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশে নেমেছে। এই সময়ের মধ্যে শীর্ষ ৫ শতাংশের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২১ গুণ যা সমাজের সামগ্রিক বণ্টনের বৈষম্যকে ইঙ্গিত করে। এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় ধনীরা ক্রমশঃ আরো সম্পদশালী হচ্ছে এবং গরীব মানুষ ধীরে ধীরে আরো সম্পদহীন বা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ৮ মার্চ, ২০১৯ সালের দৈনিক প্রথম আলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)- এর তথ্যের ভিত্তিতে "উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা বাড়ছে" শিরোনামে ২০১৩ ও ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত নারীর সংখ্যা ছিল ৪৪৯২ জন যার মধ্যে সেবা খাতে উচ্চ পদে কর্মরত ছিল ২৯৩৬ জন এবং শিল্প উভয় খাতে ছিল ২০০৬ জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নারীরা সেবা ও শিল্প খাতেই উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। অন্যদিকে, উক্ত প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তের আলোকে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত

নারীর পদসংখ্যা ২০১৩ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ২০১৩ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে কর্মরত নারীর সংখ্যা ছিল ৪৪৯২ জন এবং ২০১৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪০০০ জন যার মধ্যে সেবা খাতে উচ্চ পদে কর্মরত ১১০০০ জন এবং সেবা খাতে ৩০০০ জন। এখানেও পূর্বের ন্যায় দু'টি খাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ২০১৭ সালের উচ্চ পদে বিবিএসের তথ্য মতে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী ও উচ্চ পদে কর্মরত পুরুষের সংখ্যা ৯৭০০০ যা শতকরা হিসেবে ৮৭ শতাংশ। অন্যদিকে, উচ্চ পদে অর্থাৎ নির্বাহী পদে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা শতকরা হিসেবে মাত্র ১২.০৩ শতাংশ। সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় উচ্চ পদে নারীর আসন বৃদ্ধি পেলেও পুরুষের সাথে আনুপাতিক হার বিবেচনা করলে তা অতি নগণ্য যা চাকুরি ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকেই ইঙ্গিত করে।[৩৪]

সম্প্রতি কর্মক্ষেত্রে নারীরা ভয়াবহভাবে যৌন হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন যা কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য এক বিশাল বাঁধা। আমেরিকার একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মজীবী নারীদের ৪২ শতাংশ তাদের পুরুষ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন। যৌন হয়রানির শিকার হওয়া নারীদের মধ্যে নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, ডাক্তার, আইনজীবীর মতো পেশাজীবী নারীরাও রয়েছেন। যৌন হয়রানির সম্মুখীন হওয়া কর্মজীবী নারীদের অধিকাংশই স্নাতক ডিগ্রিধারী ও ২০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী, এবং তাদের অধিকাংশই পুরুষ প্রধান অফিসে কিংবা পুরুষ বসের অধীনে চাকুরি করে থাকেন। ৭০০০ কর্মজীবী মানুষের উপর পরিচালিত অন্য এক জরিপে দেখা গিয়েছিল যে তাদের ১০ শতাংশ নারী সহকর্মী কখনো না কখনো তাদের অফিসের কোনো না কোন পুরুষ সহকর্মী কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে শুনেছেন। এছাড়া প্রতিবছর আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের Equal Empoyment Opportunity Commission- এর নিকট হাজারো যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং রাজ্যগুলোর Civil Rights Commissions- এর নিকটও বহুসংখ্যক অভিযোগ করা হয়ে থাকে।[৩৫]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইতোমধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ করে আমেরিকার সমাজে চাকুরিক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বৈষম্য বিদ্যমান এবং অতীতে এই বৈষম্যের অধিকাংশই ছিল অনুদ্দেশ্যমূলক বৈষম্য। প্রধানত নারী এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত কর্মীগণ চাকুরিক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি বাড়লেও তারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব সমস্যা প্রধানত তিনটি যা নিম্নরূপ:

- (ক) নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ মূলত সাধারণ কর্মী বা শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। ফলে, উচ্চ পদের চাকুরিগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ কমে আসছে;
- (খ) কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি লাভের ক্ষেত্রে তারা তথাকথিত 'গ্লাস সিলিং' এর সম্মুখীন হয়ে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং
- (গ) নারী কর্মীগণ বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা ও কর্মদক্ষতার অভাবে প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে পড়ছেন।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামগ্রিকভাবে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে।

৫.৫ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি: আধুনিক সভ্য সমাজে বৈষম্য কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ প্রত্যেকেই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য সুস্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো: বৈষম্যমূলক আচরণ কি অনুচিত? উত্তর যদি সদর্থক হয় তাহলে প্রশ্ন হলো কীভাবে বৈষম্য দূর করা যায়? এ কথা অনস্বীকার্য যে, বৈষম্যমূলক আচরণ অনুচিত– অনৈতিক তো বটেই। কারণ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র বৈষম্যকে সংবিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেছে। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' শিরোনামে ২৮ এর ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth." বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন অনুমোদন করে না। আমেরিকান সংবিধানে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে, "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal and endowed by their creator with certain inalienable rights."[৩৬] আমেরিকান সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে যে, স্রষ্টা মানুষকে সমান মর্যাদা এবং কতিপয় অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে উক্ত সমাজে গৃহযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে দাস হিসেবে কেনাবেচা করা হতো। এসব মানুষের কোনো ধরনের আইনি, সামাজিক কিংবা শ্রম অধিকার ছিল না বরং তারা কেবলই তাদের মনিবের ব্যবহার্য বস্তু তথা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এমনকি সর্বোচ্চ আদালত মন্তব্য করেছিলেন, "beings of an inferior

order … and so far inferior that they had no rights that the White man was bound to respect."[৩৭] নারীদের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাদের ভোটাধিকার ছিল না, তারা চাকুরি করতে পারত না, তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না, তাদের মতামতের কোনো মূল্যই ছিল না। বৈষম্যের বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দেয়া হয় যেগুলো তিনটি প্রধান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যথা: (ক) উপযোগবাদী যুক্তি; (খ) অধিকার বিষয়ক যুক্তি এবং (গ) ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি। নিম্নে যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো:

৫.৫.১ উপযোগবাদী যুক্তি: উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই যুক্তি অনুযায়ী, সমাজে বিভিন্ন ধরনের চাকুরি রয়েছে এবং প্রতিটি চাকুরির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য ঐ সব ব্যক্তিকে নিয়োগ দেবে যারা দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা পেতে হলে সবচেয়ে দক্ষ বা মেধাবী মানুষকে নিয়োগ দেয়া প্রায়াজন। তাছাড়া সব মানুষই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ নন। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। জিনগতভাবে প্রতিটি মানুষই মানসিক ও দৈহিকভাবে একে অপর থেকে পৃথক। এই বিশেষত্বের কারণেই প্রতিটি মানুষ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। তাই কোনো ব্যক্তির কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চটুকু নিশ্চিত করতে হলে ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই তার দক্ষতা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। এভাবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হলে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তাই কোনো চাকুরিতে নিয়োগ কিংবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি মানুষের মেধাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু মেধার পরিবর্তে যখন বর্ণ, গোত্র কিংবা লিঙ্গ প্রাধান্য পায় তখন ঐ পেশা থেকে সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে, সমাজের মোট উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। উপযোগবাদী এই যুক্তির বিরুদ্ধে সাধারণত দুই ধরনের যুক্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৩৮]

- প্রথমত: উপযোগবাদী যুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য চাকুরির সাথে সম্পর্কিত যোগ্যতার ভিত্তিতেই জনবল নিয়োগ দেয়া উচিত। কিন্তু জনসাধারণের সর্বোত্তম মঙ্গল যদি চাকুরির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো যোগ্যতার উপর নির্ভর করে (যেমন কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে চাকুরি প্রদানের মধ্যে নিহিত থাকে) তাহলে উপযোগবাদী নীতি অনুযায়ী চাকুরির সাথে সম্পর্কিত যোগ্যতার ভিত্তিতে কাউকে চাকুরি দেয়া অনুচিত হিসেবে বিবেচ্য হবে। এমন ক্ষেত্রে উপযোগবাদী যুক্তিটি স্ববিরোধীতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

- দ্বিতীয়ত: কেউ কেউ মনে করেন, সমাজের সর্বোত্তম মঙ্গল লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যেমন নারীদের সহজাত গুণাবলী হলো পরিবার ও সন্তানদের দেখাশোনা করা। পক্ষান্তরে, পুরুষের বৈশিষ্ট্য হলো অর্থ উপার্জন করে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাই নারীদেরকে পুরোপুরি পারিবারিক কাজে এবং পুরুষদের অন্যান্য কাজে যুক্ত করা উচিত। কেননা, এভাবেই সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন হতে পারে যখন সমাজের সদস্যরা পারিবারিক ও কর্ম জীবন উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সামর্থ্য বা দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, উপযোগীবাদী যুক্তি নানাভাবে বিরোধীতার সম্মুখীন হলেও এই যুক্তির প্রবক্তাগণও বিভিন্নভাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ কেবল মাত্র চাকুরির সাথে সম্পর্কিত যোগ্যতার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ফলে, এই যুক্তি অনুযায়ী বৈষম্যের কারণে মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সম্ভব নয়। তারা বিভিন্ন গবেষণার সূত্রের আলোকে দাবি করেন যে, নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোনো নৈতিক পার্থক্য নেই। ফলে, যে কোন ধরনের বৈষম্যই চূড়ান্ত পরিণতিতে উৎপাদনশীলতাকে বিঘ্নিত করে যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র কারো জন্য কাম্য নয়।

৫.৫.২ অধিকার বিষয়ক যুক্তি: অধিকার সংক্রান্ত যুক্তিনুযায়ী বৈষম্যমূলক আচরণ অনুচিত। কেননা, বৈষম্যের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এই ধরনের যুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কান্টীয় যুক্তি। কান্টীয় নীতি অনুযায়ী কোনো মানুষকে কখনো নিছক উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় বরং মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কেননা, প্রতিটি মানুষই নিজের মাঝে পরম। অন্যভাবে বলা যায়, কান্টীয় নীতিনুযায়ী প্রত্যেক মানুষই নৈতিকভাবে স্বাধীন এবং পরস্পরের সমান। প্রত্যেকেরই এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেন কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়। কান্ট মনে করেন সকল মানুষেরই সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকার আছে এবং সকলকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু বৈষম্যমূলক আচরণ মূলত দু'ভাবে এই নীতিটিকে লজ্ঘন করে থাকে। যথা:[৩৯]

- প্রথমত: বৈষম্যমূলক আচরণে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট বা নিম্নতর বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেমন বর্ণ বৈষম্যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় এবং লিঙ্গ বৈষম্যে নারীকে পুরুষের তুলনায় নিম্নতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

- দ্বিতীয়তঃ বৈষম্য ব্যবস্থায় ভুক্তভোগী গোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অন্যদের তুলনায় কম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন আমেরিকায় নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী তুলনামূলক কম মজুরি পেয়ে থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতা এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বৈষম্যমূলক আচরণে কান্টের শর্তহীন আদেশের প্রথম সূত্রটি লঙ্ঘিত হয়। এই সূত্রানুযায়ী "এমন নীতি অনুযায়ী কাজ কর যেন তা সার্বজনীন নীতিতে পরিণত হয়।" এই নীতিটি সার্বজনীনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। অধিকার তত্ত্ব অনুসারে বৈষম্যমূলক আচরণ মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে। যেমন মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনকে নির্দেশ করে। আবার, যারা বিভিন্ন ধরনের জাতিগত, লিঙ্গগত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতির কারণে বৈষম্যের শিকার হয় তারা কেবল বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অধিকার থেকেই বঞ্চিত নয় বরং তারা নৈতিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। এসব ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মানের হানি ঘটে অথচ ব্যক্তি বা মানুষ হিসেবে তিনি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এই যুক্তিনুযায়ী যদি ব্যক্তি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা না যায় তাহলে বৈষম্যের কারণে ব্যক্তি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয়। তাই অধিকার তত্ত্ব অনুসারে বৈষম্যমূলক আচরণ অনুচিত হিসেবে বিবেচিত।

৫.৫.৩ ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি: ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি অনুসারে বৈষম্যমূলক আচরণ সভ্য সমাজের জন্য কাঙ্খিত নয়। কারণ বৈষম্য ন্যায়ের নীতিকে লঙ্ঘন করে। ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি অনুযায়ী, বৈষম্য মূলতঃ উপযোগবাদী নীতির বিপরীত এবং এটি নৈতিকতার আদর্শকে উপেক্ষা করে। আমেরিকার বিশিষ্ট নীতি ও সমাজ দার্শনিক জন রলস্ তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থে ন্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে রলস্ তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে উপযোগবাদী মত খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, উপযোগবাদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাপ নিদের্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ উপযোগবাদীরা তাঁদের ব্যবহৃত 'উপযোগ' শব্দটি কোন উৎস থেকে আসবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা দিতে পারেনি। যেমন অনেক সময় ব্যক্তি মানুষের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম, ভয় প্রভৃতির মাধ্যমেও উপযোগ আসতে পারে যাকে আমরা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ (Just society) বলতে পারি না। এ কারণে, তিনি উপযোগবাদকে প্রত্যাখান করেন। তিনি তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থে বলেন, "Justice is the first virtue of social institutions, … ."[৪০] রলস্ের বক্তব্য এটাই ইঙ্গিত করে যে, তিনি ন্যায়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম সদগুণ হিসেবে

বিবেচনা করেছেন যা নৈতিকতার ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তিনি মনে করেন, ন্যায্য প্রক্রিয়ার (Fair procedure) মধ্য দিয়েই কেবল একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রথমেই সমাজের দ্রব্য সামগ্রীর বণ্টনসংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝাতে গিয়ে বহুল পরিচিত প্রক্রিয়া সামাজিক চুক্তিকে ব্যবহার করেন যা চুক্তিমূলক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। চুক্তিমূলক পদ্ধতি হচ্ছে এক ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি (Method of discovery) যা প্রমাণ পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল "বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন ন্যায়" ("Justice as fairness") সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'টি নীতির কথা বলেন। একটি হলো স্বাধীনতার নীতি (Principle of liberty) এবং অপরটি হলো সাম্যের নীতি (Principle of equality)।

- স্বাধীনতার নীতি বলতে রলস্ বুঝিয়েছেন স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের এই অধিকার অন্যান্য ব্যক্তি মানুষের অনুরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাধীনতাকে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগের কথা বলা হয় বিধায় এই নীতিটি সমতা (Egalitarianism) নীতি হিসেবেও বিবেচিত। রলস্এর এই নীতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সব মানুষের সমান সুযোগের বিষয়টিকে নির্দেশ করছেন যা ব্যক্তি মানুষের পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- জন রলস্ মনে করেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা প্রতিকারে দু'টি শর্ত পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ সাম্য নীতিটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হলো সুযোগের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন সমতা (Fair equality of opportunity) এবং অপরটি হলো সমাজের স্বল্পতম সুবিধাভোগী সদস্যদের সর্বাধিক সুবিধা দেয়া (The greatest benefit of the least advantaged member of society)।
- সুযোগের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন সমতা নীতির দু'টি দিক। একটি নঞর্থক দিক এবং অন্যটি সদর্থক দিক। সুযোগের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন সমতার নঞর্থক দিকটি মেধার উপর গুরুত্ব দিয়ে সুযোগের সমতা বণ্টন নিশ্চিত করতে চায়। অর্থাৎ চাকুরি বা ক্যারিয়ার বা জীবিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সবার জন্য সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের 'মৌলিক অধিকার' শিরোনামে ২৯ এর ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the Republic." নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতার বিষয়টি

নিশ্চিত করেছে। সংবিধানের এই ধারার প্রয়োগ আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকেও শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশুনা করে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছে এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সরকারি চাকুরিতে সুযোগ পাচ্ছে যেখানে ব্যক্তির স্থান, কাল, বংশ, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ, ধর্ম প্রভৃতির কোন প্রভাব নেই। সুতরাং সুযোগের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন সমতার নঞর্থক ব্যাখ্যা হলো এমন যে এই নীতিটি প্রতিযোগিতামূলক চাকুরি বা ক্যারিয়ার বা জীবিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে নিরুৎসাহিত করে।[৪১]

- সুযোগের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন সমতার সদর্থক দিকটিকে উন্মুক্ত নীতির বিস্তৃতি বলা যায়। অর্থাৎ সদর্থক দিকটি ব্যক্তির মেধার মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কোন কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে মেধা থাকলেও নির্দিষ্ট চাকুরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না, কোন একটা অবস্থানে উন্নীত হওয়ার পরে তা বাধাগ্রস্ত হয়, সামাজিক স্তরায়ন বা শ্রেণির দিক থেকে মর্যাদার বা মর্যাদাবিহীন মাপকাঠিতে পদোন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। রলস্‌ের নীতিটির মূল বক্তব্য হলো কোন ব্যক্তি যেন তার জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ প্রভৃতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[৪২] এগুলো পদোন্নতির সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।
- রলস্‌ের দ্বিতীয় নীতিটির দ্বিতীয় অংশটি হলো সমাজের সবচাইতে সুবিধাভোগী সদস্যদের সর্বাধিক সুবিধা দেয়া। অর্থাৎ এই নীতি অনুযায়ী এমন পলিসি গ্রহণ করা উচিত যেন পলিসিতে সমাজের নূন্যতম সুবিধাভোগী সদস্যরা সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে যার মূল উদ্দেশ্য হলো এসব জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র বা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্তদের পাশে দাঁড় করানো। কারণ অধিকার বঞ্চিত এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে স্তরভেদের সুযোগ মোচন করাই হলো এ নীতির নৈতিক গুরুত্ব। অনেকেই মনে করেন, রলস্‌ের এই নীতি সমাজে ন্যায় বা সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের ইঙ্গিত প্রদান করে। এ বক্তব্য গ্রহণের কিছু সদর্থক উপাদান রয়েছে তবে তা চূড়ান্ত নয়। কারণ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই যেহেতু তা করা হচ্ছে সেহেতু তা বৈষম্যমূলক আচরণ নয়। অর্থাৎ এখানে ধনী শ্রেণিকে অত্যধিক ধনী হতে বাধা দেয় এবং দরিদ্রকে হত দরিদ্র না হয়ে বরং ঐ অবস্থা থেকে বের হয়ে উন্নত করার দিকে নজর দেয়।[৪৩]

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, ন্যায়ভিত্তিক যুক্তির লক্ষ্য হলো সমাজের সুযোগ সুবিধাসমূহ সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত রাখা। কেউ সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করবে আর কেউ করবে না অথবা বঞ্চিত হবে – সমাজের এমন নীতি অন্যায় হিসেবেই পরিগণিত হয়। বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার পরিসর সীমিত হয়ে পড়ে এবং তারা অন্যদের সমান ও অনেকক্ষেত্রে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে এভাবে ন্যায় নীতি লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। আবার, চাকুরি ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি হবে কোনো নির্দিষ্ট চাকুরিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল প্রতিযোগীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। কিন্তু বৈষম্যমূলক আচরণে সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গগত কারণে কোনো গোষ্ঠির মানুষকে অন্যদের থেকে প্রতিযোগীতায় কম সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। এভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াই হলো চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ। যেমন যারা ফর্সা, যেসব পুরুষের উচ্চতা ৬ ফিট ১০ ইঞ্চি কেবল তারাই এই সুযোগ পাবে তাহলেই তা বৈষম্যমূলক আচরণ হবে। উল্লেখ্য চাকুরি সম্পর্কিত যোগ্যতা হতে পারে মেধা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা অন্য কোনো সৃজনশীল শক্তি যা যে কোন ব্যক্তির পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু লিঙ্গ বা বর্ণের তারতম্য চাকুরির যোগ্যতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। তাই, বৈষম্যমূলক আচরণকে ন্যায় নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.৬ চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য অনুশীলন: এ পর্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণের বিপক্ষে যেসব যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে সেসব যুক্তিসমূহের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। এতদসত্ত্বেও বৈষম্যমূলক আচরণ যে অনুচিত তা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বৈষম্যমূলক আচরণ অনৈতিক হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় তা হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রে আইন প্রণীত হয়েছে এবং হচ্ছে। চাকুরির যে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয় তা সনাক্ত করা প্রয়োজন। চাকুরির ক্ষেত্রে কী কী বৈষম্য ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

৫.৬.১ যৌন হয়রানি: কর্মক্ষেত্রে নারীরা প্রায়ই যৌন হয়রানির সম্মুখীন হয়ে থাকেন যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দ্বারা উপস্থাপন করার চেষ্ট করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে যৌন হয়রানির মতো ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচেছ যা সত্যিই উদ্বেগজনক। কখনো কখনো পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। কিন্তু মূলতঃ নারীরাই এর প্রধান ভুক্তভোগী। যৌন হয়রানির মতো অত্যন্ত

উদ্বেগজনক বিষয়ে আলোচনা ও প্রতিকার এখন সময়ের দাবি। আমেরিকা ১৯৭৮ সালে Equal Employment Opportunity Commison কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলো নির্দেশিকা প্রকাশ করে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত নির্দেশিকাটির বর্তমান সংস্করণ অনুসারে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি হলো,

> "Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors and other verbal or physical contact of a sexual nature constitute sexual harassment when (1) submission to such conduct is made explicitly or implicitly a term or condition of an individual's employment, (2) submission to or rejection of such conduct by an individual is used as the basis for employment decisions affecting such individual, or (3) such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or creating an intimidating, hostile or offensive working environment."[৪৪]

উল্লিখিত সংজ্ঞাটি যৌন আচরণ ও হয়রানির ক্ষেত্রে তিনটি দিককে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। যথা : (ক) এই সমস্ত আচরণকে চাকুরি দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিবেচনা করা হয়; (খ) এই ধরনের আচরণে সাড়া দেয়া বা প্রত্যাখানের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির চাকুরিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় অথবা (গ) এই ধরনের আচরণ দ্বারা যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা অনুদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ব্যক্তির কর্মক্ষমতায় হস্তক্ষেপ হয় অথবা ঐ ব্যক্তির কর্ম ক্ষেত্রে আতঙ্ক, প্রতিকূল কিংবা বিদ্বেষমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে কোনো ধরনের যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এই নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের যৌন হয়রানির দায় নিয়োগকর্তার উপর বর্তায়। যৌন হয়রানির ঘটনা নিয়োগকর্তার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যে ভাবেই ঘটুক না কেন নিয়োগকর্তা এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছিলেন কি না – কোনো অবস্থাতেই নিয়োগকর্তা তার দায় এড়াতে পারেন না। নির্দেশিকাটি পুরোপুরি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৫]

- নির্দেশিকাটিতে যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ যৌন হয়রানিমূলক ঘটনার পাশাপাশি কোনো কর্মীর কর্মক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত, আতঙ্কিত, প্রতিকূল কিংবা শত্রুভাবাপন্ন করে তুলতে পারে এমন আচরণকেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অংশ দ্বারা কতিপয় জটিলতার সৃষ্টি হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, কোনো গ্যারেজের

মেকানিকরা যদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিরস অথবা একঘেয়েমি কাজকে উপভোগ করার জন্য যৌনতা বিষয়ক কৌতুক করে থাকে, তাহলে কি ঐসব মেকানিককে নারী সহকর্মীদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী করা যাবে? উল্লেখ্য এমন অনেক ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই প্রশ্নের আইনি উত্তর খুব একটা স্পষ্ট নয় এবং বিচারকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। আবার, অনেকে মনে করেন উক্ত উদাহরণের মতো অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নারী সহকর্মীদের জন্য প্রতিকূল ও আক্রমনাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। এমনক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটানো যদি অন্যায় হয়েও থাকে তবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া কতটুকু বৈধ সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার, নির্দেশিকানুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির যে কোনো ঘটনার জন্য নিয়োগকর্তা তথা কোম্পানির মালিকপক্ষকে দোষী বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য করা যায় যে, মালিকপক্ষ যৌন হয়রানি রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোনো কোনো কর্মচারী সহকর্মীর প্রতি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। এমনক্ষেত্রে মালিকপক্ষকে প্রকৃতপক্ষে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কিনা – অনেকের দ্বারা এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে।

- নির্দেশিকানুযায়ী যৌন প্রকৃতির মৌখিক বা শারীরিক যোগাযোগের ফলে কোনো ব্যক্তির কর্মক্ষমতায় প্রভাব পড়ে এমন যোগাযোগকে যৌন হয়রানির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমালোচকগণ দাবি করে থাকেন যে এমন ধরনের আচরণ যৌন হয়রানির শামিল কিনা তা ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ফ্লার্টিং কিংবা যৌনতা বিষয়ক কৌতুক অনেকে নারী যৌন আবেদন হিসেবে না নিয়ে রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার, অনেক নারী এই ধরনের আচরণকে তার সম্মানের প্রতি কুঠারাঘাত হিসেবে মনে করেন। সমালোচকরা দাবি করেন যে কোনো ব্যক্তি রসিকতা কিংবা কোনো খারাপ ইচ্ছা ব্যতিরেকে এমন ধরনের আচরণ করে থাকলেও যদি কোনো ব্যক্তি এটিকে দোষ হিসেবে মনে করেন তখন ঢালাওভাবে আচরণকারী ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে অপরাধী বলা চলে না।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, উল্লিখিত নির্দেশিকাটির কিছু অংশ বিতর্কিত হলেও এ বিষয়ে নীতিদার্শনিকগণ একমত যে নির্দেশিকাটি নৈতিকভাবেও সমর্থনযোগ্য এবং যৌন হয়রানি একটি ন্যাক্কারজনক কাজ। কর্মক্ষেত্রে কেউ যেন যৌন হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নিয়োগকর্তার অন্যতম দায়িত্ব। কেননা, যৌন হয়রানির ভুক্তভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী

মানসিক বা সামাজিক বা পারিবারিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন। কর্ম ও ব্যক্তিজীবনও তাদের বিপর্যস্ত হয়। তাছাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার মতো মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়। তাই এমন ঘটনা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং এসব ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত।

৫.৬.২ পদোন্নতির ক্ষেত্রে: পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে অধিকাংশ নারী এবং সংখ্যালঘু জনগণ নিম্নপদস্থ চাকুরি তথা সাধারণ কর্মী অথবা শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে থাকেন। কিন্তু চাকুরিতে যোগদানের পর তারা পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নানাভাবে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিসংখ্যান ভিত্তিক ঐ তথ্য-উপাত্তে আমরা দেখেছি যে নিম্নপদস্থ কাজে যোগ দেয়ার পর – (ক) নারী ও সংখ্যালঘু শ্রেণির গোষ্ঠির সদস্যরা ‘গ্লাস সিলিং’ নামক তথাকথিত কৃত্রিম বাঁধার সম্মুখীন হয়ে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়ে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন; (খ) নারী কর্মীগণ পুরুষ সহকর্মীদের নিকট যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রস্তাবিত অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণেও অনেক নারী কর্মী পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যা বৈষম্যমূলক আচরণের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে; এবং (গ) সংখ্যালঘু শ্রেণী গোষ্ঠির অনেক কর্মী পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষা ও কর্মদক্ষতার অভাবে পদোন্নতি পাচ্ছেন না।[৪৬] কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা অথবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে তারা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয় না।

৫.৬.৩ প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে: অনেক প্রতিষ্ঠান চাকুরি প্রার্থী বাছাইয়ে এমন যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয় যা ঐ চাকুরির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। যেমন যাদের অধিক ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকে তাদের প্রাধান্য দেয়। কিন্তু ঐ চাকুরির জন্য হয়তো একাধিক ডিপ্লোমার প্রয়োজন পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেরাণী পদের চাকুরির জন্য সাধারণত স্নাতক শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না; কিন্তু প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রথমেই স্নাতক ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজের সংখ্যালঘু কিংবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি শ্রেণি বা গোষ্ঠির মানুষ সাধারণত স্নাতকের মতো উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন। ফলশ্রুতিতে, উক্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠির মানুষ প্রার্থী বাছাইয়ের প্রথম ধাপেই ঝরে পড়ে। তাই অপ্রয়োজনীয় যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়াও এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ। আবার, বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাগুলোতেও বৈষম্যমূলক আচরণ ঘটে থাকে। যেমন প্রার্থী বাদ দেয়ার জন্য বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাগুলোয় সাধারণত এমন ভাষা বা পদ্ধতি (যেমন ইংরেজি ভাষা, অস্পষ্ট চিত্র

পরীক্ষা, ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয় যা উক্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠির মানুষ ভাষা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলশ্রুতিতে, প্রার্থী বাছাইয়ের এই পর্বে তারা বাদ পড়ে যান। এরূপ পদ্ধতিতে উক্ত শ্রেণি গোষ্ঠির সদস্যদেরকে বাদ দেয়াও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রার্থী বাছাইয়ের শেষ পদ্ধতি হিসেবে সাধারণত মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষা তথা সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপারিশ বোর্ড বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন।[৪৭] সুপারিশ বোর্ডের এমন মনোভাবের পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে ABC সহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিশ্লেষণে পেয়েছি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রার্থী বাছাইয়ের বিভিন্ন ধাপে নারী ও সংখ্যালঘু শ্রেণি গোষ্ঠির সদস্যরা বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

৫.৬.৪ চাকুরিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লোকসান বা ক্ষতি, অফিস স্থানান্তরসহ বিভিন্ন কারণে কর্মীদের চাকুরিচ্যুত করা হয়। এমনক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরকে বেশি চাকুরিচ্যুত করা হয় যা ইতোমধ্যেই পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে। তাই পূর্ব থেকেই বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে নারী ও সংখ্যালঘুদের সংখ্যাই এসব পদে বেশি থাকে।[৪৮] তাই এসব শ্রেণি গোষ্ঠির সদস্যবৃন্দরাই মূলতঃ চাকুরিচ্যুত হন যা বৈষম্যমূলক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

৫.৬.৫ জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে: ছোট, বড় এবং মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে আগ্রহী চাকুরি প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে নিয়োগ বোর্ড কোন আগ্রহী চাকুরি প্রার্থী বা প্রার্থীদের নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ড প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর আত্মীয় বা পরিচিত প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্মীদের আধিক্য থাকায় নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরাই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে, নারী এবং সংখ্যালঘু জনগণ সমান সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। আবার, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞাপন কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থা অথবা কোনো নির্দিষ্ট ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ফলে যেসব অঞ্চলে বহু ভাষাভাষী জনগণ একত্রে বসবাস করেন সেসব অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যবহৃত ভাষার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার কারণে সংখ্যালঘু জনগণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হন। আবার, অনেক ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞাপনে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে 'পুরুষ কর্মী চাই' বলেও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।[৪৯] এরূপ ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের সম্মুখীন হন।

৫.৬.৬ চাকুরি সংক্রান্ত শর্তের ক্ষেত্রে: চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্তের (যেমন বেতনভাতা, ছুটি, ইত্যাদি) ক্ষেত্রেও নারী ও সংখ্যালঘু শ্রেণি গোষ্ঠি বৈষম্যের সম্মুখীন হন। যেমন একই পদে চাকুরি করা সত্ত্বেও নারী ও সংখ্যালঘু শ্রেণি গোষ্ঠির কর্মীরা অন্যান্যদের তুলনায় কম বেতনভাতা পাচ্ছেন যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আবার, তাদের ছুটির আবেদনও অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। কর্ম পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশেষত নারীরা বৈষম্যের শিকার হন। যেমন পুরুষ সহকর্মীর সংখ্যাধিক্য এমন অফিসে কাজ করতে বিভিন্ন অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া, শিশু যত্ন কেন্দ্রের অপ্রতুলতা, অপরিচ্ছন্ন ও অপর্যাপ্ত ওয়াশরুম ইত্যাদি কারণে নারীরা তীর্যক বৈষম্যের সম্মুখীন হন।[৫০] ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে পড়েন।

৫.৬.৭ বর্ণ ও লিঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য গোষ্ঠির ক্ষেত্রে বৈষম্য: নারী, কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা হিস্পানিক জনগোষ্ঠীর মতোই আরো অনেক ধরনের ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্ক কর্মচারীদের কথা বলা যেতে পারে। বয়স বেশি হওয়ার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করে বা অনেক ক্ষেত্রে অবসর নিতেও বাধ্য করেন। বয়স্ক কর্মচারীদের মতোই, প্রতিবন্ধী, সমকামী ও অসুস্থ ব্যক্তিরাও বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকেন। এমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে তাদেরকেও কি বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন? অন্য কথায় বলতে গেলে, তাদের সুরক্ষায় কি কোনো আইনি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে? আমরা মনে করি তাদেরও আইনি সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ এক্ষেত্রে কিছু কিছু আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৫১]

- প্রথমেই বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী মানুষের প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'The Age Discrimination in Employment Act' প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ৬৫ বছরের অধিক কোনো কর্মচারীকে বয়সের কারণে তার প্রতি বিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৮ সালে আইনটি সংশোধন করে বয়সসীমা ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৭০ এ উন্নীত করা হয়। আবার ১৯৮৬ সালের প্রণীত একটি আইনে কোনো কর্মচারীকে কোনো নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় ১৯৯০ সালে Americans with Disabilities আইন প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইনে শারীরিক অক্ষমতার কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী কর্মচারী ও ক্রেতাদের স্বাচ্ছন্দবোধ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিয়োগকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে বলা যায় বৃদ্ধ ও বয়স্ক কর্মচারীদেরকে বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দিতে কেন্দ্রীয়ভাবে আইনি ব্যবস্থা

গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী কর্মীদেরকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করার জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও কূট কৌশলের ব্যবহার দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

- বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় কিছু আইনি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও সমকামী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকে বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য তেমন কোনো আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। যেমন Liberty Mutual Insurance কোম্পানি জনৈক পুরুষকে সমকামী হওয়ার কারণে কাজে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানালে আদালতের মন্তব্য ছিল কোম্পানি এক্ষেত্রে অবৈধ কিছু করেনি। আবার, Budget Marketing, Inc. তাদের এক কর্মচারীকে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বিধায় তাকে চাকুরিচ্যুত করেছিল। এই ঘটনায় আদালত প্রতিষ্ঠানটির কাজকে অবৈধ বলে মন্তব্য করেছিলেন।
- AIDS বা অন্যকোনো রোগে অসুস্থ হওয়ার কারণে কোনো কর্মচারীর স্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত নেয়া অবৈধ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অন্যান্য কারণ দেখিয়ে AIDS বা অন্যান্য ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়ে থাকে কিংবা তার স্বাস্থ্য বীমা বাতিল করা হয়ে থাকে। তবে তাদের প্রতি এমন বৈষম্য রোধ করার জন্য আমেরিকায় বেশ কিছু অঙ্গরাজ্য 'মনিটরিং' ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সবক্ষেত্রে মনিটরিং করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে অনেক কোম্পানিই তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে। আবার, অনেক কোম্পানি শারীরিক গঠনের দিক থেকে স্থূল ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উক্ত ব্যক্তির কর্মস্থলের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার সাথে স্থূলতার কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক থাকে না। যেমন Philadelphia Electric Company ৩০০ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট জয়ী ইংলিশ নামক ভদ্রমহিলাকে স্থূলতার কারণে চাকুরিতে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; যদিও যে কোনো স্থূল ব্যক্তির পক্ষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বটি পালন করা সম্ভব ছিল। কারণ এখানে দায়িত্বের প্রকৃতির সাথে স্থূলতার কোন অপরিহার্য সম্পর্ক ছিল না।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সমকামী, অসুস্থ, স্থূলকায় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের নাগরিকদের প্রতি কর্মক্ষেত্রে চলমান বৈষম্য নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা যেমন অনেকে বলেন তেমনি আবার অনেকে বিরোধীতাও করেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত যে, তারাও রাষ্ট্রের নাগরিক, তাদেরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এবং নারী ও সংখ্যালঘুরা

যেমন একদা অবহেলিত ও অরক্ষিত ছিল সময়ের পরিক্রমায় অনেক দিক দিয়ে বিশ্ব অনেক উন্নতি সাধন করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ও সংখ্যালঘু আজও অবহেলিত ও অরক্ষিত যা সভ্য জগতে একবিংশ শতাব্দীতে মোটেই কাম্য নয়।

সুতরাং এতক্ষণ আমরা চাকুরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বৈষম্যমূলক সংক্রান্ত আচরণ নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে– এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এটি মারাত্মক অন্যায় ও অন্যায্য। তাই সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ এর প্রতিকার চায়। চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য রোধের অন্যতম প্রতিকার হলো ইতিবাচক পদক্ষেপ যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.৭ ইতিবাচক পদক্ষেপ: বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ভবিষ্যত বৈষম্য প্রতিরোধের জন্য গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, অতীতে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়ে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তাই চাকুরিক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি মূলত নিম্নপদস্থ চাকুরিগুলোতে। অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সমাধানকল্পে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তা কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব ছিল। তাই এগুলোকে নেতিবাচক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ কারণে ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Actions) সম্পর্কে বলা হয়, “The term affirmative action refers to a policy or a program that tries to respond to instances of past discrimination by implementing proactive measures to ensure equal opportunity today.”[৫২] অর্থাৎ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলো একটা নীতি বা কৌশল যেটি অতীতের বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ক্ষতি নিরসনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্থা এস ওয়েস্ট তাঁর “The Historical Roots of Affirmative Action” প্রবন্ধে বলেন ইতিবাচক পদক্ষেপ শব্দটি উল্লেখ করে ১৯৬১ সালের ৬ মার্চ সর্ব প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি একটি বিল স্বাক্ষর করেন এবং এটির নির্বাহী আদেশ নং ১০৯২৫। এই আদেশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নিয়োগকর্তা কর্তৃক বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, লিঙ্গ, কিংবা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাউকে কাজে নিয়োগ দেয়া, চাকুরিচ্যুত করা কিংবা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে অবৈধ ঘোষণা করা।[৫৩] কিন্তু ১৯৬০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৈষম্যের ধারণা পরিবর্তিত হয়। ফলশ্রুতিতে, আমেরিকায় ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বি. জনসন কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি আদেশ জারি করেন যার নম্বর ১১২৪৬। এই আদেশেরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ‘ইতিবাচক কর্মসূচী’ গ্রহণ করেছে।[৫৪] ইতিবাচক কর্মসূচীর আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠানে

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিগুলোর সদস্য সংখ্যার অনুপাতে সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টা করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত The Equal Opportunity Act এর মাধ্যমে The Equal Opportunity Commission এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় যেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায় এবং ইতিবাচক কর্মসূচীর মাধ্যমে বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। তবে অনেক সমালোচক বৈষম্যের বর্তমান ধারণার সাথে একমত হতে পারেননি। তারা মনে করেন বৈষম্য কোনো সামাজিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক তথা অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয় বরং এটি ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়া। তারা আরো মনে করেন যে, নারী কিংবা সংখ্যালঘু গোষ্ঠিগুলোর কতিপয় ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন এবং যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এমন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া না যায় তাহলে বলা চলে না বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যে চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। কেননা চাকুরিক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকেন। এই প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন অন্য প্রতিযোগিদের তুলনায় যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় অনেক এগিয়ে থাকা, প্রতিযোগিদের প্রতি নিয়োগকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি। তাই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত কোন ব্যক্তি যখন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন এর অর্থ এই নয় যে তিনি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বরং হতে পারে যোগ্যতার কোনো দিক দিয়ে তিনি তার প্রতিযোগির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছেন। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির অসাফল্যের উপর ভিত্তি করে বৈষম্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু আমরা যদি বৈষম্যমূলক বিভিন্ন পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এটা স্পষ্ট হবে যে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণের সাফল্যের হার অন্যান্যদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, সেক্ষেত্রে হয়তো বলা যেতে পারে, ঐ ব্যবস্থায় বৈষম্য বিদ্যমান।

ইতিবাচক পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে কর্মরত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সদস্যদের সঙ্গে আনুপাতিক হারে ভারসাম্যতা আনয়ন করা। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিবাচক পদক্ষেপের সূচনা করা ও চলমান রাখার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রধান কাজ হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো নিয়ে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করা। এই গবেষণায় মূলত পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় যে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদবিন্যাসে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সদস্যদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে

কম কিনা এবং যদি কম হয়ে থাকে তাহলে ঐ পদবিন্যাসে যৌক্তিক পদ্ধতিতে কতজন নারী ও সংখ্যালঘু নিয়োগ দেয়া যেতে পারে তা নির্ণয় করা। তারপর প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত নারী ও সংখ্যালঘু কর্মচারীদের মধ্যে যাদের প্রতিভা বা উচ্চ কর্মদক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত করে গড়ে তোলে ঐসব পদে নিয়োগ প্রদান করা। কিন্তু কর্মরত কর্মচারীদের মাধ্যমে যদি নির্ধারিত সংখ্যক জনবল পূরণ করা সম্ভব না হয় তবে একই লক্ষ্যে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে জরুরী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা রাখে এমন নারী ও সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নতুনভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত পদের সংখ্যা প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য। এছাড়াও কোনো কোটা সংরক্ষণ করা চলবে না এবং পদসংখ্যা আন্তঃপরিবর্তনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদবিন্যাসের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ হয়ে থাকে। তাছাড়া সর্বোপরি নারী ও সংখ্যালঘু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ সচল বা ক্রিয়াশীল রাখার ক্ষেত্রে স্পষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট নয়। এমনকি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের মধ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের একটি আদেশে বলেছিলেন যে বর্ণগত অসামঞ্জস্যতা দূর করার লক্ষ্যে কোম্পানিগুলোর ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ। এক্ষেত্রে অতীতের বৈষম্যেমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তার উপরে ইতিবাচক পদক্ষেপের বৈধতা নির্ভর করে। আবার, ১৯৮৪ সালে একই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশানুযায়ী যদি কোম্পানি কর্তৃক কর্মচারীদের জেষ্ঠ্যতা প্রদানের ব্যবস্থা অবৈষম্যমূলক হয়ে থাকে তাহলে কোম্পানি নারী ও সংখ্যালঘুদের সুবিধা দিতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের জেষ্ঠ্যতা সংক্রান্ত অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে না। আদালত এই আদেশের পাশাপাশি আরও মন্তব্য করেন যে নারী ও সংখ্যালঘু কর্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে পুরস্কার হিসেবে জেষ্ঠ্যতা দেয়া যেতে পারে তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রমাণ করতে হবে যে বৈষম্যের শিকার হয়েই সে পিছিয়ে পড়েছিল। লক্ষণীয় যে উক্ত আদেশে ইতিবাচক পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু এই আদেশের ফলশ্রুতিতে ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রভাব স্থবির হয়ে পড়তে পারে। যেমন এই আদেশানুযায়ী কর্মচারী ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা আগে চাকুরিচ্যুত হবেন। ফলে অধিকাংশ নারী ও সংখ্যালঘু কর্মচারী চাকুরি হারাবেন। এই আদেশের পরেও সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আরো কতকগুলি আদেশ জারি হয়েছে যার ফলে ইতিবাচক

পদক্ষেপের প্রভাব অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ১৯৯১ সালে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'Civil Rights Act' আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনেকটাই অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবে এই আইন প্রণীত হওয়ার পরেও ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রতি বিরূপ মনোভাব সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনেক মামলার রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, বিশেষত ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, জনগণের মতোই সম্মানিত বিচারকগণও ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রশ্নে একমত হতে পারেননি।

ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ: পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বৈষম্য। বৈষম্য সম্পর্কিত প্রত্যয়টির ব্যবহার বহুমাত্রিক। এরূপ একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হলো Barbara Grutter V. Lee Bollinger মামলা। বারবারা গ্রুটার (Barbara Grutter) নামক একজন শ্বেতাঙ্গ নারী একাডেমিক ভালো ফলাফল থাকা সত্ত্বেও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হতে ব্যর্থ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি লী বলিনজার (Lee Bollinger) এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা (Grutter V. Bollinger) দায়ের করেন। বারবারা গ্রুটার এর অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপের আওতায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মতো একই রকম ফলাফল থাকা সত্ত্বেও তাকে (বারবারা গ্রুটার) ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়নি। মিশিগান ইস্টার্ন ডিস্ট্রিকটের জেলা আদালত ২০০১ সালের ২৭ মার্চ এই মর্মে মামলার রায় ঘোষণা করেন যে সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবারা গ্রুটার এর সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করে এবং উচ্চ আদালত তা মঞ্জুর করেন। মামলার কার্যক্রম চলাকালীন সময়ের মধ্যেই উক্ত মামলাটি অনেকগুলো বৃহৎ কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বের রায়কে ২০০২ সালের ১৪ মে উচ্চ আদালত (খণ্ডিত সিদ্ধান্ত যা অধিকাংশ বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে) বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। আদালতের রায় অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ ন্যায্য এবং সংবিধানসম্মত। কেননা এসব কর্মসূচীর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মাঝে 'বৈচিত্র্য' আনয়ন সম্ভব। অর্থাৎ সংখ্যালঘুসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীগণ সহশিক্ষার মাধ্যমে পরস্পরের শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, মেধা, ইত্যাদি জানার সুযোগ পাচ্ছে যা তাদের কর্মজীবনের জন্য মঙ্গলজনক। পরবর্তীতে বারবারা গ্রুটার উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে

আপিল করেন। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী মামলার (Grutter V. Bollinger) রায়ে ঘোষণা করেছিলেন যে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক পদক্ষেপ অসাংবিধানিক। কিন্তু ২০০৩ সালের ২৩ জুন সুপ্রিম কোর্ট বারবারা গ্রুটার এর মামলার রায়ে পূর্বের মতের ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতের রায়ের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ইতিবাচক পদক্ষেপ সংবিধান সম্মত। কেননা তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈচিত্র্যতার ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে। ঐ রায়ে বলা হয়,

> "Major American businesses have made clear that the skills needed in today's increasingly global marketplace can only be developed through exposure to widely diverse people, cultures, ideas, and view-points....Moreover, because universities, and in particular, law schools, represent the training ground for a large number of the Nation's leader, the path to leadership must be visibly open to talented and qualified individuals of every race and ethnicity."[৫৫]

আদালতের রায়ের আলোকে বলা যায়, আমেরিকান বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বৈচিত্র্যময় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগগুলোর মাধ্যমে যেহেতু জাতীয় নেতৃত্বের একটি বৃহৎ অংশ তৈরী হয় সেহেতু জাতীয় নেতৃত্বদানের সুযোগ সকল বর্ণের এবং গোত্রের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ কিংবা জাতিগোষ্ঠির জন্য আলাদা কোটা সংরক্ষণ করতে পারে না। তবে আইন বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বর্ণ কিংবা জাতিগোষ্ঠির জন্য পৃথক ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

Grutter V. Bollinger মামলায় এমিক্যাস কিউরি হিসেবে ৬০টিরও বেশী শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক পদক্ষেপ চালু রাখার পক্ষে কথা বলেন। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে 3M, Intel, Microsoft, Nike, Coca-Cola প্রভৃতি অন্যতম। এই কোম্পানিগুলোর মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৫৬]

- প্রথমত: ব্যবসায়ের জগতে সেইসব কর্মীর সফলতা লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যারা বৈচিত্র্যময় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন;
- দ্বিতীয়ত: তারা বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও জাতিগোষ্ঠির ভোক্তাদের আকৃষ্ট করতে বৈচিত্র্যময় প্রস্তাব দিতে সক্ষম হয়ে থাকেন;

- তৃতীয়ত: তারা বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও গোষ্ঠির সহকর্মীদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করার অভিজ্ঞতা রাখেন এবং
- চতুর্থত: তারা সাধারণতঃ কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী ও বৈষম্যমূলক আচরণে উৎসাহিতবোধ করেন না।

Grutter V. Bollinger মামলার রায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছিল। নয়জন বিচারকের মধ্যে পাঁচজন বিচারক ইতিবাচক পদক্ষেপ এর পক্ষে মতামত দিলেও চারজন বিচারক বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতাকারী বিচারকদের অন্যতম হচ্ছেন কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক ক্লারেন্স থমাস। তিনি ইতিবাচক পদক্ষেপের ন্যায্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "These programs stamp minorities with a badge of inferiority and may cause them to develop dependencies or to adopt an attitude that they are "entitled" to preferences."[৫৭] অর্থাৎ তিনি মনে করেন এ ধরনের কর্মসূচী সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনদেরকে অন্যদের চোখে নিকৃষ্ট করে তুলবে এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠিসমূহ নিজেরা স্বনির্ভর না হয়ে অন্যের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত Grutter V. Bollinger মামলার রায় বৈষম্য প্রশ্নে বিতর্ক থামাতে পারেনি। মিশিগান অঙ্গরাজ্যের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও ইতিবাচক পদক্ষেপ সুরক্ষা এবং তহবিল গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৮০ এর দশকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান তাঁর প্রশাসনের সময় ইতিবাচক কর্মসূচীর বিরোধীতা করে বিভিন্ন পদক্ষেপে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রশাসনের নীতি ছিল 'যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে বলা যাবে না।' কিন্তু রিগান প্রশাসন তাদের নীতিতে খুব একটা সফলতা লাভ করতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৯০ এর দশকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তাঁর প্রশাসনের সময় প্রেসিডেন্ট রিগান প্রদত্ত নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর প্রশাসনের সময় 'ইতিবাচক কর্মসূচী' বাস্তবায়নে বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে 'ইতিবাচক কর্মসূচী'কে বৈধতা প্রদান করেন যা অনেকের দ্বারা প্রশংসিত হয়। তবে যে কোন নীতিমালাই সম্পূর্ণভাবে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকে না। তাই ইতিবাচক কর্মসূচীও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিবাচক কর্মসূচীর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়।

৫.৮ ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ: উপরে উল্লিখিত আদালতের বিভিন্ন মামলার রায়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রশ্নে বিচারকগণও দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। ফলে, ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে যেমন যুক্তি রয়েছে তেমনি এটির বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছ। নিম্নে ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো:

৫.৮.১ ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তিসমূহ: ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ মূলত দু'টি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ মনে করে থাকেন যে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ অতীতে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে যা ক্ষতিপূরণ যুক্তি (Compensation argument) হিসেবে বিবেচিত। অন্যদল মনে করে থাকেন যে সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে অগ্রাধিকার ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে যা ইনস্ট্রুম্যানটালিস্ট যুক্তি (Instrumentalist argument) নামে পরিচিত। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রথম দলকে পশ্চাদমুখী (Backward) এবং দ্বিতীয় দলকে অগ্রসরমুখী (Forward) হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এই দুই পক্ষের যুক্তি নিম্নে আলোচনা করা হলো:[৫৮]

৫.৮.১.১ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপ: ন্যায়ের ক্ষতিপূরণমূলক তত্ত্বানুযায়ী যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি সাধন করে থাকে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে ঐ ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা ইতিপূর্বে বৈষম্যের মাধ্যমে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই পশ্চাদমুখী দলের সদস্যবৃন্দ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কারণ অতীতে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ বিভিন্ন চাকুরি ও সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই পশ্চাদমুখী দলের সমর্থকেরা ন্যায়ের ক্ষতিপূরণমূলক তত্ত্বানুযায়ী দাবি করে থাকেন যে, ইতিবাচক পদক্ষেপের আওতায় তাদেরকে (নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে) চাকুরিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে পূর্বের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য।

ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপকে বাস্তবায়নের পক্ষে যে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে এটিকে কেউ কেউ ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো ন্যায়ের ক্ষতিপূরণমূলক তত্ত্বানুযায়ী কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষতিপূরণ দিবেন যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঘটনা সংঘটিত করে কারো প্রতি অন্যায় করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ শুধু সেই ব্যক্তিই পাবেন যিনি ঐ ঘটনা দ্বারা অন্যায়ের শিকার অথবা বঞ্চিত হয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি বিশ জন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বিশ জন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকেন তাহলে ঐ বিশ জন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বিশ জন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। এর অর্থ এই নয় যে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠিই ক্ষতিপূরণ দিবেন কিংবা সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠিই ক্ষতিপূরণ পাবেন। একইভাবে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য নির্বিচারে প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা কিংবা নির্বিচারে সকল নারী ও সংখ্যালঘু জনগণকে অগ্রাধিকার প্রদান ন্যায়ের ক্ষতিপূরণমূলক তত্ত্বানুযায়ী সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তাই তারা মনে করেন ইতিবাচক পদক্ষেপ ন্যায্যতার পরিপন্থী ।

ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপকে বাস্তবায়নের বিপক্ষে যারা যুক্তি দিয়েছেন তাদের যুক্তিকেও অনেকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তারা দাবি করেন যে বৈষম্যের ফলে প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি (বা নারী বা সংখ্যালঘু জনগণ) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং একই বৈষম্যের ফলে প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি (বা পুরুষ) লাভবান হয়েছেন। যেমন আমেরিকার নীতিদার্শনিক জুদিথ জারভিস থমসন মনে করেন,

> "But it is absurd to suppose that the young blacks and women now of an age to apply for jobs have not been wronged.... Even young blacks and women have lived through downgrading for being black or female.... And even those who were not themselves downgraded for black or female have suffered the consequences of the downgrading of other blacks and women: lack of self-confidence and lack of self-respect."[৫৯]

জুদিথ জারভিস থমসনের মতে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি বা নারী সরাসরিভাবে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও নারীদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ হারানোর পরিণতি দেখে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আবার আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্বদ্যিালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্টিন রেডিশ তাঁর "Preferential Law School Admissions and the equal Protection Clause: An Analysis of the Competing Arguments" প্রবন্ধে বলেন,

> "It might also be argued that, whether or not the ... have themselves participated in acts of discrimination, they have been the beneficiaries—conscious or unconscious—of a fundamentally racist society. They thus may be held independently "liable" to suppressed minorities for a form of unjust enrichment."[৬০]

মার্টিন রেডিশের বক্তব্যে এটাই স্পষ্ট যে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ–বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকুক বা না থাকুক তিনিও বৈষম্যমূলক সমাজের কারণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লাভবান হয়েছেন। তাই নিপীড়িত

সংখ্যালঘু জনগণকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তাদের প্রত্যেককে দায়ী করা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হলেও পরোক্ষভাবে তাদেরকেও দায়ী করা চলে। যেহেতু বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে তারা নিজেরাও লাভবান হয়েছিল।

৫.৮.১.২ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ইতিবাচক কর্মসূচী: ইতিবাচক পদক্ষেপের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি ও মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে অনেকে উপযোগবাদী যুক্তি দিয়ে বলেন যে এই কর্মসূচী ন্যায়সঙ্গত। কেননা ইতিবাচক পদক্ষেপ দ্বারা জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাদের মতে অতীতে সংঘটিত বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে সমাজে বর্ণ ও দারিদ্র্যের মধ্যে একটি অপরিহার্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ বৈষম্যমূলক সমাজে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান থেকে যত বেশি বঞ্চিত হয়েছে তাদের মাঝে অন্যদের তুলনায় দারিদ্র্যের হার তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলোর তথ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় নারী ও পুরুষের বেতন বৈষম্যের একটি সারণী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

লিঙ্গ	সময়	পারিশ্রমিক
বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শ্রমিক	প্রতি মাসে	নারী শ্রমিকের তুলনায় ২১% বেতন বেশি
বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিক	প্রতি মাসে	পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় ২১% বেতন কম
দেলোওয়ার নিরাপত্তাকর্মী	প্রতি মাসে	৬০০০ টাকা
সাবিনা গৃহকর্মী	প্রতি মাসে	২৫০০ টাকা
ধানের চাতালে পুরুষ কর্মী	দৈনিক	৪০০-৫০০ টাকা
ধানের চাতালে নারী কর্মী	দৈনিক	২০০-৩০০ টাকা
পানের বরজে পুরুষ কর্মী	দৈনিক	৩০০ টাকা
পানের বরজে নারী কর্মী	দৈনিক	২০০ টাকা
কৃষি কাজে পুরুষ কর্মী	দৈনিক	২৯৯ টাকা
কৃষি কাজে নারী কর্মী	দৈনিক	২২৬ টাকা
পুরুষ কর্মী (গড়ে)	দৈনিক	২০০-৪০০ টাকা
নারী কর্মী (গড়ে)	দৈনিক	১০০-২০০ টাকা

উপরের টেবিল থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে নারী-পুরুষের আয় বৈষম্য বিদ্যমান এবং তারা তাদের প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান পেয়ে থাকলেও প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক পায় না। প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় তারা দিন দিন দরিদ্র হচ্ছে এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মধ্যে অপূরণীয় চাহিদা,

অসন্তোষ, সামাজিক সমস্যা ও অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। তাই বিশাল এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির আশা-আকাঙ্খা সর্বোপরি জনগণের সর্বাধিক মঙ্গল ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে বিশেষ শিক্ষা ও প্রত্যাশিত কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সমালোচকেরা ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পারেন যে, এখানে 'বর্ণপ্রথার' মতো অপ্রাসঙ্গিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে চাকুরি বণ্টিত হয়ে থাকে। এমন অভিযোগের প্রতিউত্তরে উপযোগবাদীদের যুক্তি হচ্ছে এখানে বর্ণ কোনো মানদণ্ড নয় বরং 'চাহিদা'র ভিত্তিতে সুবিধা বণ্টন করা হয়ে থাকে। সমালোচকগণ আরো অনেকভাবে উপযোগবাদীদের এই যুক্তির সমালোচনা করে থাকেন। (১) তাদের মতে ইতিবাচক পদক্ষেপের সামাজিক মূল্যের তুলনায় এ থেকে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার পরিমাণ বেশি নাও হতে পারে। যেমন ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের হতাশা বৃদ্ধির মতো একটি অনাকাঙ্খিত সামাজিক মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। (২) বর্ণ চাহিদা প্রকৃত নির্দেশক কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়।[৬১]

ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলেই পরিলক্ষিত হয়। ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে উপযোগবাদীরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি প্রদান করেন। প্রথমত: ইতিবাচক পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো ন্যায্যতা অর্জন। দ্বিতীয়ত: ন্যায্যতা অর্জনের উপায় হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপ যে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য তাই প্রমাণের চেষ্টা।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই বর্তমান সমাজে চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকুরির জন্য অপরিহার্য বা প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার পরিবর্তে লিঙ্গ বা বর্ণের মত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে যা অনভিপ্রেত। ফলশ্রুতিতে, নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সদস্যরা অন্যদের সাথে যোগ্যতার মাপকাঠিতে পিছিয়ে না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত চাকুরি থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে থাকেন। চাকুরির এমন বৈষম্যমূলক বন্টনকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় কী? তাই, ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একটি ন্যায়সঙ্গত চাকুরি বন্টন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেন সমাজের সুবিধা ও সমস্যাগুলো সমাজের সদস্যদের মাঝে মোটামুটি সমানভাবে বণ্টিত হয়। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে দেখা যায় নিয়োগকর্তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি বিভিন্নভাবে বর্ণবাদী আচরণ করে থাকেন। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠির বিশাল অংশ প্রতিযোগিতায় সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ইতিবাচক পদক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়

নিয়োগকর্তাদের এমন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আবার দেখা যায় অতীতেও এসব নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ বিভিন্নভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ও অর্থনীতিতে। তাই তাদের অনেকে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তুলনায় দক্ষতায় পিছিয়ে পড়ে। আবার, সম্মানজনক পদগুলোতে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সদস্যদের তেমন কোনো উপস্থিতি না থাকায় এসব গোষ্ঠির তরুণ সদস্যদেরকে সম্মানজনক পদগুলোতে যোগ দেয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়ার মতো তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। এসব চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ বিদ্যমান থাকায় তরুণ-তরুণীরা এসব চাকুরির জন্য প্রস্তুতি নিতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো তরুণ-তরুণীরা আইন পেশায় যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাই ইতিবাচক পদক্ষেপের তৃতীয় উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণের অসুবিধা নিরসনের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে নতুনভাবে প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করা।[৬২]

ইতিবাচক পদক্ষেপের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত একটি সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ লিঙ্গ বা বর্ণ বৈষম্যকে পরিহার করে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্য জীবনধারণের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এমন সমাজ সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপের আওতায় চাকুরিক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ও সংখ্যালঘু সদস্যকে 'অগ্রাধিকার' দেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, প্রতিভাবান কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ও সংখ্যালঘু সদস্যদেরকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা। আশা করা হয় যে এভাবে একটি রাষ্ট্রে ন্যায় ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই ইতিবাচক পদক্ষেপকে নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য বলে দাবি করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে 'অগ্রাধিকার' ব্যবস্থা কি আদৌ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য? ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষের প্রবক্তরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মূলত তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেন:

- প্রথমত: অনেকে অভিযোগ করেন যে, নারী ও অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে 'অগ্রাধিকার' প্রদান শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রতি 'বৈষম্যের' সমতুল্য। কিন্তু ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষের প্রবক্তরা দেখিয়েছেন যে 'অগ্রাধিকার' ও 'বৈষম্য' – এ দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বৈষম্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গোষ্ঠিকে নিম্নতর বা নিকৃষ্ট মনে করে ঐ গোষ্ঠির সদস্যদরে বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইতিবাচক পদক্ষেপে নারী ও সংখ্যালঘুদের 'অগ্রাধিকার' প্রদানের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘুদের তুলনায়

শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা সামাজিক অবস্থানে অনেক বেশি অগ্রসরমান। তাই নারী ও সংখ্যালঘু সমাজের অনগ্রসর সদস্যদের ন্যায্যতা অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। তাই বর্ণবাদী বা লিঙ্গবাদী দৃষ্টিভঙ্গিজনিত অনৈতিক কাজের মাধ্যমে সৃষ্ট বৈষম্যমূলক কাজের সাথে অগ্রাধিকারকে এক করে দেখা সমীচীন নয়।[৬৩]

- দ্বিতীয়ত: অনেকে দাবি করেন যে চাকুরির সাথে অপ্রাসঙ্গিক যোগ্যতার (বর্ণ বা লিঙ্গ) ভিত্তিতে চাকুরিজনিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক পদক্ষেপ শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। প্রতিউত্তরে প্রবক্তরা যুক্তি দিয়ে থাকেন যে বর্তমান সমাজে চাকুরিক্ষেত্রে বর্ণ ও লিঙ্গ আর অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা দুষ্প্রাপ্য সম্পদ (যেমন চাকুরি) বন্টনের ক্ষেত্রে সমাজ তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের অধিকার রাখে যারা ঐ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের কাজ ত্বরান্বিত করে। সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যেন তারা একটি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত সমাজে বসবাস করতে পারে। তাই বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে প্রতিযোগিতায় সমান সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে ইতিবাচক পদক্ষেপ সমাজকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আবার ইতিপূর্বে চাকুরি সংক্রান্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরি প্রদানের কথা এই জন্য বলা হয়েছে যেন সমাজের উপযোগবাদী উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হয় – সমাজ যেন সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু যখন সমাজের উপযোগবাদী লক্ষ্য (উৎপাদনশীলতা) ও প্রকৃত লক্ষ্য (অধিকতর ন্যায়বান সমাজ সৃষ্টি) – এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন দ্বিতীয়টি অর্জনের চেষ্টা করা সমাজের জন্য অধিকতর যুক্তিযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয় – এমনকি দ্বিতীয়টি গ্রহণে উপযোগবাদী উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি অর্জন সম্ভব না হলেও। কেননা সমাজের সদস্যরা যদি ন্যায্য পরিবেশে বসবাস করতে অসমর্থ হয়, যদি তারা বসবাসের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সমাজে অসন্তোষ বা অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। সমাজের নাগরিকদের মধ্যে অশান্তি, বঞ্চনা, অসন্তোষ ইত্যাদি বিরাজমান থাকলে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, সমাজ কর্তৃক অন্যান্য অর্জনগুলোও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যা কোনভাবেই কাম্য নয়।[৬৪]
- তৃতীয়ত: অনেক সমালোচক দাবি করেন যে ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়ে থাকে। কেননা তাদের মতে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে

নারী ও সংখ্যালঘুদের বোঝানো হয় যে তারা অন্যদের সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে হীন। তাই কৃপা দেখিয়ে তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে এবং নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট ভেবে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া উক্ত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাদের সৃজনশীলতাকে ম্লান করে দেয়া হয় যা তাদের ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। সমালোচকগণ আরো দাবি করেন যে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণের এই মানসিক ক্ষতির পরিমাণ ইতিবাচক পদক্ষেপ দ্বারা অর্জিত মোট লাভের পরিমাণ থেকে বেশি।[৬৫]

ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রবক্তরা বিভিন্নভাবে এই অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করে আসছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রবক্তরা মনে করেন, ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে কতিপয় নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু অসুবিধা বা তাদের ক্ষতির পরিমাণ থেকে উক্ত পদক্ষেপের কারণে অর্জিত চাকুরির মূল্য অনেক বেশি। যেমন ইতিবাচক পদক্ষেপের আওতায় চাকুরি পাওয়া একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “I had to deal with the grief it brought, but it was well worth it.”[৬৬] এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে সে সাময়িকভাবে হীনমন্যতায় ভুগেছে বটে কিন্তু যা পেয়েছে তার মূল্য হীনমন্যতার চেয়ে অনেক বেশি।
- ইতিবাচক পদক্ষেপের ভিত্তি কোনো ধরনের ‘নিকৃষ্টতা’ তত্ত্বের উপর গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে প্রমাণিত যে চাকুরি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই নিয়োগকর্তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নারী ও সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করে থাকেন। এমনকি পরিসংখ্যানে এটাও দেখানোর চেষ্ট করা হয়েছে যে একই পদে চাকুরি করলেও অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অন্যদের তুলনায় বেশি সম্মানী পেয়ে থাকেন। ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে নিয়োগকর্তাদের এমন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নারী ও সংখ্যালঘু জনগণকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা।
- কিছু নারী ও সংখ্যালঘু ব্যক্তি ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে নিজেকে নিকৃষ্ট ভেবে হীনমন্যতায় ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আরো বেশি সংখ্যক নারী ও সংখ্যালঘু ধারাবাহিক বৈষম্যের কারণে নিজেকে নিম্নস্তরীয় ভেবে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ইতিবাচক পদক্ষেপ

তাদের প্রত্যেকের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করার পাশাপাশি মানসিকভাবে তাদেরকে আরো সাবলীল করে তোলার চেষ্টা করে থাকে।

- ইতিবাচক পদক্ষেপ কোনো গোষ্ঠীকে নিম্নস্তরীয় অনুভব করিয়ে থাকে এমন অভিযোগ আসলে ভিত্তিহীন। তাদের যুক্তি অনুযায়ী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্বেতাঙ্গরা সুবিধা পেয়ে আসছে যা তাদের আজও হীনমন্যতায় ভোগায়নি। তাই এই ধারণা অবান্তর যে শত শত বছর বঞ্চনার শিকার হয়ে আসা নারী ও সংখ্যালঘু জনগণ কয়েক দশক আগে শুরু হওয়া ইতিবাচক পদক্ষেপের দ্বারা তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেয়ে হীনমন্যতায় ভুগবে। বরং ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে ঐ সকল সম্প্রদায় তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় রাখার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে।

৫.৮.২ ইতিবাচক পদক্ষেপের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ: ইতিবাচক পদক্ষেপকে যারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন তারা এটির বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে অতীতের বৈষম্য লাঘব করতে গিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিজেই একটি বৈষম্যমূলক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। কেননা, নারী ও সংখ্যালঘু জনগণকে সুবিধা দিতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাই অনেকেই এটিকে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রতি 'বিপরীত বৈষম্য' (Reverse-discrimination) বলে অভিহিত করে থাকেন। ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ঐতিহাসিকভাবে এটি সত্য যে, সমাজ মসৃণ নয়। ফলে, সমাজে স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অথবা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাদের অনেকেই এখন আর নেই, এমনকি অনেকে এই পৃথিবী ছেড়েও চলে গেছেন। এখন তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার দায় মিটানোর জন্য যদি তাদের ছেলে-মেয়েদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় তাহলে এটির অর্থ হলো আবারও অন্যকোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করা। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মানুষ যদি তার যোগ্যতা অনুসারে সুবিধা পায় তাহলে সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি ন্যূনতম পর্যায়ে অবস্থান করবে। ফলে, ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য লাঘবে কার্যকরী উদ্যোগ নয়।
- ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে সমাজে দু'টি শ্রেণি তৈরি হয়। একটি হলো বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণি এবং অপরটি হলো সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণি। ফলে বলা যায় যে, সমাজে বিপরীত শ্রেণির

অস্তিত্ব থাকার অর্থই হলো সমাজে নিশ্চিতভাবে বৈষম্য বিদ্যমান থাকা। কারণ বিশেষ শ্রেণিকে বিভিন্ন সুবিধাসমূহ প্রদান করা হয় এবং অন্য শ্রেণিকে বঞ্চিত করা হয়।

- ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে মানুষের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ফলে, ব্যক্তির মেধা বা প্রতিভার বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং ব্যক্তি মেধা-নির্ভর না হয়ে সুযোগ সন্ধানী হবে যা ব্যক্তিকে পরিপক্ক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে।
- ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে যারা প্রতিষ্ঠিত হবেন তাদের সম্পর্কে মানুষের মূল্যায়ন নেতিবাচক হবে। কারণ সমাজের মানুষের উপলব্ধি হলো ইতিবাচক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ তারা মেধার পরিবর্তে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে উক্ত স্থান দখল করেছে যা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠির আত্ম-মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ইতিবাচক পদক্ষেপ এমন এক বিষয় যা নিয়ে একক সিদ্ধান্তে আসা কখনো সম্ভব নয়। কারণ যুক্তি, পাল্টাযুক্তির সংখ্যাই কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ করে অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে, ইতিবাচক পদক্ষেপ যদি নৈতিকভাবে আবশ্যক না হয়েও থাকে তথাপিও ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য পূরণের উপায় হিসেবে তথা নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.৯ ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন: ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে অনেক সমালোচক ইতিবাচক পদক্ষেপের বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন। সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হবে। সমালোচকদের মতে বর্ণ বা লিঙ্গের সাথে চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য যোগ্যতা তুলনা না করে চাকুরি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। (ক) কেবল লিঙ্গ বা বর্ণের ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা হলে অনেক অযোগ্য লোক চাকুরি পেয়ে যাবে। ফলে, উৎপাদনশীলতা কমে আসবে। (খ) অনেক পেশা অন্যান্য মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন ডাক্তার বা পাইলটদের উপরে রোগী বা যাত্রীদের জীবনের সুরক্ষা নির্ভর করে। তাই এসব পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্ণ বা লিঙ্গের চেয়ে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। নতুবা অন্যান্যদের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। (গ) ইতিবাচক পদক্ষেপ দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর থাকলে শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা নিজেদেরকে বৈষম্যের শিকার হিসেবে মনে করা শুরু করবে। ফলে আমরা অত্যধিক বর্ণ ও লিঙ্গ সচেতন জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারি। এসব সমস্যার কথা বিবেচনায় এনে বিশেজ্ঞরা বলেন যে শুধুমাত্র সেইসব প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পদক্ষেপ চালু থাকা উচিত যেসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে নারী ও সংখ্যালঘু কর্মচারীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া তারা সুষ্ঠুভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য

বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।[৬৭] যেমনঃ (১) চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থীরই নির্ধারিত সর্বনিম্ন যোগ্যতা থাকতে হবে কিংবা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে হবে। সংখ্যালঘু, সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা কারো ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যত্যয় হলে চলবে না। (২) যদি সংখ্যালঘু বা নারী প্রার্থীর যোগ্যতা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীদের কাছাকাছি কিংবা সমান কিংবা বেশি হয় তবে সংখ্যালঘু বা নারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। (৩) যদি সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় ধরনের প্রার্থী নির্ধারিত সর্বনিম্ন যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীর যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে– (ক) যদি ঐ পেশা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে সরাসরি প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে (যেমন ডাক্তার বা পাইলট) অথবা ঐ পেশা যদি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে (যেমন ব্যবস্থাপনা পরিচালক) তবে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু, (খ) ঐ পেশা যদি জননিরাপত্তা কিংবা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বা উন্নয়নের উপর সরাসরি প্রভাব না ফেলে (অধিকাংশ চাকুরিই এমন) তাহলে সংখ্যালঘু প্রার্থীকে প্রাধান্য দিতে হবে। (৪) যদি পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয় যে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে নারী বা সংখ্যালঘু কর্মচারীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম তাহলে তখনই শুধুমাত্র ‘অগ্রাধিকার’ নীতি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।[৬৮]

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে কর্মক্ষেত্রে নারী ও সংখ্যালঘু কর্মচারীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাই কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ তাদের উপযোগী করে তোলার উপরও ইতিবাচক পদক্ষেপের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রথমত: নারীদের কথা বলা যেতে পারে। কর্মরত নারীদের একটি বিশাল অংশই সন্তানের জননী। সামাজিকভাবে সন্তান লালনপালনের প্রায় পুরো দায়িত্বই মাকে পালন করতে হয়। কিন্তু কর্মজীবনের ব্যস্ততার কারণে তারা দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খেয়ে থাকেন। এর ক্ষতিকর প্রভাব শুধু ওই নারীদের উপরে পড়ছে না বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরেও তার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। অনেকে বলেছেন যে, নারী কর্মীদের জন্য কোম্পানির দুই ধরনের সুযোগ চালু রাখা উচিত। একটি সুযোগ থাকবে তাদের জন্য যারা ক্যারিয়ার গঠনের পাশাপাশি সন্তান লালনপালন করতে চান এবং অন্য একটি সুযোগ থাকবে তাদের জন্য যারা সন্তান নিতে চান না কিংবা সন্তান লালন-পালনের জন্য অন্যকোন ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী (যেমন চাইল্ড কেয়ার সেন্টার)। কোম্পানি প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে দিবে না। তাদের বদলি বা অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহমর্মিতার পরিচয় দিবে। অপরদিকে অন্যান্য নারী কর্মচারী ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের

সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু এই দ্বৈত সুযোগও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সমালোচকদের মতে এমন পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত নয়। কেননা নারীরা এক্ষেত্রেও বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পুরুষ কর্মচারীদের সন্তান বা ক্যারিয়ার – দুটো একটি বেছে নিতে বাধ্য করা না হলেও এই পদ্ধতিতে নারীদের বাধ্য করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ক্যারিয়ার গঠনের উচ্চ প্রলোভন দেখিয়ে নারীদের দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণে পরোক্ষভাবে বাধ্য করা হয়ে থাকে। এসব সমস্যার কথা বিবেচনায় এনে অনেক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব যতদিন না নারী-পুরুষের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হয় ততোদিন কোম্পানিগুলো নারীদের সুবিধার্থে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন (ক) নারীদের জন্য পারিবারিক ছুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার প্রখ্যাত বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান IBM এ নারী কর্মীদের ৮ সপ্তাহের বৈতনিক মাতৃত্বকালীন ছুটি ও বাড়তি একবছর খণ্ডকালীন কাজের সুযোগসহ অবৈতনিক ছুটি প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বৈতনিক মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস উপভোগ করার সুযোগ পান। কিন্তু এই সুযোগ তিনি সর্বোচ্চ দুইটি সন্তান ধারণ করার ক্ষেত্রে পাবেন; (খ) সহজতর কাজের সময় প্রদান করা। যেমন সপ্তাহে পাঁচ দিন ৮ ঘন্টার পরিবর্তে চার দিন ১০ ঘন্টা করে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া; (গ) সন্তানের অসুস্থতার ক্ষেত্রে কর্মীকে ছুটি দেয়া। বাংলাদেশেও সন্তান অসুস্থ হলে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা হয়; (ঘ) সন্তান আছে এমন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন কয়েক বছর কেবল খণ্ডকালীন কাজ করার সুযোগ দেয়া ও সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ দেয়া। (ঙ) কর্মস্থলে শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি।[৬৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, চাকুরি বৈষম্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে যদিও রাষ্ট্র ভেদে চাকুরি বৈষম্যের প্রকৃতি ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর চাকুরি ক্ষেত্রে স্বল্পতম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে **১৯৭২** সালের ৫ ডিসেম্বর এক নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথার প্রচলন হয়। এখানে মেধা কোটা ছিল ২০ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ছিল ৩০ শতাংশ, জেলা কোটা ছিল ৪০ শতাংশ এবং যুদ্ধাহত নারী কোটা ছিল ১০ শতাংশ। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় কোটা প্রথায় বিভিন্ন ধরনের যোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন এবং সংশোধন হয়ে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬ শতাংশে। সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বল্পতম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে চাকুরি, ব্যবসায়, শিক্ষা, নীতি নির্ধারণে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করাই কোটার মূল লক্ষ্য। কিন্তু কোন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে

কোটার প্রচলন থাকতে পারে না। বাংলাদেশে চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ বহুদিন ধরে তাদের যৌক্তিক দাবি ব্যক্ত করে আসছে। এটির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সরকার এক নির্বাহী আদেশে ৪ অক্টোবর, ২০১৮ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, বিভিন্ন কর্পোরেশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল প্রকার কোটা পদ্ধতিকে বাতিল ঘোষণা করেছে। উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও যদি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে বলা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিল সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে কোটার প্রচলন থাকলে মেধাবীরা বঞ্চিত হয় এবং সমাজে নানা রকমের অসন্তোষের সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। তাই চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিকার বা সমাধান করাই হলো টেকসই ব্যবসায়ের অভীষ্ট লক্ষ্য। অতএব উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, টেকসই ব্যবসায়ের নৈতিক লক্ষ্য ও অনুশীলনই হলো সর্বাধিক মানুষের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সুখ ও সমৃদ্ধ নিশ্চিত করা।

---

১. Furxhi, G. (2016), “Job Discrimination and Ethics in the Workplace” in *European Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, Nr. 2, p. 138.

২. DeGeorge, R. T. (2011), *Business Ethics*, 7th ed., India: Batra Art Press, p. 356.

৩. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 307.

৪. Furxhi, G., op. cit., pp. 138-139.

৫. Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK Oxford University Press, p. 294.

৬. Boatright, J. R. and Patra, B. P. (2011), *Ethics and the Conduct of Business*, 6th ed., India: Dorling Kindersley Pvt. Ltd., p. 225.

৭. Johari, J. C. (1995), *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends,* New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, P. 343.

৮. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 228-231.

৯. Bowie, N. E. and Schneider, M. (2011), *Business Ethics for Dummies*, Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc., p. 145.

১০. *Ibid.*

১১. Velasquez, M. G., op. cit., p. 306.

১২. *Ibid.*, pp. 306-307.

১৩. Barry, V. (1986), *Moral Issues in Business,* 3rd ed., California, USA: Wadsworth Publishing Company, p. 368.

১৪. *Ibid.*

১৫. *Ibid.*

১৬. *Ibid.*

১৭. *Ibid.*

১৮. Desjardins, J. (2011), *An Introduction to Business Ethics*, 4th ed., New York: McGraw-Hill, p. 244.

১৯. *Ibid.*

২০. *Ibid.*

২১. Velasquez, M. G., op. cit., p. 310.

২২. *Ibid.*, p. 311.

২৩. *Ibid.*, p. 312.

২৪. *Ibid.*, p. 314.

২৫. *Ibid.*

২৬. Gupta, S. (2018), "Glass Ceiling in 21st Century: Women in Management" in *International Journal of Management Studies*, Vol.-V, Issue-3(5), p. 83.

২৭. *Ibid.*, p. 89.

২৮. Velasquez, M. G., op. cit., pp. 317-318.

২৯. *Ibid.*, p. 318.

৩০. Kapsos, S. (2008), "The Gender Wage Gap in Bangladesh" in ILO Asia-Pacific Paper Series, p. ix.

৩১. শামস, আলম (২০১৬), "আজও নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার", *দৈনিক ইনকিলাব*, মঙ্গলবার, ৩ মে, পৃ. ৭।

৩২. মুনতাকিম, আব্দুল্লাহ-হিল (২০১৮), "কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার নারী", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, শুক্রবার, ২০ এপ্রিল, পৃ. ২২।

৩৩. পারভীন, ফারহানা (২০১৬), "বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে?", *BBC News*, বাংলা, মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টম্বর।

৩৪. শাহ, জাহাঙ্গীর (২০১৯), "উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা বাড়ছে", *দৈনিক প্রথম আলো*, শুক্রবার, ৮ মার্চ, পৃ. ১৩।

৩৫. Velasquez, M. G., op. cit., pp. 318-319.

৩৬. *Ibid.*, p. 320.

৩৭. *Ibid.*

৩৮. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 234.

৩৯. *Ibid.*, p. 235.

৪০. Rawls, J. (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, P. 3.

৪১. খানম, রাশিদা আখতার (২০১৯),"রাজনৈতিক ও সামাজিক উদারনৈতিকতাবাদ প্রসঙ্গে জন রলস্", *অনুসন্ধিৎসা*, দর্শন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়, রাজশাহী, পৃ. ৫৮।

৪২. *Ibid.*, p. 59.

৪৩. *Ibid.*, pp. 60-61.

৪৪. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., p. 230.

৪৫. Velasquez, M. G., op. cit., p. 326.

৪৬. *Ibid.*, p. 323.

৪৭. Boatright, J. R. and Patra, B. P., op. cit., pp. 236-237.

৪৮. *Ibid.*

৪৯. Velasquez, M. G., op. cit., p. 322.

৫০. *Ibid.*

৫১. *Ibid.*, p. 328.

৫২. Hartman, L. P. and Desjardins J. (2011), *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility*, 2nd ed., Irwin: McGraw –Hill, p. 284.

৫৩. West, M. S. op. cit., p. 612.

৫৪. *Ibid.*, p. 613.

৫৫. Velasquez, M. G., op. cit., p. 304.

৫৬. *Ibid.*, pp. 304-305.

৫৭. *Ibid.*, p. 305.

৫৮. *Ibid.*, p. 331.

৫৯. Thomson, J. J. (1973), "Preferential Hiring" in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 2, No. 4, p. 381.

৬০. Redish, M. H. (1974), "Preferential Law School Admissions and the equal Protection Clause: An Analysis of the Competing Arguments" in *UCLA Law Review*, Vol. 22, p. 389.

৬১. Velasquez, M. G., op. cit., p. 332.

৬২. *Ibid.*, p. 333.

৬৩. *Ibid.*, p. 334.

৬৪. *Ibid.*, pp. 334-335.

৬৫. *Ibid.*, p. 335.

৬৬. *Ibid.*

৬৭. *Ibid.*, p. 336.

৬৮. *Ibid.*, pp. 336-37.

৬৯. *Ibid.*, p. 337.

ষষ্ঠ অধ্যায়

টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন: একটি ব্যবহারিক বিশ্লেষণ

৬.১ ভূমিকা: টেকসই ধারণাটি আকস্মিক বা নতুন নয়। এর ইতিহাস বহু পুরানো এবং এর বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে। টেকসই ধারণাটি বিগত প্রায় পাঁচ দশকে জাতীয় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার, কৃষি থেকে পর্যটন, উৎপাদন থেকে নির্মাণ, লেনদেন থেকে ব্যবসায় এবং বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। অনেক দেশ ইতোমধ্যেই ব্যবসায়, পরিবেশ, সম্পদের ব্যবহার, অর্থনীতি, সমাজ এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়নের কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে টেকসই-নীতি গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও ইতোমধ্যে তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় টেকসই-নীতিকে সমন্বিত করেছে।[১] যুক্তরাজ্য তার জাতীয়-নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টেকসই-নীতিকে "Securing the Future–the UK Sustainable Development Strategy"[২] 'র অন্তর্ভুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে টেকসই উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে।[৩] 'ফরচুন' ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ৫০০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টেকসই-নীতিকে ব্যবসায়ের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের (Corporate Social Responsibility-CSR) কৌশল রূপে গ্রহণ করেছে। এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাইক, কোকা কোলা, ডেল কম্পিউটার এবং স্টারবাক্স কফি অন্যতম। সুতরাং বলা যায় যে, টেকসই ধারণাটির ব্যবহার বহুমাত্রিক। এই অধ্যায়ে টেকসই ধারণার যৌক্তিক ভিত্তি, টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি, ব্যবসায়ে টেকসই-নীতির অনুশীলন এবং প্রয়োগের বিভিন্ন দিকের ন্যায্যতা বিশ্লেষণ করে পরিশেষে নীতিটিকে নৈতিকতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হবে।

৬.২ টেকসই ধারণার যৌক্তিক ভিত্তি: শিল্পায়নের কারণে বর্তমান প্রজন্মের দ্রুত বৈশ্বিক উন্নতি সম্ভব হলেও এই উন্নয়ন আমাদের পরবর্তী বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কোন কোন ক্ষেত্রে হুমকির সম্মুখীন করছে। অর্থাৎ প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি ঠিকই কিন্তু এই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে ক্রমাগতভাবে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যেমন একুশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে প্রকৃতিতে যে সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারন করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলস্তরের নিম্নগামীতা, আবাদযোগ্য মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, মৎস্য ক্ষেত্রে ধ্বস, বনভূমির ক্ষয় এবং উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি। ১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৫ বিলিয়ন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা

নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করা সত্ত্বেও ২০৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮.৯ বিলিয়নে উন্নীত হবে বলে বিশেজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অপেক্ষাকৃত বেশি হবে এবং এসব দেশ জনবহুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অবশ্য তাদের জনসংখ্যা ইতোমধ্যেই ধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ধরণীর ধারণক্ষমতা সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। যেমন আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে আসায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবাদযোগ্য মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ০.২৪ হেক্টর থেকে কমে ০.১২ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মোট আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ যদি এই শতাব্দীর অর্ধেক পর্যন্ত একই থাকে তাহলে ২০৫০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দাঁড়াবে ০.০৮ হেক্টর। মানুষ খাদ্যের জন্য সমুদ্রের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। ১৯৫০ সালে বাৎসরিক সামুদ্রিক মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টন এবং ১৯৯৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ মিলিয়ন টনেরও বেশি দাঁড়িয়েছে। এ কারণে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাৎসরিক সামুদ্রিক মাছ আহরণের পরিমাণ যদি ৯৫ মিলিয়ন টনের বেশি হয় তাহলে তা সমুদ্রের ধারণক্ষমতাকে অতিক্রম করবে। এমনক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু সামুদ্রিক মাছ আহরণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে।[৪]

কৃষক অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে যার ফলে মানবদেহ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়েছে। যেমন শস্য দানা খেয়ে বিষক্রিয়ায় অনেক পাখি মারা গেছে। সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কারণে প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলে খ্যাত কেঁচো এখন আর দেখা যায় না। আবার খাল ও জলাশয়ে শামুকের অবাধ বিচরণও হারিয়ে গেছে এবং মিষ্টি পানির ছোট প্রজাতির মাছের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছে। আবার বাংলাদেশের জেলেরা কারেন্ট জাল ব্যবহার করে মাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করছে। এই জাল দিয়ে ছোট ছোট বড় সকল মাছই ধরা যায় যা প্রকারান্তরে এ প্রজাতির বিলুপ্তিকে তরান্বিত করার সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বনসম্পদও নিঃশেষিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ দশকে বিশ্বের বনভূমির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে এবং বনভূমির ক্ষতির এই হার উন্নয়শীল দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি। যেমন ২০৫০ সালে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ০.৩৮ হেক্টরে এসে দাঁড়াবে। কারণ মানুষ তার ক্রমাগত চাহিদা পূরণ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে প্রাকৃতিক বনসম্পদের বিনাশ করছে এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বনসম্পদের ধারণক্ষমতাকে অতিক্রম করেছে। এভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের বিলুপ্তির প্রবণতাটি মানবজীবনকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

করবে। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য যত বেশি বিলুপ্ত হচ্ছে বাস্তুসংস্থানও তত বেশি বিনষ্ট হচ্ছে এবং একটি সময়ে পুরো বাস্তুসংস্থানই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে যা অপূরণীয়।[৫]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই সূচকের নিম্নগামীতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবাদযোগ্য ভূমিতে বাসস্থল নির্মিত হওয়ায় মাথাপিছু আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে, সামুদ্রিক মাছের দুষ্প্রাপ্যতা, সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও প্রাণীর বিলুপ্তি, প্রাকৃতিক বনসম্পদের বিনাশ করে প্রকৃতির উপর কুঠারাগাত প্রভৃতি নির্দেশ করছে যে মানবজাতি প্রকৃতির ভারসাম্যের কথা বিবেচনা না করেই নিজেদের ক্ষুদ্রস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর এরূপ খড়গ হস্তক্ষেপ করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের এরূপ আচরণ কতিপয় জটিল নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যেমন এ ধরনের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কি শুধুই বর্তমান প্রজন্মের জন্য? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব রয়েছে কি? শিল্প-প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে? এইসব ক্ষতি আমাদের উন্নয়ন ও জীবন ধারণের জন্য কতোটুকু হুমকি? এইসব ক্ষতি বন্ধ করতে আমাদের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? এসব অপরিকল্পিত উন্নয়ন কি টেকসই? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের ক্রিয়াশীল আচরণ প্রকৃতির উপর বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটনে সহায়তা করছে। এই বৈষম্যমূলক অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি? এই বৈষম্যমূলক অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো যতদূর সম্ভব প্রকৃতির ক্ষতির আশঙ্কা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং তার উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রয়োজন মিটানো। অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের প্রয়োজন- এ দু'টি বিষয়কে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় রেখে টেকসই ও সমন্বিত ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানোই উপরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাই টেকসই ও সমন্বিত ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য দু'টি মৌলিক বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রথমত: মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা এবং দারিদ্রতা দূর করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়ত: উন্নয়নের সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারণ করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষমতা প্রকৃতির ধারণক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত। ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার করতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হবে। তাই প্রাকৃতিক ধারণক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এভাবে মানুষের প্রয়োজন ও প্রকৃতির ভারসাম্য অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিতভাবে দীর্ঘমেয়াদী সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হিসেবে টেকসই ধারণাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬.৩ টেকসই ধারণার নৈতিক ভিত্তি: বর্তমানে টেকসই ধারণাটি সুপরিচিত ও সাধারণভাবে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালার কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এই নীতিমালা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নতমানের জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সমাজের বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে। ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধ ও বসবাসযোগ্য পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে ন্যূনতম শর্ত হিসেবে টেকসই ধারণাকে বিবেচনা করা হয়েছে যা নৈতিক দায়বদ্ধতাকে ইঙ্গিত করে। এরূপ ইঙ্গিতপূর্ব সংজ্ঞা আমরা ব্রাটল্যাণ্ড প্রতিবেদনে পেয়েছি যা পরবর্তিতে টেকসই উন্নয়ন অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এই সংজ্ঞাটিও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের ন্যায্যতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এক অভিনব নৈতিক ধারনার জন্ম দিয়েছে। এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকই বলে থাকেন, যেখানে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না সেখানে ভবিষ্যৎ মানুষের চাহিদা মেটানো কিভাবে সম্ভব হবে? তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রকৃতপক্ষেই কোনো অধিকার রয়েছে কিনা সে প্রশ্নও থেকে যায়। এই প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক মার্টিন পি. গোল্ডিং। তিনি তাঁর "Obligations to Future Generations" প্রবন্ধে বলেন, একটি নৈতিক সমাজ দু'টি উপায়ে গঠন করা যেতে পারে– (ক) সমাজের সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট চুক্তি (Explicit contract) সম্পাদনের মাধ্যমে অথবা (খ) সামাজিক ব্যবস্থার (Social arrangement) মাধ্যমে যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্যই পারস্পারিক উদ্যম ও প্রচেষ্টা দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সুস্পষ্ট চুক্তি বা সামাজিক অঙ্গীকার কোনোটিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় এবং এভাবে চুক্তি অথবা সামাজিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায়, যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান মানুষের মতো একই ভাবধারা বা স্বার্থের অংশীদার হতো তাহলে হয়তো বলা যেতো যে তাদের অধিকার আমাদের অধিকারের সমান বা অনুরূপ। কিন্তু গোল্ডিং যুক্তি দেন যে, প্রযুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনের কারণে আমাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থা জানা সম্ভব নয় এবং তাদের জীবন ও মূল্যবোধের বিষয়টিও অজ্ঞেয়।[৬] ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্পর্কে গোল্ডিংয়ের প্রতিক্রিয়ার বিপরীত ধারাও লক্ষণীয়। অর্থাৎ অন্য এক দৃষ্টিতেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া যায়। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আমাদেরকে বহুভাবে উপকৃত করেছেন। মূলতঃ পূর্বপুরুষদের অবদানের কারণেই আমরা একটি বাসযোগ্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু যেহেতু তাঁদের সাথে আমাদের পারস্পারিক বিনিময় সম্পর্ক নেই তাই প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই কেবল পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। এই দায়িত্বের ধারণাটি '*On*' বিষয়ক জাপানী ধারণার সদৃশ। '*On*' দাবি করে যে, ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের জন্য উন্নত অথবা উন্নততর পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করা যায়। এ কারণে ভবিষ্যতের মানুষকে পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই বর্তমানের মানুষ ভবিষ্যতের মানুষের ঋণ পরিশোধ করতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। অর্থাৎ পূর্বপুরুষেরা আমাদের জন্য যেরূপ ভালো কাজ করেছেন তার সমান বা তার থেকে বেশি যদি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য করি তাহলেই কেবল এই ঋণ শোধ হতে পারে।[৭] তাই আমাদের কর্মকাণ্ডের খারাপ পরিণতি যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদাপন্ন না করে সেদিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। বর্তমান যুগের অসংখ্য প্রযুক্তি যেমন জিন প্রকৌশল, ন্যানো প্রযুক্তি, রাসায়নিক পদার্থ, এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক, পারমানবিক চুল্লী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপজ্জনক বা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে আমরা যে সম্পদ ব্যবহার করি, যে পণ্য তৈরী করি এবং যে পরিমাণ বর্জ্যের সৃষ্টি হয় তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমূহ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই সমূহ সমস্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান মানুষের চাহিদা পূরণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ, কল্যাণকর, ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত পৃথিবী নিশ্চিত করার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাই টেকসই ধারণার নৈতিক ভিত্তি।

৬.৪ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি: একুশ শতকের প্রারম্ভিক সময়কে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেশনসমূহ ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনা, ব্যবসায় পরিবেশের জটিল চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে সমাধানকল্পে উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নেতৃস্থানীয় পরিবর্তনের কৌশলগত চিন্তাকে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলো সরবরাহকারী, পরিবেশক বা বণ্টনকারী, ভোক্তা বা ক্রেতা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শেয়ারমালিক ইত্যাদি এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলো অংশিজন, অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি। টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতে, “SBD [Sustainable business development] may be perceived as a subset of the broader concepts of sustainability and sustainable development as defined by the international community of nations and the United Nations.”[৮] জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গোষ্ঠী টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা (Sustainability) ও টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development) এ দু’টি বৃহত্তর ধারণার উপসেট (Subset) হিসেবে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন (Sustainable business development/SBD)- কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমি প্রথমে টেকসই

ক্ষমতা বা টেকসহিতা ও টেকসই উন্নয়ন ধারণা দু'টিকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তীতে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

৬.৪.১ টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা: বিগত পাঁচ দশক ধরে বিভিন্ন গবেষণায় স্বীকৃতি পেয়েছে যে, একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তার বাহ্যিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং উক্ত প্রভাবের কারণে প্রতিষ্ঠান তার সমাজ, সম্প্রদায়, জনগণ ও শেয়ারমালিক বা অংশিজনদের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। প্রতিষ্ঠানের এ প্রভাব সমাজে দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান করে বলে লণ্ডনের রয়েল হলোওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এলিনা জিওবানোনী এবং গুগল পণ্ডিত জিয়াকোমু ফেবিয়িটি তাঁদের "What is Sustainability? A Review of the Concept and its Applications" প্রবন্ধে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা সম্পর্কে বলেন, "…'sustainability' refers to a stay,…."[৯] টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা হলো স্থিতিশীলতা বা স্থিতিশীল থাকা। টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা ধারণাটি বিশ্লেষণে নিউ ইয়র্কের লালি স্কুল অব ম্যানেজম্যান্ট এণ্ড টেকনোলোজির (Lally School of Management and Technology) রেন্সসেলর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের (Rensselaer Polytechnic Institute) ব্যবস্থাপনার অধ্যাপক ডেভিড এল. রেইনির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি তাঁর *Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation, and Leadership* গ্রন্থে বলেন, "Sustainability implies that all human and business activities are carried out at rates equal to or less than the Earth's natural carrying capacity to renew the resources used and naturally mitigate the waste streams generated."[১০] অর্থাৎ টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা বলতে মানুষের দৈনন্দিন ও ব্যবসায় কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বর্জ্য যেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় সমান বা কম হয় সেই বিষয়টি ইঙ্গিত করছেন। এদিকটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইংল্যান্ডের ডি মন্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় ও আইন অনুষদের অধ্যাপক ডেভিড ক্রোদার ও অন্যান্যরা তাঁদের *The Goals of Sustainable Development: Responsibility and Governance* গ্রন্থের "Responsibility and Governance in Achieving Sustainability" প্রবন্ধে বলেন, "Sustainability therefore implies that society must use no more of a resource that can be regenerated."[১১] অর্থাৎ তাঁরা সমাজের সম্পদ যা পুনরুৎপাদিত করা সম্ভব নয় তা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও সম্পদের পরিমাণ এই হারে বৃদ্ধি পায় না। তাই বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশগত বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও উন্নত দেশ যেমন আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানসহ আরো অন্যান্য রাষ্ট্র

টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার নীতিকে গ্রহণ করেছে। টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা ধারণাটি বিকাশে ইংল্যান্ডের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস এণ্ড সোসাইটি স্কুল অব ম্যানেজম্যান্টের (Business and Society School of Management) অধ্যাপক এণ্ড্রু ক্রেইন ও টরেন্টোর ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুলিচ স্কুল অব বিজনেসের জননীতির অধ্যাপক ডির্ক ম্যাটেনের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা তাঁদের *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* গ্রন্থে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা সম্পর্কে বলেন, "Sustainability refers to the long-term maintenance of systems according to environmental, economic and social considerations."[১২] এ সংজ্ঞায় টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা বলতে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ- এই ত্রয়ী উপাদানের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ টেকসই মূলত পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিষয় যা নিশ্চয়তা দেয় যে আমাদের কর্মকাণ্ড উক্ত ত্রয়ী উপাদানের উপর যে প্রভাব ফেলবে তা যেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ না হয়। অতএব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকেও সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬.৪.২ টেকসই উন্নয়ন: ১৯৯২ সালের রিয়ো আর্থ সামিট (Rio Earth Summit)-এর পর থেকে শুধু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড নয় বরং শিল্প ও সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী কাঠামো হিসেবে বহুল আলোচিত একটি ধারনার উদ্ভব ঘটেছে যার নাম টেকসই ধারণা। টেকসই ধারণাটি ক্রমবর্ধমানভাবে একটি বহুল ব্যবহৃত ধারণা এবং বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, পোশাকশিল্প, পরামর্শদাতা সংস্থা, আন্দোলনকারী দল ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যপকভাবে আলোচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিস্তৃত ব্যবহার সত্ত্বেও টেকসই ধারণাটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উন্নয়ন প্রসঙ্গে।[১৩]

উন্নয়ন ধারণাটি বর্তমান বিশ্বে বহুলালোচিত ও বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। উন্নয়ন ধারণাটি বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ তথা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অধিকতর পরিচিতি লাভ করে। এ সময়ে উন্নয়ন বলতে প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝানো হতো। কালের পরিক্রমায় উন্নয়নের এই এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তীত হয়ে বর্তমানে আরো অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে উন্নয়ন ধারণাটিকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত, শিক্ষা, ব্যবসায়, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।[১৪] এ বিষয়টি বিবেচনা করে ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘ তার *Declaration on the Right to Development*-এর প্রস্তাবনায় উন্নয়নের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে চায়,

"…development is a comprehensive economic, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting therefrom."[১৫]

জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নের প্রদত্ত সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক–এই চারটি উন্নয়নের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষ স্বাধীনভাবে, অর্থপূর্ণ উপায়ে অংশগ্রহণ এবং এটির অর্জনকে সবার মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হবার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উন্নয়নের বহুমাত্রিকতার কারণে এর সংজ্ঞা, সীমা, নির্দেশনা, প্রায়োগিক দিক, প্রয়োগের মানদণ্ড, বণ্টনের ন্যায্যতা, বর্তমানের সীমা ও ভবিষ্যৎ সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণে পরবর্তীতে উন্নয়ন ধারণাটির পূর্বে টেকসই ধারণাটি সংযোজিত করে যা টেকসই উন্নয়ন নামে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ইতিপূর্বে টেকসই বলতে আমরা দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান করাকে বুঝেছি এবং উন্নয়ন বলতে বুঝেছি এই দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান অর্জনের প্রক্রিয়াকে। এলিনা জিওবানী এবং জিয়াকোমু ফেবিয়িটি তাঁদের What is Sustainability? A Review of the Concept and its Applications প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, "…'sustainable development' refers to the procees for achieving this state."[১৬] অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন বলতে তাঁরা স্থায়ী অবস্থা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ইঙ্গিত করছেন। অন্যাভাবে বলা যায় যে, উন্নয়ন বলতে পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়াকে বোঝায় এবং চলমান প্রক্রিয়ায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন ধারণাটির বিভিন্ন রকম সংজ্ঞার কারণে তা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অর্থনীতি বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ ডেভিড পিয়ার্স ও তাঁর সহকর্মীগণ টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা সংশ্লিষ্ট চল্লিশটি সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন কোন কোন সংজ্ঞায় সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক তিনটি ব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দিয়েছে অথবা এর যেকোনো একটিকে গ্রহণ করেছে, কোন কোন সংজ্ঞায় ভবিষৎ প্রজন্মের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে অথবা হয়নি, কোন কোন সংজ্ঞায় প্রযুক্তি, সম্পদ, আবর্জনা, দূষণ ও অন্যান্য সমস্যার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। নিচে টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং সে সম্পর্কে কিছু বিচারমূলক বিশ্লেষণ আলোকপাত করা হলো:

টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি ১৯৮৭ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা বা World Council on Economic Development (WCED) কর্তৃক *Our Common Future* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। কমিশন প্রধান নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রাটল্যাণ্ডের (Gro Harlem Brundtland) নামে এই প্রতিবেদনটির নামকরণ করা হয়েছে। ব্রাটল্যাণ্ড কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই পরবর্তীতে ব্রাটল্যাণ্ড সংজ্ঞা নামে পরিচিত। *Our Common Future*-এ টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়, "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."[১৭] ব্রাটল্যাণ্ড প্রদত্ত সংজ্ঞায় টেকসই উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার সঙ্গে আপোস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করছে। ব্রাটল্যাণ্ড প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উন্নয়নের একটি নব দিগন্তের সূচনা করলেও এর বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাটল্যাণ্ডের বক্তব্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উভয় প্রজন্মের কল্যাণ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) এবং বর্তমান মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অধিবাসীর উপর কি প্রভাব ফেলবে সেটির একটি নৈতিক নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই বলা যেতে পারে যে, টেকসই উন্নয়ন বলতে আন্তঃপ্রজন্ম ও অন্তঃপ্রজন্ম উভয় ধরনের ন্যায্যতা সুরক্ষা করাকে বোঝায়। কিন্তু এর বাস্তবায়ন আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন করে। কেননা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনযাত্রার মান তথা বাসযোগ্য পৃথিবী বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। স্বল্পোন্নত দেশগুলো জনগণের বেঁচে থাকার ক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং একইসাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের দায়িত্ব পালনের জন্য উভয় ধরনের উন্নয়ন কাঠামো পরিবর্তন বা গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। এদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, টেকসই ধারণাটি জটিল ও দূরহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচিত। টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় রেখে সুস্থ অর্থনীতি ও সমাজের চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে পরিবেশগত সুরক্ষা ও ভারসাম্য রাখার বিষয়টিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার এই বিবর্তিত ধারণার মূলে রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার, প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় রাখার বাধ্যবাধকতা, মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রজাতির অধিকার এবং এসবের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা।

আমেরিকার খ্যাতনামা সিয়াটল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকক্লস্কি টেকসই ধারণা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। তিনি বলেন,

> "Actions are sustainable if: There is a balance between resources used and resources regenerated. Resources are as clean or cleaner at end use as at beginning. The viability, integrity, and diversity of natural systems are restored

and maintained. They lead to enhanced local and regional self-reliance. They help create and maintain community and a culture of place. Each generation preserves the legacies of future generations."[১৮]

অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকক্লস্কি ব্যবহৃত সম্পদ এবং পুনর্জাতকৃত সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিকে টেকসই ক্রিয়া বলে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা, অখণ্ডতা এবং বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি প্রজন্মই পরবর্তী প্রজন্মের যথাযথ উত্তরাধিকারী।

আমেরিকার বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, উদ্যোক্তা, সাংবাদিক ও লেখক পল হকেন ২০ বছর বয়স থেকেই ব্যবসায় ও পরিবেশ পরিবর্তনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি টেকসই সম্পর্কে বলেন, "Leave the world better than you found it, take no more than you need, try not to harm life or the environment, make amends if you do."[১৯] অর্থাৎ টেকসই বলতে তিনি পৃথিবীকে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া অবস্থা থেকে অধিকতর বাসযোগ্য করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবন ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা থেকে নিজেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ভোগের উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন দু'টি ধারায় বিভক্ত। সবল টেকসই উন্নয়ন এবং দুর্বল টেকসই উন্নয়ন। সবল টেকসই উন্নয়ন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণকে সমর্থন করে থাকে। আমেরিকার প্রখ্যাত টাফট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান এণ্ড এনবায়রনম্যান্টাল পলিসি এণ্ড প্লানিংয়ের (Urban and Environmental Policy and Planning) অধ্যাপক জুলিয়ান এজিম্যান ও অন্যান্যরা তাঁদের *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World* গ্রন্থে সবল টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, "Hard or strong sustainability implies that renewable resources must not be drawn down faster than they can be replenished in that natural capital must not be spent – we must live off the income produced by that capital."[২০] অর্থাৎ সবল টেকসই উন্নয়ন বলতে বুঝায় নবায়ন-অযোগ্য সম্পদগুলো দ্রুত নিঃশেষ করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা অবশ্যই সেই মূলধন দ্বারা অর্জিত আয়ের উপর জীবন-যাপন করি। অন্যদিকে, দুর্বল টেকসই উন্নয়ন প্রাকৃতিক মূলধনকে মানবসৃষ্ট মূলধনের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করে। এ কারণে জুলিয়ান এজিম্যান ও অন্যান্যরা তাঁদের *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World* গ্রন্থে সবল টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন,

> "Soft or weak sustainability accepts that certain resources can be depleted as long as they can be substituted by others over time. Natural capital can be used up as long as it is converted into manufactured capital of equal value."[২১]

দুর্বল টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য হলো কতিপয় সম্পদকে বিকল্প সম্পদের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁরা প্রাকৃতিক মূলধনকে শিল্পজাত মূলধনে রূপান্তরিত করে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এক কথায় দুর্বল টেকসই উন্নয়ন হলো সেই উন্নয়ন যা প্রাকৃতিক মূলধনকে মানবসৃষ্ট মূলধনের (প্রযুক্তি ও যন্ত্র) মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের বিনিময়ে ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করে।

টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন বলতে এমন একটা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার নীতিসমূহ আত্মীকরণ করে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনায় তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের চাহিদা, ভোগ-বিলাস প্রভৃতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে, রাস্তাঘাট, কারেন্ট জালের মাধ্যমে মৎস্য নিধন, ব্যবসায়িক পণ্যে ভেজাল দেয়া ও জালিয়াতি করা, জমিতে কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতি অপরিকল্পিত উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ, ব্যবসায়, রাষ্ট্র, জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানের চাহিদা পূরণে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায়নীতি, শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নই হলো টেকসই উন্নয়ন।

৬.৪.৩ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নঃ উন্নত বিশ্বের ব্যবসায় কর্পোরেশনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ননীতি, কৌশল, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে তাদের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা বিংশ শতাব্দীর কোম্পানির কেন্দ্রীয় কাঠামোর মধ্য থেকে সরকারি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ, বাজার ও প্রযুক্তিগত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মিথস্ক্রিয়াশীল পরিচালনা কাঠামো গঠনের দিকে অগ্রসরমান। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম এবং এর সাথে এক বিবর্তনমূলক পরিবর্তন জড়িত যা ১৯৭০-এর দশক থেকে শুরু করে ব্যবসায় বিশ্বকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কর্তৃত্বের সাথে সাথে, বিশ্বের ব্যবসায়ের পরিবেশ হয়ে উঠছে এক দশক আগের চেয়েও কম ভবিতব্য ও দুঃসাধ্য। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি ক্রেতা বা ভোক্তা, অংশিজন, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের প্রত্যাশা হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন পণ্য উৎপাদন

করবে যা উন্নত ও কম বর্জ্য উৎপাদন করবে এবং তা মানব জাতির স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও পরিবেশের উপর কোন ঋণাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হবে না। এই সকল প্রত্যাশা ও চাহিদার প্রভাব অনেক গভীর। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব দেয়া ও পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। কারণ তারা ব্যবসায়ে ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সাড়া জাগানো, চমৎকার ও ফলপ্রসু অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অর্ন্তভুক্ত করে। ১৯৯০-এর দশকে ব্যবসায়ী সমাজ ভোক্তা সাধারণকে সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ ভোক্তা বা ক্রেতা হলো বাজারের রাজা। বাজারের রাজাকে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তারা ক্রেতাদের জন্য উন্নতমানের পণ্য সৃজনের লক্ষ্যে দক্ষতার উপর অধিক মনোযোগ প্রদান করেন। ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা ও সমস্যাসমূহ ভালোভাবে বোঝার জন্য ব্যবসায়ীকে বৈশ্বিক পরিবেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য আকর্ষণীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

ব্যবসায় হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা অর্জনই নয় সমাজের জন্য ইতিবাচক ফলাফল তৈরি করাও তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সফল প্রতিষ্ঠান তার ক্রেতা বা ভোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অংশিজন, শেয়ারমালিক, সম্প্রদায় এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই টেকসই সফলতার এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নই হলো টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন। ফলে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্বব্যাপী যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে তা নিরসন করে পৃথিবীকে মানব জাতির জন্য বসবাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে অনেক কর্পোরেশন তাদের সম্পদ ও ক্ষমতাকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকল্পে ব্যবহার করছে। এ কারণে ডেভিড এল. রেইনি তাঁর *Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation, and Leadership* গ্রন্থে বলেন, “SBD [Sustainable business development] invites corporations to create a better future through improved and enduring outcomes.”[২২] অর্থাৎ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন কর্পোরেশনসমূহকে উন্নত, স্থায়ী বা টেকসই ও উত্তম ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য উৎসাহিত করে। ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই বৃহৎ ও সমন্বিত ‘কৌশলগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো’ রাখা প্রয়োজন যা সমগ্র ব্যবসায় পরিবেশের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। অর্থাৎ ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ধরনের সত্তার সমন্বয় প্রয়োজন। ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ সত্তা হলো মালিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অংশিজন যারা প্রতিষ্ঠানটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং বাহ্যিক সত্তা হলো ভোক্তা, স্থানীয় জনগণ, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, রাস্তা, পরিবহন প্রভৃতি যা প্রতিষ্ঠানটির

সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়কে টেকসই করার লক্ষ্যে এ প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে নতুবা ব্যবসায়কে টেকসই করা কঠিন হবে যা উদোক্তা, কর্মচারী, কর্মকর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি কারোর জন্যই কাম্য নয়।

তবে আশার কথা হলো যে, বৃহৎ বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো ব্যবসায়ের গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তন করে তা ভোক্তা, সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো অতীত অভিজ্ঞতার ভুল ত্রুটি সংশোধন করছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ কারণে অধ্যাপক ডেভিড এল. রেইনি বলেন,

> "They are doing this through enterprise thinking, strategy development, business integration, visionary leadership and innovation as the principal means and mechanisms for achieving strategic objectives, enduring competitive advantages, and sustainable success."[২৩]

অর্থাৎ টেকসই সাফল্য অর্জনের জন্য উদ্যোগ ভাবনা, কৌশলগত উন্নয়ন, ব্যবসায় সমন্বয়, দূরদর্শী ও স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব, বিচক্ষণতা ইত্যাদিকে কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান করে। উদাহরণ হিসেবে জার্মানীর মিউনিখ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক্স পণ্য তৈরীর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোম্পানি সিমেন্স এজির কথা বলা যেতে পারে। এটি টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে ব্যবসায়ের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত, পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্ব, কর্পোরেট নাগরিকত্ব ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে ব্যবসায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছে। তাঁরা মনে করেন, স্বপ্নদর্শী ও সৎ নেতৃত্ব ও নতুনত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ফলপ্রসূ কর্মপন্থা নির্ধারণই টেকসই সাফল্যের প্রথম কাজ। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ক্রেতা বা ভোক্তার চাহিদা মেটানো এবং আমাদের কর্মী ও শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যায়ন করে তাদের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানো। সিমেন্সের নতুনত্ব গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষিত এবং ক্রেতা, ব্যবসায় অংশীজন, মালিক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় তা অর্জন করা সম্ভব। সিমেন্সের নতুনত্বের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক বিশ্বের জন্য নিত্যনতুন সেবা ও পণ্যের আবিস্কার করছে – যা আপাতত সম্পদে সীমীত হলেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় অসীম।

টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন বলতে উদ্যোগের একত্রীকরণ, কৌশলগত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াসমূহের সুচিন্তিত পারস্পারিক সংযোগ, সম্প্রদায়ের জন্য মানসম্মত পণ্য সরবরাহ, কৌশলগত অংশীদার ও পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক সমন্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যতিক্রমী নেতৃত্ব ও কার্যকর কৌশলের মাধ্যমে টেকসই সফলতা পাওয়া যায়। টেকসই সফলতার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও কোম্পানির সমস্ত

সম্পদকে বাজারের রাজা ভোক্তার চাহিদা পূরণ, ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যবসায় পরিচালনা করার প্রক্রিয়াই টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হিসেবে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো একটি বিশেষ উদ্যোগ যা ব্যবসায়ের মাধ্যমে স্থানীয় পরিবেশ বা বিশ্ব পরিবেশ, সমাজ, সম্প্রদায়, অর্থনীতি প্রভৃতির উপর যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয় তার ন্যূনতম পর্যায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি, কৌশল প্রণয়ন ও নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের একটি সমন্বিত পদক্ষেপ। অর্থাৎ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন মানব সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। কারণ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেসব উপদানের সঙ্গে ভারসাম্যতা বজায় রেখে কৌশল ও নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ কারণে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সাথে আপোস না করেই বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের নীতি ও কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- কোন ব্যবসায় উদ্যোগে সফলতা একক প্রচেষ্টায় অর্জিত হতে পারে না। তাই এটা অর্জনের জন্য ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবার অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়;
- টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন ব্যবসায় নীতি, কৌশল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন বা অধিকারকে খর্ব না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণের নীতি ও কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়;
- টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন ট্রিপল পি (3Ps = Planet, Profit and People)- কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থাৎ Planet যা পরিবেশে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, Profit যা অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং People যা সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট – এই তিনটি বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করে যেন তা ব্যবসায় উদ্যোগ ও অংশিদারগণের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম এবং
- টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন এখন আর পছন্দ বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় বরং ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য এটির অপরিহার্যতা ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে। তবে এর ব্যবহার ও বাস্তবায়ন দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন উন্নত দেশসমূহ গুরুত্ব দেয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষার উপর অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ প্রাধান্য দেয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং টেকসই বা স্থায়ী উন্নয়নকে।

৬.৫ টেকসই ব্যবসায় অনুশীলন এবং কৌশল বাস্তবায়নঃ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যবসায়কে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে টিকে থাকার জন্য চমকপ্রদ নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশল কখনও ব্যর্থ আবার কখনও সফল হয়। কৌশল ব্যর্থ হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। তাই সফল চমকপ্রদ কৌশল গ্রহণ ও অনুশীলনের উপরই প্রতিষ্ঠানের টেকসই সফলতা এবং উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পদক্ষেপকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

৬.৫.১ উদ্যোগ ভাবনাঃ ব্যবসায় বিশ্ব ও এর প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুকে যাচাই-বাচাই করার পদ্ধতিই উদ্যোগ ভাবনা। সাধারণভাবে উদ্যোগ বলতে যেকোন কর্মপ্রচেষ্টাকে বোঝায় এবং ভাবনা বলতে বোঝায় উদ্ভাবন। ব্যবসায়ে উদ্যোগ ভাবনা বলতে মুনাফা লাভ ও ক্ষতির আশঙ্কা ঝুঁকি নিয়ে সামগ্রিকভাবে সকল ক্রেতা-ভোক্তা, খুচরা-পাইকারী ব্যবসায়ী, অংশিজন-শেয়ারমালিকদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত করে ও তাদেরকে নিজেদের ভাবনার সাথে একত্রিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে পরিচালনা করাকে বোঝায়। ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক। ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনার সাথে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নতুনত্ব, ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত। তাই ব্যবসায়কে টেকসই ও উন্নয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা হলো বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসায় সম্পর্কিত ভাবনা, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, মুনাফা পরিকল্পনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই-বাচাই এবং পুণঃমূল্যায়ন করা। এসব বিষয়কে বাস্তবায়ন ও সফল করার লক্ষ্যে ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এছাড়াও ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনা পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের নতুন নতুন উপযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায় ঝুঁকি, মানসম্মত পণ্য ও সময়ের দাবিতে ভোক্তা আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পণ্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ, নতুন কিছু উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। সর্বোপরি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকে থাকা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যবসায় উদ্যোগ ভাবনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা ব্যবসায়কে টেকসই ও উন্নয়নের সোপানে পৌঁছে দেয়ার চালিকা শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.৫.২ কৌশল ভাবনা ও ব্যবসায় সমন্বয়ঃ সাধারণভাবে কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মপরিকল্পনাকে কৌশল ভাবনা বলে। এক কথায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কৌশল ভাবনা হলো

ব্যবসায়ের স্বার্থে কোন কোন সিদ্ধান্ত কখন এবং কিভাবে সম্পাদিত হবে তার পথ নির্দেশনা। ফলে কৌশলগত ভাবনা ও ব্যবসায় সমন্বয় বলতে শুধু কোম্পানির নিজের মতামত নয় বরং এর সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের মতামতের সমন্বয়কে বোঝায়। ব্যবসায়কে টেকসই ও উন্নয়নের শীর্ষে পোঁছানোর জন্য সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিগোষ্ঠির সঙ্গে কৌশল ভাবনাকে সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, সরবরাহকারী, ক্রেতা, সম্প্রদায়, সরকার ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ অংশিজন বলে অভিহিত এবং বাণিজ্য সংঘ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী প্রভৃতি বাহ্যিক অংশিজন বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এবং উল্লিখিত শ্রেণিগোষ্ঠির স্বার্থের সঙ্গে ব্যবসায়ের কৌশল ভাবনার সমন্বয়ের উপর টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৬.৫.৩ স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বঃ সাধারণভাবে নেতৃত্ব বলতে কর্মদক্ষতা ও গুণাবলীকে বোঝায় যা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অন্যকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব হলো ঐ নেতৃত্ব যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টেকসই ও উন্নয়নের স্বপ্ন দেখায়। অর্থাৎ পর্যাপ্ত জ্ঞান, সততা ও নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, কর্মনিষ্ঠা, উদারতা, সৃজনশীলতা, কৌশলগত দক্ষতা, বাজার উপযোগী পণ্য তৈরি করে ভোক্তা আকৃষ্ট করার দক্ষতা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নই হলো স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব। তাই বলা বাহুল্য নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব অনেক। কারণ নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন সফলতা লাভ করতে পারে তেমন দেউলিয়াও হতে পারে। সুতরাং স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই নয় বরং তার সাথে ব্যবসায় মানবতা, প্রাকৃতিক বিশ্ব ও বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের সেতু বন্ধন তৈরি করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যবসায়, অফিস-আদালত, পরিবার, কল-কারখানায়, সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অবদান অনস্বীকার্য। তাই স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব ব্যবসায়কে টেকসই ও উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। বর্তমান বিশ্বে সফল স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফেসবুকের উদ্যোক্তা মার্ক জুকারবার্গ এবং মাইক্রোসফটের বিল গেটস উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে টেকসই ও উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে আসীন করেছেন যা শুধু তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতাই নয় মানবিক মূল্যবোধকেও অগ্রাধিকার প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬.৫.৪ নতুনত্বের মাধ্যমে পরিবর্তন: নতুনত্ব হচ্ছে পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন। যেমন ক্রেতা, পাইকারী বিক্রেতা, সংগঠন ও কোম্পানির অন্যান্য অংশিজন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুফল আনয়নে এমন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে যা ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে সাহায্য করে। নতুনত্বের শর্ত হচ্ছে কৌশলী ও কর্মক্ষম ব্যবস্থাপনা, বর্তমান পণ্য প্রক্রিয়াকে নতুন পণ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রতিস্থাপন, সমাজ ও ক্রেতাদের স্বার্থ বিবেচনা করে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বোপযোগী করে পণ্যের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া। এক কথায় বিশ্বায়নের সাথে সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেও যুগোপযোগী করে তৈরি করতে হবে যেন তা বিশ্বায়নের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হতে পারে। তাই ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে নতুন ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই এ ধরনের পরিবর্তনের দিকে মনোযোগী হতে হবে নতুবা ব্যবসায় টেকসই হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসবে যা সকল অংশিজনদের জন্য দুঃসংবাদ বয়ে আনবে।

৬.৫.৫ পণ্যের উৎপাদন মূল্য হ্রাস: টেকসই ব্যবসায় অনুশীলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো পণ্যের গুণগতমান সমুন্নত রেখে প্রতিষ্ঠান ও সমাজস্থ ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে পণ্যের মূল্য হ্রাস করা। অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির কারণে পানি, বিদ্যুৎ ও বর্জ্য নিষ্কাশনের খরচ বৃদ্ধির অজুহাতে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু যেসকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টেকসই ব্যবসায় অনুশীলন করে তারা ভোক্তা ও জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরূপ বিকল্প ব্যবহারযোগ্য বিষয়সমূহ যেমন পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া, পূণরাবর্তন উপাদান ব্যবহার, পানি-সংরক্ষণ যন্ত্র স্থাপন, কম শক্তিসম্পন্ন বাল্ব ব্যবহার, জ্বালানি সংরক্ষণ, সৌরশক্তি চালিত ব্যবস্থায় পানি উত্তপ্তকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্রয়াস যা টেকসই ব্যবসায় অনুশীলনের পরিবেশগত দিকের উদ্যোগকে উৎসাহিত করে।

৬.৫.৬ জনসংযোগ: জনসংযোগ শব্দটি ১৮০৭ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন প্রথম ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে জনসংযোগ হলো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে জনসাধারণের পারস্পরিক লাভজনক অবস্থা তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত যোগাযোগ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শেয়ারমালিক, অংশিজন, আঞ্চলিক সম্প্রদায়, ভোক্তা, সরবরাহকারীসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক উন্নত রাখার প্রক্রিয়া।[২৪] তাই ইতিবাচক জনসংযোগ টেকসই ব্যবসায় অনুশীলনে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এই সুবিধাটি একটি প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে

পৃথক করবে এবং বাজার ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

৬.৫.৭ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তুষ্টি: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য যেসকল পক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারী হলো অন্যতম। কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তুষ্টি বলতে কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, তাদের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের ক্ষমতায়ন, ক্ষতিপূরণ প্রদান, লক্ষ্য অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহের কাঙ্খিত মানকে বোঝায়। তাই টেকসই ব্যবসায় অনুশীলনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কাজ হলো অর্থনৈতিক সফলতা। প্রতিষ্ঠানের এই মৌলিক কাজটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলসভাবে শ্রম বিনিয়োগ করে এবং প্রতিষ্ঠানও তাদের কাজের দক্ষতা, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতিতে সহায়তা করে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে। এদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় কর্মকর্তা-কর্মচারী হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। কারণ পণ্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ, পণ্যের মোড়ক করা, সেবা সরবরাহ, বাজারের ক্রেতা, প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণভাবে সচল রাখা ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই প্রতিষ্ঠানের এই প্রাণ ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা ক্রিয়াশীল করা অসম্ভব। ফলে টেকসই ব্যবসায় অনুশীলনের স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তুষ্টির প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয়।

৬.৫.৮ ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি: ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে আমরা ঐ ব্যক্তিকে বুঝে থাকি যিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতীত সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে বা অর্ধমূল্যে বা আংশিক মূল্যে বা সম্পূর্ণ বাকিতে বা অর্ধ বাকিতে বা আংশিক বাকিতে বা কিস্তিতে নিজের জন্য কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করে থাকেন। আর ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি বলতে সাধারণত পণ্য ক্রয় ও সেবা থেকে তাঁরা যে মোট উপযোগিতা পেয়ে থাকেন তাকে ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টি বলা যেতে পারে। ক্রেতা বা ভোক্তা তাঁর কাঙ্খিত পণ্য ক্রয় করতে গিয়ে তাদের আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ক্রেতা বা ভোক্তার এই বহিপ্রকাশ সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপরও বর্তায়। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের গুণগতমানের উপর র্নিভর করে ক্রেতা বা ভোক্তার আচরণের বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে। সুতরাং ব্যবসায়কে টেকসই ও উন্নত করার স্বার্থে ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ব্যবসায় অনুশীলন করতে হবে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব হলো ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, পণ্য ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশনা, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য মোড়কে লেখা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের নাম উল্লেখ করা ইত্যাদি।

এসব বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্তি তৈরি হলে বা কোন ক্রেতা বা ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুনাম বা ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা চূড়ান্ত বিচারে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে। তাই ক্রেতা বা ভোক্তার সন্তুষ্টির উপরও টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ধারাবাহিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্থিতিশীল শক্তিশালী ও সুস্থ সমাজ গঠন করা। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এরূপ সমাজ বর্তমান প্রজন্মের জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর পাশাপাশি সমাজে ব্যবহৃত সম্পদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্জ্যের সৃষ্টি, সমাজে প্রযুক্তির ভূমিকা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত শিষ্টাচার ও সেবার সযত্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিও নৈতিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করতে হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টেকসই হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ মনে করেন, টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক– তিনটি উপাদানের একীভূতকরণ। অর্থাৎ টেকসই বলতে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানুযায়ী কোনো ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণকে বোঝায়। আমরা যখন টেকসই ধারণার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এই সংজ্ঞটিকে যথেষ্ট বলে মনে করি তখন এটা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে টেকসই বলতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনকেও বোঝায়। ব্যবসায়ে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা ধারণাটি পাওয়া যায় উল্লিখিত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণ যা ত্রি ভিত্তি রেখা (Triple Bottom Line বা TBL) হিসেবে বহুলভাবে পরিচিত। নিম্নে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলো:

৬.৬ ত্রি ভিত্তি রেখা: ত্রি ভিত্তি রেখা বা ত্রয়ী রেখা ধারণাটি টেকসই কৌশল সংস্থার পরিচালক এবং ব্যবসায় পরিবেশবাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং ইংল্যান্ডের অধিবাসী জন এলকিংটন কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। ত্রি ভিত্তি রেখা সম্পর্কে তিনি বলেন, "TBL is that it represents the idea that business does not have just one single goal-namely adding economic value-but that it has an extended goal set which necessitates adding environmental and social value too."[২৫] এলিকিংটনের মতে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হিসেবে কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াকে নির্দেশ করে না বরং ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য পরিবেশ ও সামাজিক উপাদানের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তার বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ – এই তিনটি উপাদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যা টেকসই

ব্যবসায় উন্নয়নের ত্রি ভিত্তি রেখা হিসেবে পরিচিত। নিম্নে তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

৬.৬.১ পরিবেশ এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিতঃ ব্যসায়ের কাঁচামাল যোগানের প্রধান উৎস হলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হলো প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রাণ। ফলে প্রাণের অস্তিত্ব ব্যতীত যেমনি কোন কিছুই জীবিত থাকতে পারে না তেমনি প্রকৃতি ও পরিবেশকে ধ্বংস করে ব্যবসায়ও পরিচালিত হতে পারে না। তাই টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে অন্যতম ফলপ্রসূ একটি আলোচনা হলো পরিবেশ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ ও প্রকৃতি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে টেকসই বলতে এর পরিবেশগত দিককেই বোঝাত। বিশেষ করে ১৯৭০ এর দশকে পরিবেশগত সমস্যা প্রসঙ্গে টেকসই ধারণাটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যা, পরিবেশগত উদ্বেগ ও শিল্পদূষণ মাত্রারিক্ত আকার ধারন করে। পরিবেশের উপর মানুষের এরূপ কর্মকাণ্ডকে জাতিসংঘ “উন্নতির পথে অন্তরায়” হিসেবে আখ্যা দেয়। পরিবেশের উপর মানুষের এইরূপ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি কনফারেন্সের (Conference on Human Environment) আয়োজন করে। এই কনফারেন্সে ২৬টি নীতিমালা গৃহীত হয় এবং যার অধিকাংশই পরিবেশ কেন্দ্রিক। এসব নীতিমালার মধ্যে তৃতীয় নীতিটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নীতিটি হলো, “the capacity of the Earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable, restored or improved.”[২৬] অর্থাৎ নবায়নযোগ্য অপরিহার্য সম্পদ তৈরীর ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, সাধ্যমতো পুনরুদ্ধার করা ও উন্নত করার দিকটি ইঙ্গিত করছে। স্টকহোম কনফারেন্স জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচী বা UN Environmental Programme (UNEP) প্রণয়নে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। UNEP-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ রক্ষায় শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সহযোগিতা করা। এ লক্ষ্যে UNEP বাস্তু-উন্নয়নের (Eco-development) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাস্তু-উন্নয়ন বলতে নবায়নযোগ্য সম্পদের উৎপাদন ও অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুগপৎ কঠোর নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। UNEP কর্তৃক প্রদত্ত বাস্তু-উন্নয়নের এই সংজ্ঞা টেকসই ধারণার প্রয়োগিক দিককেই নির্দেশ করে।

১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ইউনিয়ন বা International Union for Conservation of Nature (IUCN), বিশ্ব বণ্যপ্রাণী সংস্থা বা World Wildlife Fund (WWF) ও UNEP এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দু’টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি কৌশল প্রস্তুত করে যা বিশ্ব

সংরক্ষণ কৌশল বা World Concervation Strategy (WCS) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই কৌশল প্রণয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ। তাঁরা মনে করেন, উল্লিখিত দু'টি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হওয়াই হলো টেকসই উন্নয়ন। WCS এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে টেকসই উন্নয়নকে অধিকতর বিস্তৃত করা। এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ হচ্ছে, "management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations"[২৭] জীবমণ্ডল ব্যবহারে মানুষের ব্যবস্থাপনা নীতি বা কৌশল যেন কোনভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাওয়া পাওয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ১৯৮৭ সালে বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশন বা World Commission on Environment and Development (WCED, '*Our Common Future*') শিরোনামে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেটি ব্রাটল্যাণ্ড প্রতিবেদন নামে সমাধিক পরিচিত। ব্রাটল্যাণ্ড প্রতিবেদন পরিবেশের একটি সার্বিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার সাথে সাথে টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বিখ্যাত সংজ্ঞাটি প্রদান করে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ব্রাটল্যাণ্ড প্রতিবেদন ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিয়ো ডি জেনেরিও (Rio de Janeiro)-তে অনুষ্ঠিত হওয়া বিখ্যাত রিয়ো বিশ্ব সম্মেলন (Rio Earth Summint)- এর প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। রিয়ো সম্মেলন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া United Nations Conference on Environment and Development অধিবেশনের অন্য নাম। এই সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে *রিয়ো ঘোষণা* (*Rio Declaration*), *এজেন্ডা ২১* (*Agenda 21*), ও টেকসই উন্নয়ন কমিশন বা *Commission on Sustainable Development* গঠন। বিশেষ করে *এজেন্ডা ২১*-এ পরিবেশগত দিককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উন্নয়ন চর্চা ও অর্জনের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও পরবর্তিতে ১৯৯৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কিয়োটা সম্মেলনের (Kyoto Conference on Climate) সময় লক্ষ্য করা যায় যে *এজেন্ডা ২১*-এর লক্ষ্য খুব সামান্যই অর্জিত হয়েছে।

টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের কৌশলগত দিক হলো মানব সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির সমন্বয়। ১৯৮০ সালের দিকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংকট মোকাবেলায় কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। তাই টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সংকটের সমাধানকল্পে *Our Common Future* এ কতিপয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে যা আমরা টেকসই ব্যবাসায় উন্নয়নে পরিবেশের ভূমিকার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি। যেমন:[২৮]

ক) এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে;

খ) এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন যা উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে টেকসই ভিত্তি অর্জনে সক্ষম;

গ) এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা চালু করা যেখানে এসব উন্নয়নের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায়;

ঘ) এমন একটা উৎপাদন ব্যবস্থা যা বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ভিত্তিকে সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতশীল;

ঙ) এমন একটা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা যা সমস্যা সমাধানকল্পে কৌশল অন্বেষণে নিরন্তর চেষ্টায় নিয়োজিত;

চ) এমন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যা অর্থনৈতক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে টেকসই নমুনাকে লালন করে এবং

ছ) এমন একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা করা প্রয়োজন যা সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে এবং আত্মসংশোধনের সুযোগ থাকবে।

বিগত পাঁচ দশক ধরে ব্যবসায়ীরা নিছক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য পরিবেশকে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে এবং ব্যবসায়ীরা মানব সত্তার তথাকথিত মৌলিক প্রয়োজনকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকৃতিকে হুমকির মুখে পতিত করেছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষকরণের একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যা মানব সত্তা ও পরিবেশ উভয়ের জন্যই মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। নিম্নে এরূপ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো:

৬.৬.১.১ জনসংখ্যা ও ভোগ: বিভিন্ন বৈশ্বিক সমস্যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো জনসংখ্যা সমস্যা। বিশ্বে প্রতিনিয়তই জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু জনসংখ্যার জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের যোগান হচ্ছে গাণিতিক হারে। যেমন একটি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ৪৪ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬৫ সলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৩.৪ বিলিয়ন যা ২০০৯ সালে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৮ বিলিয়ন এবং ২০50 সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা হবে ৯.৪ বিলিয়ন।[২৯] ফলে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের সমন্বয় পৃথিবীর ধারণক্ষমতাকে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করছে যা পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিশ্বের উন্নত বা ধনী দেশসমূহের জনসংখ্যা অনুন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও ধনী দেশসমূহ সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের দিক দিয়ে গরীব দেশসমূহের

তুলনায় অনেক বেশি। ফলে অনুন্নত দেশসমূহের তুলনায় ধনী দেশসমূহ অনেক বেশি প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতির মাধ্যমে পুরো বিশ্বকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বৈশ্বিক আঞ্চলিক নয়। একটি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশগুলোর জনসংখ্যা মোট বৈশ্বিক জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও কম হওয়া সত্ত্বেও তারা বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ করছে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। শিল্প বিপ্লবের সূচনালগ্ন থেকে জৈব জ্বালানী দহনের কারণে বিশ্বের মোট কার্বনডাই অক্সাইডের (CO_2) মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উক্ত দেশসমূহের অবদান শতকরা ৬০ ভাগ।[৩০] সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সম্পদের ভোগ বা ব্যবহারের সমস্যা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের মাথাপিছু ব্যবহারে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিল্পোন্নত দেশগুলো বৈশ্বিক সম্পদের বেশিরভাগই ভোগ করে এবং অপচয় করে। ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের সম্পদ শেষ করার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সম্পদও প্রায় নিঃশেষ করছে। সম্পদ ব্যবহার ও ভোগের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ভোক্তা এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্টের মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ সর্বোচ্চ।[৩১] উপরে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ধনী দেশসমূহে বৈশ্বিক মোট জনসংখ্যার স্বল্প সংখ্যক বসবাস করলেও সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের পরিমাণ অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তাই ধনী ও অনুন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা অনুপাতে সম্পদের ব্যবহার বা ভোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা জনসংখ্যা ও ভোগ- এ দু'য়ের ভারসাম্য অবস্থার উপর পরিবেশগত টেকসই অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৬.৬.১.২ জলবায়ু পরিবর্তন: আমরা সাধারণত কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের দৈনিক বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, তাপমাত্রা, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ ও চাপ প্রভৃতির সামগ্রিক অবস্থাকে উক্ত স্থানের নির্দিষ্ট দিনের আবহাওয়া বলি। কোন স্থানের ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে। কোন এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থ হলো ঐ এলাকার আর্দ্রতার পরিবর্তন, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন, তাপমাত্রার পরিবর্তন প্রভৃতি। অর্থাৎ জলবায়ু হলো বায়ুমণ্ডল, জলীয়মণ্ডল, বরফ আচ্ছাদিত অংশ, ভূমির সম্মুখ ভাগ, এবং প্রাণীমণ্ডল- এই পাঁচটি উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জটিল প্রক্রিয়ার প্রকাশ। বর্তমান বিশ্বে অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন। ১৮৯৬ সালে সুইডিশ নোবেলজয়ী রসায়নবিদ সান্তে এরেনিয়াস সর্বপ্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর মতে, দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যাপক পোড়ানোর ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্য বিপজ্জনক করে তুলতে পারে। তাঁর মন্তব্যের প্রায় ৬০ বছর পর ১৯৫৭ সালে সেই দাবির সত্যতার প্রমাণ পায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি যার দ্বারা

প্রথমবারের মতো গ্রীনহাউস শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৩২] গ্রীনহাউস গ্যাস হলো একটি রাসায়নিক যৌগ যা বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড উপাদান সমূহের সমন্বয়ে গঠিত। তবে গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড যা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে নির্গত হয়। এ গ্রীনহাউস গ্যাসগুলো অদৃশ্য সূর্যরশ্মির বিকিরণ শোষণ করে এবং শোষিত এই তাপ আবার বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় ও গ্রীনহাউস গ্যাস এই তাপ ধরে রাখে। এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে নতুবা পৃথিবী অতি শীতল হতো। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল গ্রীনহাউস গ্যাসের দেয়াল হিসেবে কাজ করে যা সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দিলেও তাপটি ভেতরে ধরে রাখে। প্রাকৃতিকভাবে সম্পাদিত এই প্রক্রিয়াকে গ্রীনহাউস গ্যাস প্রতিক্রিয়া বলে। বায়ুমণ্ডলে মানুষ অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস বেশি নিঃসরণ করায় গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে বিশ্বে উষ্ণতা সৃষ্টি করে। মানুষের দৈন্দিন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বন বিনাশ, রসায়ন নির্ভর কৃষির প্রবর্তন, ভোগবিলাসিতার জন্য তাপ বা শক্তি বা বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেলের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হচ্ছে। *The Daily Star বাংলা* অনলাইন সংস্করণের ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবরের এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ৪০০ পিপিএম বা Parts Per Million (PPM) যা ১৭৫০ সালের শিল্পায়ন পরবর্তী সময়ের সর্বোচ্চ রেকর্ড। কিন্তু ২০১৬ সালে উক্ত রেকর্ডটি ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয় এবং এ সময় বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ৪০৩.৩ পিপিএম যা সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামোগত সম্মেলন বা The United Nations Framework Convention on Climate Change জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে দায়ি করেছেন। এটির ধারাবাহিকতায় অনেকে বলে থাকেন যে, অতীতে জলবায়ু মানুষকে পরিবর্তন করতো কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জলবায়ুকে দ্রুত গতিতে পরিবর্তন করছে। মনুষ্য প্রণোদিত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, সুপ্ত প্রভাব এবং অভিযোজন ও প্রশমনের উপায় সম্পর্কে ব্যাপক, বাস্তব, উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছভাবে জানার লক্ষ্যে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা World Meteorological Organization (WMO) এবং জাতিসংঘ (UN) যৌথভাবে ১৯৮৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী সংস্থা বা The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৭ সালে প্রকাশিত IPCC-এর চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বিশ শতকে ০.৩ ± ০.১° সেলসিয়াস (০.৬ ± ০.২° ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন মডেল বা নমুনা অনুযায়ী বিভিন্ন শর্তে ২১০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ০.৮° থেকে ৩.২° সেলসিয়াস

(১.৪ থেকে ৫.৮° ফারেনহাইট) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু, বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ২১০০ সাল নাগাদ ০.০৩ ফুট থেকে শুরু করে ২.৯ ফুট (০.০৯ মিটার থেকে ০.৮৮ মিটার) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।[৩৩] এই নমুনাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে অঞ্চলভেদেও উষ্ণতা বিভিন্ন হবে যা জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্য কর্মের প্রতিটি দিকেরই গভীর প্রভাবকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন, অধিক আঘাতহানী ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, হিমবাহের গলন এবং অন্যান্য ফলাফলগুলো মানুষকে বাসস্থানচ্যুত করবে, খাদ্য সরবরাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস করবে এবং জীবনযাত্রার মানকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, প্রাকৃতিক ও মানব কর্মকাণ্ডের যৌথ ক্রিয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জলবায়ুর অন্যান্য উপাদানের তারতম্য ঘটিয়ে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি করেছে। এরূপ পরিবর্তন আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ, এমনকি অস্তিত্বের জন্যও এক বিরাট হুমকি।

৬.৬.১.৩ খনিজ সম্পদ নিঃশেষকরণ: প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনবায়নযোগ্য সম্পদ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ তাঁদের সমাজের প্রয়োজন মিটাতে ও ভোগ বিলাসের নিমিত্তে প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদগুলোকে প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিকমাত্রায় উত্তোলন করছে যা খনিজ সম্পদ শূণ্য বা নিঃশেষ হওয়ার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করছে। অতি বিলাসী জীবনযাপনের জন্য আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহ খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছে যা সমাজ ও বিশ্ব পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমরা তেল আহরণ ক্ষমতার সর্বোচ্চটা অর্জন করেছি এবং তেল ভিত্তিক পণ্যের সর্বোচ্চ বাজার মূল্যের যুগে বাস করছি। এই পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্যাসোলিন, ডিজেল, জেট তেল, ও তেল ভিত্তিক পলিমার। অন্যান্য প্রধান খনিজ সম্পদ বিশেষ করে ধাতুর ক্ষেত্রেও দৃশ্যপট একই। কপার, জিংক ও অন্যান্য ধাতুর যোগান ও ব্যবহারের উপর সাম্প্রতিক খনিজ সম্পদ গবেষক রবার্ট গর্ডন ও থমাস গ্রেডেলের অবদান স্মরণীয়। তাঁদের মতে, সব ধাতু ব্যবহারের পর যদি পূনর্ব্যবহারও করা হয় তাহলেও বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতে এসব ধাতু ব্যর্থ হতে পারে। তাই সকল দেশ যদি উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে জীবনযাত্রা উন্নত করার চেষ্টা করে তাহলে পৃথিবীর সকল ধাতু নিষ্কাশন করেও এমনকি এদের ব্যাপকহারে পুনর্ব্যবহারের পরেও সব দেশের ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না।[৩৪] অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তন যেমন সীমিত তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদও সীমিত। কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা মিটাতে গিয়ে মানুষ প্রযুক্তিগত

জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে খনিজ সম্পদ আহরণে অধিক মনোযোগী হওয়ায় পৃথিবীর পরিবেশ হয়ে উঠছে বসবাসের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশের এইরূপ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলো মানুষ কর্তৃক খনিজ সম্পদকে অবিবেচকের ন্যায় আরোহণ বা যথেচ্ছ ব্যবহার। অর্থাৎ পৃথিবীর ভূ-ভাগ ও জলভাগ উভয়ের অভ্যন্তরে বিপুল খনিজ সম্পদকে এমনভাবে আহরণ ও ব্যবহার করতে হবে যেন প্রকৃতির ভারসাম্যতা বজায় থাকে।

৬.৬.১.৪ জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি: জীববৈচিত্র্য শব্দটি বাস্তুসংস্থানে বিদ্যমান থাকা জীবিত প্রাণীর বিভিন্নতা ও সংখ্যাকে বোঝায়। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর গোটা জীবসত্তার, তাদের অন্তর্গত জীন ও সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র। জীববৈচিত্র্য বংশানুসৃত বৈচিত্র্য, প্রজাতি বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য - এই তিনভাগে বিভক্ত। বংশানুসৃত বৈচিত্র্য সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য নয় এবং এটি প্রজাতি বৈচিত্র্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। প্রজাতি বৈচিত্র্য সম্পর্কেও সম্পূর্ণ তথ্য জানা যায় নি। বিজ্ঞানীদের নানা হিসেব অনুযায়ী জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি; এর মধ্যে ১৪ লক্ষ শ্রেণীবিন্যস্ত হয়েছে। ১৪ লক্ষ শ্রেণীবিন্যস্তের মধ্যে ২,৫০,০০০ উদ্ভিদ, ৭,৫০,০০০ কীটপতঙ্গ, ৪১০০ মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ছত্রাক, শৈবাল ও অণুজীব। এখনও অনেক প্রজাতি গ্রীষ্মমণ্ডল, আর্দ্র-উষ্ণ এলাকা ও বিশেষ করে বনাঞ্চলে অনাবিষ্কৃত রয়েছে।[৩৫] এখন প্রশ্ন হলো: জীববৈচিত্র্য কেন আবশ্যক? এর উত্তরে বলা যায়, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা আবশ্যক। কেননা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেঁচে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্য প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংবিধানেও জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন-বিষয়ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সরকার বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সুপরিচিত সুন্দরবনের সন্নিকটে রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অত্র এলাকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সর্বগ্রাসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[৩৬] আমরা স্বীকার করছি যে একটি দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প পথ রয়েছে কিন্তু সুন্দরবনের কোন বিকল্প নেই। তাই বিদ্যুৎকেন্দ্র এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন তা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রজাতি একবার বিলুপ্ত হলে মানব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দিয়ে উক্ত প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিকভাবে ৫ মিলিয়ন থেকে ১০০ মিলিয়ন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ১.৭ মিলিয়ন প্রজাতির শুমারী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, বন বিনাশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতি যে হারে বিলুপ্ত হচ্ছে তাতে আগামী বিশ বছরে প্রায় ২০ শতাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে

যাবে। তাই বন বিনাশ বিধ্বংসী এবং বিশেষ করে ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল বিনাশ পরিবেশ ও মানুষের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।[৩৭] তাই জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন বাস্তুসংস্থান আমাদের জলজ ও ভূমিজ সম্পদের সুরক্ষা প্রক্রিয়াজাত, পুষ্টির উপাদানসমূহ ও এর চক্রাকার প্রক্রিয়ার আধার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ, খাদ্য, ঔষধ সম্পদ, কাঠজাত দ্রব্যাদি, জলজ আবাস এবং আরো অসংখ্য অজ্ঞাত সেবা ও সম্পদের সরবরাহ করে থাকে। জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রজাতি যদি একবার বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তা মনুষ্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দিয়ে ফিরিয়ে আনা বা পুনঃস্থাপন সম্ভব নয় যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই উক্ত প্রজাতির উপর নির্ভরশীল নতুন খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য প্রযুক্তির উৎসসমূহ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে বাস্তুসংস্থানের ক্ষয় বা পতন প্রাকৃতিক নিরোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং অনেক সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

৬.৬.১.৫ মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য নিধন: পৃথিবীর অনেক দেশে অন্যতম প্রধান উপজীবিকা হলো মৎস্য শিকার। এই মৎস্য শিকার দেশ ভিত্তিক ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ শিল্প বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ নদী ও জলাশয়ে ফেলার কারণে তাদের মৎস্য চাহিদা মিটানোর জন্য সামুদ্রিক মাছের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তারা বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে মাছ শিকার করছে। কিন্তু মাছের প্রজনন সেভাবে হচ্ছে না। ফলে কালের বিবর্তনে অনেক মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানেই পৃথিবীর অধিকাংশ মৎস্য প্রজাতির বাস এবং পানির অন্যান্য উৎসেও ২২ হাজারের অধিক মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীর বাস, যার মধ্যে ১৫০ টন ওজন ও ৪০ মিটার লম্বা নীল তিমি থেকে শুরু করে আণুবীক্ষণিক ফাইটোপ্লাংকটন (phytoplankton) ভক্ষণকারী অতিক্ষুদ্র মাছও রয়েছে।[৩৮] অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশে স্বাদু পানির মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয়। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিক হওয়ায় উক্ত দেশসমূহে (উন্নয়নশীল দেশ) বন বিনাশ করে কৃষি জমিতে রূপান্তর, কৃষি জমি, পুকুর, জলাশয়, খাল, বিল, নদী, নালা ভরাট করে আবাসস্থল তৈরি করছে এবং কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপন্নের লক্ষ্যে কীট পতঙ্গ মারার জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করছে যা বারি বর্ষণ বা বন্যার পানির মাধ্যমে বিভিন্ন পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিলে প্রবাহিত হয়ে বহু ধরনের মাছের অস্তিত্ব হুমকিস্বরূপ বা বিলুপ্ত হচ্ছে বা হয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের মৎস্য চাহিদা পূরণের জন্যও সামুদ্রিক মাছের উপর নির্ভশীল হতে হয়।

মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য নিধনকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ- এই দু'দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ (Economic impact) থেকে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য নিধন বলতে সেই

অবস্থানকে বোঝায় যেখানে কাঙ্খিত মাছের মজুত নিঃশেষ হয়ে এমন পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় যা মাছ ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অলাভজনক অবস্থা। জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ (Biological impact) থেকে মাত্রারিক্ত মৎস্য নিধন বলতে সেই অবস্থানকে বোঝায় যখন কোনো প্রজাতির মাছের মজুত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ঐ প্রজাতির মাছ টিকে থাকা বা পুনর্লাভের জন্য মাছের চাষের উপর নির্ভরশীল হতে হয় যা সময় সাপেক্ষ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পুষ্টির জন্য লোনাপানি ও স্বাদুপানি উভয় ধরনের পানিতে বসবাসকারী মৎস্যের উপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (UNFAO) বিজ্ঞানীদের দেয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী মাছের মজুদের ৫২ শতাংশই সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ১৭ শতাংশ মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে, ৭ শতাংশ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়েছে এবং মাত্র ১ শতাংশ রিক্তাবস্থা থেকে ফিরে আসছে।[৩৯] সুতরাং অপরিকল্পিত, বিবেচনাহীন বা নির্বিচারে মৎস্য আহরণ করা হলে পরিবেশ ও সামুদ্রিক সম্পর্কের মধ্যে বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা যায় না। ফলে পরিবেশ ও সমুদ্রের ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য মাছের টেকসই উৎপাদন বা ফলন অবশ্যম্ভাবী করা অপরিহার্য। মাছের টেকসই উৎপাদন বা ফলন হচ্ছে সেই উৎপাদন বা ফলন যা মাছের মজুতকে নিঃশেষ করে না অথবা সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যকেও ধ্বংস করে না। সুতরাং পুষ্টি, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পরিবেশ ও মৎস্যের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

৬.৬.১.৬ মরুকরণ ও পরিবেশ: বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংক্রান্ত যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো মরুকরণ। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ন্যায় এটিও একটি বড় সমস্যা। মরুকরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯৫ সাল থেকে ১৭ জুনকে আন্তর্জাতিক খরা ও মরুকরণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তা প্রতি বছরই উদযাপিত হচ্ছে। এ বিষয়টি বিশ্ব সম্প্রদায়কে আন্দোলিত করেছিল এবং এটির ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ১৯৯৬ সালে ১৭৯ টি দেশের অনুমোদনে মরুকরণ থেকে ভূমি রক্ষায় The United Natons Convention to Combat Desertification গঠন করে।[৪০] পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকা রয়েছে যা মৃত্তিকা স্তর হিসেবে বিবেচিত। এই স্তরগুলোর মধ্যে একটি হলো Aridisols। এটি আবার মরু মৃত্তিকা (Desert Soil) হিসেবেও পরিচিত। এই ধরনের মৃত্তিকা শুষ্ক (Arid) বা কমশুষ্ক (Semi Arid) জলবায়ু অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এই মৃত্তিকাটি আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, সাহারা, দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল বলে পরিচিত নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অল্প পরিমাণে অস্তিত্ব রয়েছে। এই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ অনেক কম থাকে এবং লবণ সহনশীল উদ্ভিদ অল্প পরিমাণে জন্মে। সুতরাং মরুকরণ হলো মাটি বা মৃত্তিকা

অবনমনের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এলাকা ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়ে যায় এবং পানির অভাবে এক সময় ঐ মৃত্তিকা থেকে সবধরনের গাছপালা, প্রাণিসহ অধিকাংশ জীব হারিয়ে যায়। অর্থাৎ মরুকরণের কারণে মৃত্তিকার পুষ্টি ও পানি হ্রাস পায় এবং মাটির মৃত্যু হয়। তাই কোন অঞ্চলের মৃত্তিকা বা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পূর্বে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখা দেয়। একটি হলো ঐ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং শীতকালে গড়ে ১০ থেকে ১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিরাজ করে। অন্যটি হলো ঐ অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত এবং গাছপালা সন্তোষজনক নয়।[৪১] কিন্তু বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রথম লক্ষণটি দেখা গেলেও দ্বিতীয় লক্ষণটির অস্তিত্ব না থাকায় অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ও বনজ সম্পদ থাকায় উক্ত অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হতে বিলম্ব হচ্ছে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব কার্যকলাপ মৃত্তিকার কাঠামো ও বুনট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং ভূমিকে মরুকরণে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে অধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার, বনভূমি বিনাশ ও নদী-নালা ভরাট করে আবাসস্থল তৈরি করছে। অর্থাৎ মরুকরণের কারণে ভূমি অনুর্বর হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে ঐ এলাকায় খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বৈশ্বিক পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষ তার প্রয়োজনে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে উন্নয়ন অভিমুখী হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থা বজায় থাকা দরকার। এই ভারসাম্য অবস্থা তৈরি না হলে প্রকৃতি যেমন হুমকি স্বরূপ হবে তেমনি মানব জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণের ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে ধ্বংস করবে সেটা কাম্য হতে পারে না। তাদেরকে নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করতে হবে যেন টেকসই ব্যবসায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করে পৃথিবীকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা যায়। এবার আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে আলোচনা করব।

৬.৬.২ অর্থনীতি এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত: টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা আলোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি হিসেবে যা বহুলভাবে সুপরিচিত তা হলো অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক উপাদান। সামাজিক ও পরিবেশগত উভয় ধরনের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আধুনিক পুঁজিবাদের সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন। এদিক থেকে বিবেচনা করে আমেরিকার লুসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ই. গ্রে বলেছিলেন, "Capitalism and its destructive tendencies are manifest through its greatest creation—the corporation."[৪২] এখানে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতার সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই ব্যবসায় কর্মকাণ্ড প্রকৃতি ও পরিবেশকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুরক্ষা দেয়ার নিমিত্তে তারা প্রকৃতির সেসব সম্পদ ব্যবহার করবে যেগুলোর পূনঃ উৎপাদনের হার ভোগ্য হারের চেয়ে বেশি এবং বর্জ্য নিঃসরণের মাত্রা পৃথিবীর বর্জ্য শোষণ করার ক্ষমতাকে অতিক্রম করবে না বা বাস্তুসংস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অবনমন করে এমন কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবে না। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রেখে ব্যবসায় কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করার কথাই বলা হচ্ছে যা টেকসই অর্থনীতিকে নির্দেশ করে।

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, দেশের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো শক্তিশালী অর্থনীতি। কিন্তু অর্থনৈতিক খাতে যদি বিশৃঙ্খলা থাকে তাহলে দেশে বিভিন্ন রকমের সংকট লক্ষ্য করা যায়। এরূপ সংকট বিশ্বব্যাপী ২০০০ সালের পরবর্তীতে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বহু ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো এনরন, আলডেলফিয়া, ওয়ার্ল্ডকম, টাইকো, নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, গ্লোবাল ক্রসিং, ইত্যাদি। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক দুর্নীতি, তিতাস গ্যাসে দুর্নীতি, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে শেয়ারের অস্বাভাবিক দরপতন এবং বিভিন্ন সেবামূলক খাতে দুর্নীতি। এসব দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব অসাধু কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব অর্থনীতিতে পরিলক্ষিত হয় যা চূড়ান্ত বিচারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা ইতিপূর্বে আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক দিকের সাথে সম্পর্কিত সম্প্রদায় ও তাদের কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার ভাবনা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবেশবাদীরা যখন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বিবেচনা

করে রাস্তা নির্মাণের মতো কাজের বিরোধীতা করেন সেখানে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সদস্যবৃন্দ মনে করেন রাস্তা নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ রাস্তা নির্মিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং ব্যবসায়, বাণিজ্য, লেনদেন, শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও বেকারত্ব হ্রাস পাবে, কর্মসংস্থানে যাতায়ত করতে সময়ক্ষেপণ কমবে, নাগরিকগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হবে যা দেশের সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার সূচককে নির্দেশ করে। এভাবে ব্যবসায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসের মাধ্যমে সমাজের দারিদ্র্যতা নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়ের এরূপ উদ্দেশ্য বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য হলো দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণ। জনসংখ্যা, শিল্পায়ন, সম্পদ ব্যবহার, ও দূষণের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি নির্দেশ করে যে টেকসইকে প্রাধান্য না দিলে জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে আসবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডের কারণে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টিকে টেকসই ভাবনা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও টেকসই কীভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণে সমর্থ্য হয় তা নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের ভাবনাও উল্লেখযোগ্য। এরূপ অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে হলেন আমেরিকার অর্থনীতিবিদ, গণিতবিদ, লেখক কিনেথ এ্যারো, আমেরিকার অর্থনীতিবিদ এবং মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক হারমান ডালি এবং ডেভিড পিয়ার্স উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতাকে সংকীর্ণ ও বৃহৎ-এ দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা হলো এমন ধারণা যা কেবল স্বীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতার উপর গুরুত্বাপরোপ করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বাজারে উক্ত পণ্যের শেয়ার, মুনাফা ও শেয়ারের মূল্যের ক্ষণস্থায়ী মুনাফা ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী সফলতা নিশ্চিত করা। নব্বই দশকের আমেরিকার স্টকমার্কেটে উত্থানকারী প্রতিষ্ঠান ‘Tech Bubble’ যা বহুলভাবে ‘Dot Com Bubble’ হিসেবে পরিচিত এর কথা বলা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের অ-টেকসই দৃষ্টিভঙ্গির (Unsustainable approach) কারণে বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকতে পারেনি। বৃহৎ অর্থে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব। উদাহারণ হিসেবে ঘুষ দেয়া অথবা অবৈধ লেনদেনের কথা বলা যেতে পারে যা অর্থনৈতিকভাবে অ-টেকসই (Economically unsustainable)- হিসেবে বিবেচিত। কারণ এ ধরনের কর্মকাণ্ড বাজারের দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কর পরিশোধ না করে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তা অ-টেকসই

কর্মকাণ্ডের উদাহরণ। কেননা এসব প্রতিষ্ঠান যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা গঠনে অর্থায়ন না করে তাহলে তারা তাদের ব্যবসায় সফলতা পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন 'Tax Justice Network'- নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার লক্ষ্য হলো কর প্রদান করা থেকে বিরত থাকা অথবা কর পরিহার করা, কর প্রতিযোগিতা, টেক্স হেভেন্স (বিদেশী বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে কার্যকরভাবে কম হারে করারোপণ প্রক্রিয়াই Tax Havens নামে পরিচিত) প্রভৃতির মতো কর্মকাণ্ডের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করছে ও প্রতিরোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।[৪৩]

সুতরাং অর্থনৈতিক প্রেক্ষপট থেকে টেকসই বলতে বোঝায় মুনাফা, উৎপাদনশীলতা ও আর্থিক কর্মদক্ষতার পাশাপাশি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সম্পদ সুরক্ষা যা প্রতিষ্ঠান পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করে। এক কথায় অর্থনৈতিক টেকসই হচ্ছে ব্যবসায়ে টিকে থাকা। সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত সেন্ট গ্যালন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এমেরিটাস অধ্যাপক থমাস ডিল্লিক ও পশ্চিম ইউরোপের মর্যাদপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুলের ম্যানেজম্যান্ট, সোসাইটি এণ্ড কমিউনিকেশনের (Managment, Society and Communication) অধ্যাপক কাই হকার্টস তাঁদের "Beyond the Case for Corporate Sustainability" প্রবন্ধে হারলেম ব্রাটল্যাণ্ড কমিশন প্রদত্ত প্রতিবেদনের আলোকে কর্পোরেট ব্যবসায় বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে টেকসই-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন, "… as meeting the needs of a firm's direct and indirect stakeholders (such as shareholders, employees, clients, pressure groups, communities etc), without compromising its ability to meet the needs of future stakeholders as well."[৪৪] অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অংশিজনদের চাহিদা বা প্রয়োজনের সাথে আপোস না করে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অংশিজনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদা মিটানোর দিকটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে অংশিজন বলতে শেয়ারমালিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, মক্কেল, চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর প্রভুত্ব বজায় রেখে মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না করে একে প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র তথা মানুষের উপযোগী করে গড়ে তোলতে হবে। এসব বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ব্যবসায়ীদের নৈতিক দায়িত্ব। এবার

আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও অর্থনীতি কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করব।

৬.৬.৩ সমাজ এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত: ত্রিভিত্তি রেখা বা টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের সর্বশেষ উপাদান হলো সমাজ সংক্রান্ত। পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উদ্ভবের পর উত্থান হয়েছে সামাজিক প্রেক্ষাপটে টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার ধারণাটি যা তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ধারণা। নব্বইয়ের দশকের দিকে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড ও সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে টেকসই সংশ্লিষ্টতার সমন্বয়ে যাত্রা শুরু হয়। এক কথায় টেকসই সংক্রান্ত পরিবেশগত আলোচনা যখন থেকে পথ চলা শুরু করে তখন থেকেই টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার সামাজিক দিকটিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হারলেম ব্রাটল্যাণ্ড কমিশন প্রদত্ত প্রতিবেদনের আলোকে টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের চাহিদাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকোলা ডেম্পসি এক্ষেত্রে বলেন যে, হারলেম ব্রাটল্যাণ্ড প্রতিবেদনের সংজ্ঞায় আন্তঃপ্রজন্মগত সমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৪৫] এখানে আন্তঃপ্রজন্মগত সমতা হচ্ছে সেই সমতা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য কেবলমাত্র বর্তমান প্রজন্মের ভোগ সীমিতকরণকেই বোঝায় না বরং তা উন্নত বিশ্বের সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠির অটেকসই বা অবিবেচনাপ্রসূত (যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে) ভোগ বিলাসের কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণ যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্তঃপ্রজন্মগত সমতা সামাজিক, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা, বন্টিত ন্যায় ও সামাজিক সমতা ইত্যাদি নির্ধারকসমূহের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা বর্তমান সমাজ কেন্দ্রিক আলোচনা বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে যা বিশেষভাবে ব্যবসায়ের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ধারণার সাথে সম্পর্কিত যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সিএসআর- এ শেয়ারমালিক ও অংশিজনেদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশের ক্ষেত্রেও সুবিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের অগ্রদূত হিসেবে টেকসই ধারণাটিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে টেকসই সংক্রান্ত ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এখানে সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সামগ্রিক বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে আনুপাতিক হারে যে ব্যবধান তা ন্যূনতম বা সহনীয় বা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। সামাজিক

পরিস্থিতি সংক্রান্ত জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জীবনযাত্রার গুণগতমান চমকপ্রদ হলেও বিশ্বব্যপী সামাজিক অবনতি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রতিবেদনটিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশ্বের মোট জিডিপির (GDP) প্রায় ৮০ শতাংশ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মাত্র ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মানুষ ভোগ করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি মানুষ অবশিষ্ট ২০ শতাংশ সম্পদ ভোগ করে। বিশ্বায়নের এই সোনালী যুগে এইরূপ বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করতে না পারলে সব মানুষের জন্য সামাজিকমান, স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা, নিরাপত্তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়বে তেমনি সমাজ, দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থা কেবল কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিবেদনে বিশেষভাবে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী, কাঠামোগত ও অকাঠামোগত অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার পার্থক্যের বিষয়টিকে বিশেষভাব বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।[৪৬] তাই পাশ্চাত্যের ধনী ভোক্তা ও উন্নয়নশীল দেশের গরীব শ্রমিকের মধ্যে, শহুরে ধনী ও গ্রাম্য দরিদ্র মানুষের মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ন্যায় ও সমতা আনয়ন করাই টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতার সামাজিক প্রেক্ষাপটের কেন্দ্রীয় বিষয়।

টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা হলো ব্যবসায় জগতের একটি ক্রমবর্ধমান আন্দোলন (Growing movement)। ২০০৮-০৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পতন ও তাদের প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা সম্পর্কে জনমনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এরূপ কতিপয় আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হলো এক্সন ভান্ডেজ ওয়েল স্পিল, ভূপাল বিপর্যয়, এনরন, টাইকো ও ওয়ার্ল্ডকম প্রভৃতি। এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিভিন্ন প্রকার প্রতারণাপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রদান, অর্থনৈতিক জালিয়াতি, অর্থ তছরূপ বা আত্মসাৎ প্রভৃতির কারণে ব্যবসায়ের প্রতি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রায় মৃত্যু ঘটে। এরূপ কর্মকাণ্ডের কারণে সামাজিকভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কীভাবে এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে পারে সে সম্পর্কে জাতিসংঘ একটি দিক নির্দেশা প্রদান করে। এই দিক নির্দেশাটি UN's Millennium Development Goals- নামে বহুলভাবে পরিচিত। জাতিসংঘ প্রদত্ত Milliennium Development Goals- প্রধান আটটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল যা আজও অর্জিত হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটি থেকেই যায়। উক্ত প্রধান আটটি বিষয় হলো:[৪৭] (ক) চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসন; (খ) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; (গ) লিঙ্গ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন; (ঘ) শিশু মৃত্যুহারহ্রাসকরণ; (ঙ) মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি; (চ) এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করা; (ছ) পরিবেশগত

টেকসই ক্ষমতা বা টেকসহিতা নিশ্চিতকরণ এবং (জ) উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিকাশ। এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা অবশ্যই নিজ নিজ সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এদের কতকগুলো ব্যবসায়ের সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত, অন্যান্য লক্ষ্যগুলো বিস্তৃতভাবে পরিবেশের সাথে জড়িত যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচলনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচী প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। যেমন আমেরিকার প্রসিদ্ধ Multinational Corporation and Technology- নামক ইন্টেল প্রতিষ্ঠান গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা কর্মকাণ্ডে বার্ষিক নগদ অনুদান, সরঞ্জামাদি ও সেবা হিসেবে ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি মার্কিন ডলারের সাহায্য দিয়ে থাকে । পঁচাত্তর হাজার কর্মী নিয়ে সত্তরটি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সম্প্রতি ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি মার্কিন ডলার বাজেটের *Seeing is Believing*- নামক আন্তর্জাতিক অন্ধত্ব প্রতিরোধ কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নগর এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য চক্ষু সেবা প্রদান করা। এছাড়াও ব্যাংকটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের জন্য ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিজ্ঞা করে কোটি মানুষকে এইচ আই ভি বা এইডস রোগ বিষয়ে সচেতন করতে তিনবছর বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে এবং *Nets for Life* নামক একটি কর্মসূচী চলমান যা ম্যালেরিয়ার সংক্রামণ দমনে আফ্রিকায় কাজ করে যাচ্ছে। আমেরিকার জেরক্স নামক ডিজিটাল মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি নথিপত্র উৎপাদান ও সেবার কাজে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে কাগজ ব্যবহার করে এবং প্রতিষ্ঠানটি নেচার কনসারভেন্সি (Nature Conservancy) নামক সংগঠনটির সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উত্তম বনায়ন ব্যবস্থা সৃজনের জন্য নেচার কনসারভেন্সি প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের বার্ষিক ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদান করে। আমেরিকার ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েথ দারিদ্র্য বিশ্বে জীবনরক্ষাকারী ভ্যাক্সিনগুলোকে আরো সুলভ বা সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমান আন্তঃনির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এদের প্রত্যেকটি কর্মসূচীই সমাজের চাহিদা পূরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও গৌণভাবে হলেও ব্যবসায়ের সঙ্গে এ সকল কর্মসূচীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যা আমি পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তবে এসকল প্রধান প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফা অর্জনকে গৌণ বিবেচনা করে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের প্রতি সুদৃষ্টি রেখে ব্যবসায়ের প্রথাগত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যবসায়ে টেকসই উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে একটি মাইলফলক সৃষ্টি করেছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

৬.৭ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি: ইতোমধ্যে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ত্রি ভিত্তি রেখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় ব্যবসায়ের জন্য পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ যে অত্যন্ত অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি উপাদানকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেনে চলে বা চর্চা করে তাহলে তা টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভবনা ক্ষীণ। কারণ ইতিপূর্বে আমরা টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের সংজ্ঞায় টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন বলতে উপরে উল্লিখিত তিনটি উপাদানের সমন্বয়কে বোঝেছি। এ সমন্বিত অবস্থাকে যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত ভেন চিত্রের মাধ্যমেও নির্দেশ করা যায়। প্রদত্ত চিত্রটি হলো:

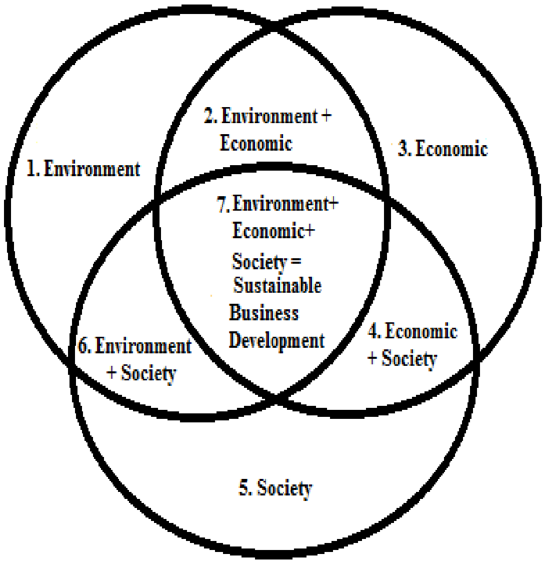

Figure: Triple Bottom Line and sustainable business development

উপরের ভেন চিত্রটি থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র পরিবেশকেন্দ্রিকতার উপর নির্ভরশীল হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহলে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের অবশিষ্ট উপাদান দু'টির (অর্থনীতি ও সমাজ) সঙ্গে উক্ত উপাদানটির কোনরূপ সংযোগ ঘটে না। আবার যদি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিবেশকেন্দ্রিকতা ও অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহলে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের অবশিষ্ট একটি (সমাজ) উপাদানের সঙ্গে উক্ত দু'টি (পরিবেশ ও অর্থনীতি) উপাদানের কোনরূপ সংযোগ ঘটে না। এরূপভাবে যদি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র অর্থনীতি বা অর্থনীতি ও সমাজ বা শুধুমাত্র সমাজ বা পরিবেশ ও সমাজ নির্ভরশীল হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের অবশিষ্ট দু'টি উপাদান বা একটি উপাদানের সঙ্গে উক্ত উপাদান বা উপাদানসমূহের কোনরূপ সংযোগ

ঘটে না। অথচ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ- এই তিনটি উপাদানের সুষম সমন্বয়। অর্থাৎ ভেন চিত্রের সপ্তম অংশটি কেবলমাত্র তিনটি উপাদানের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আমি মনে করি এই তিনটি উপাদানের সমন্বিত অংশ হলো ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করার সবুজ সংকেত প্রদান করে যার দ্বারা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাই উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এই ভারসাম্যমূলক কৌশল (পরিবেশ+অর্থনীতি+সমাজ = টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন) অনুসারে ব্যবসায় পরিচালনা করা হলে প্রতিষ্ঠান যেমন টেকসই হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত শেয়ারমালিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশিজনেরাও এর সুফল ভোগ করবে। অর্থাৎ উপযোগবাদী মতকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যদি টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যবসায় পরিচালনা করা হয় তাহলে তা দীর্ঘকালীন সময় ধরে অধিকাংশ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনবে যা প্রমাণ করাই আমার অভিসন্দর্ভের অভিষ্ট লক্ষ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে সৃষ্টির শুরু থেকে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; যার পরিণতিতে ষাট ও সত্তরের দশকে পরিবেশের অবনয়ন ঘটে। পরিবেশের অবনয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ফসলী জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার, আবাদি জমি ও বন বিনাশ করে আবাসস্থল তৈরি, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আবার, আমরা আমাদের দৈনন্দিন যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি তাও প্রকৃতিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পের কাঁচামালও আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করি। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় না তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও হয় না। উন্নয়ন যেমন আমাদের দরকার তেমনি বেঁচে থাকাও দরকার। প্রকৃতি, পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ- এসব উপাদনের সঙ্গে উন্নয়ন ধারণাটির একটা ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষের চাহিদা ও সেবা পূরণ করে স্বল্পকালীন সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে দীর্ঘকালীন সময় ধরে ব্যবসায় পরিচালনা করাই হলো টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন। তাই টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো সময়ের দাবি এবং তা পূরণ করে ব্যবসায় টিকে থাকা হলো ব্যবসায়ীদের নৈতিক দায়িত্ব। এরূপ নৈতিক অবস্থা থেকে ব্যবসায় পরিচালনা করা হলে ব্যবসায় যেমন টেকসই হবে তেমনি রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি দীর্ঘকালীন এর সুফল ভোগ করবে।

১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অননুদিত), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (বাংলা সংস্করণের প্রাসঙ্গিকতা)।

২. যুক্তরাজ্যের টেকসই উন্নয়ন কৌশল ১৯৯৯ সালে Securing the Future-এ প্রণিত হয় এবং তা ২০০৫ সালের মার্চে হালনাগাদ হয়। চারটি বিষয়েকে প্রধান্য দিয়ে এই কৌশল প্রণিত : টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা এবং পরিবেশগত বৈষম্যকে নির্দেশ করে এমন টেকসই সম্প্রদায়।

৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নে টেকসই উন্নয়ন কৌশল সর্বপ্রথম ২০০১ সালে প্রণিত হয়। ২০০৫ সালে এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা বর্তমানে 'Renewed EU Sustainable Development' নামে পরিচিত। এখানে যে সাতটি সমস্যা বা বাঁধার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই পরিবহন, উৎপাদন ও ভোগ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্নিবেশএবং বৈশ্বিক দারিদ্র্য।

৪. Velasquez, M.l G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, p. 209.

৫. *Ibid.*

৬. Golding, M. P. (1972), "Obligations of Future Generations" in *The Monist*, Vol. 56, No. 1, p. 91.

৭. Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P. (2012), Working *Toward Sustainability: Ethical Decision Making in a Technological World*, New Jersey: John Willey & Sons, Inc., p. 15.

৮. Rainey, D. L. (2006), *Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation, and Leadership*, UK: Cambridge University Press, p. 1.

৯. Giovannoni, E. and Fabietti, G. (2014), "What is Sustainability? A Review of the Concept and its Applications" in Busco, C., Frigo, M.L., Riccaboni, A., (eds.), *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, Switzerland: Springer International Publishing, p.22.

১০. Rainey, D. L., op. cit., p. 714.

১১. Crowther, D., Seifi, S. and Moyeen, A. (2018), "Responsibility and Governance in Achieving Sustainability" in Crowther, D., Seifi, S. and Moyeen, A. (eds.), *The Goals of Sustainable Development: Responsibility and Governance*, Singapore: Springer Nature Private Ltd., p.7.

১২. Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, p. 34.

১৩. *Ibid.*, p. 32

১৪. Witherick, M., Ross, S. and Small, J. (2001), *A Modern Dictionary of Geography*, 4th ed., London: ARNOLD, p.72.

১৫. *United Nations Declaration on the Right to Development*, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, Preamble.

১৬. Giovannoni, E. and Fabietti, G., op. cit., p. 22.

১৭. Agyeman, J., Bullard, R. D. and Evans, B. (2003), "Joined-up Thinking: Bringing Together Sustainability, Environmental Justice and Equity." in Agyeman, J., Bullard, R. D. and Evans, B. (eds.), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, London: Earthscan Publications Ltd., P. 5.

১৮. Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P., op. cit. p. 5.

১৯. *Ibid.*

২০. Agyeman, J., Bullard, R. D. and Evans, B., op. cit., P. 5.

২১. *Ibid.*

২২. Rainey, D. L. op. cit., p. 647.

২৩. *Ibid.*, p. 14.

২৪. আলম, মাহবুবুল (২০০৪), "জনসংযোগ", ইসলাম, সিরাজুল (সম.) *বাংলাপেডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, নিমতলী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৫৭।

২৫. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 34.

২৬. Giovannoni, E. and Fabietti, G., op. cit., p. 24.

২৭. *Ibid.*, p. 25.

২৮. Gudmundsson, H., Hall, R. P., Marsden, G. and Zietsman, J. (2016), *Sustainable Transportation: Indicators, Frameworks, and Performance Management*, London: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p.22.

২৯. Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P., op. cit. p. 6.

৩০. *Ibid.*

৩১. *Ibid.*

৩২. ইসলাম, মো: তোফাজ্জল (২০১২), "জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি গবেষণা", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, বৃহস্পতিবার, ৩১ মে, পৃ. ১৬।

৩৩. Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P., op. cit. p. 7.

৩৪. *Ibid.*, p. 9.

৩৫. ইসলাম, মো. শহীদুল এবং হোসেন, মো. মুকবিল (২০০৪), "জনসংযোগ", ইসলাম, সিরাজুল (সম.) *বাংলাপেডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, নিমতলী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড-৪, পৃ. ৫৯।

৩৬. আলীম, মীর আব্দুল (২০১৬),"কোনটা চাই, সুন্দরবন না রামপাল?", *দৈনিক ইনকিলাব*, শুক্রবার, ১২ আগস্ট, পৃ. ৮।

৩৭. Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P., op. cit. p. 10.

৩৮. *Ibid.*

৩৯. *Ibid.*, p. 11.

৪০. *Ibid.*, p. 13.

৪১. শাইন, আলম (২০২০), "মরুকরণের সঙ্গে তলিয়েও যাচ্ছে বাংলাদেশ", *বাংলা ট্রিবিউন*, ১৭ জানুয়ারি।

৪২. Giovannoni, E. and Fabietti, G., op. cit., p. 27.

৪৩. Crane, A. and Matten, D., op. cit., p. 35.

৪৪. Dyllick, T. and Hockerts, K. (2002), "Beyond the Business Case for Corporate Sustainability", in *Business Strategy and the Environment*, p.131.

৪৫. Giovannoni, E. and Fabietti, G., op. cit., p. 26.

৪৬. Crane, A. and Matten, D., op. cit., pp. 35-36.

৪৭. *Ibid.*, p. 36.

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানুষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে। মানবীয় ক্রিয়াশীল সংগঠনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন। এসব সংগঠনের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠনকে বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে ক্রিয়াশীল তথা গতিশীল করার ক্ষেত্রে অর্থনীতি একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই একে চালিকা শক্তি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এই চালিকা শক্তি সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর জন্য পারস্পরিক লেন-দেনের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। এই লেন-দেন সম্পন্ন হওয়ার নিমিত্তে অবলম্বনকৃত প্রক্রিয়াটিই ব্যবসায় নামে পরিচিত। তাই ব্যবসায় হলো অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বা দিক নির্দেশক। তবে সমাজের সকল সদস্যই যে একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন এমনটা ভাবা সমীচীন নয়। ফলে ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানভেদে নৈতিক ও অনৈতিক পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে ব্যবসায় নৈতিক-অনৈতিক, বৈধ-অবৈধ যেভাবেই পরিচালিত হোক না কেন সমাজে তার একটি ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক প্রভাব প্রতিফলিত হবেই। তাই ব্যবসায় কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে এবং এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নটি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি নৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে টেকসই হওয়ার মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে ঠিক তেমনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে নৈতকতার ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য লাভজনক এ বিষয়টি আমি আমার অভিসন্ধর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি।

ব্যবসায় কীভাবে পরিচালিত হবে এবং এর সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক আদৌ থাকবে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে মতের ভিন্নতা থাকলেও আমি ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকাকে সদর্থক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন হলো: কী ধরনের মূল্যবোধ দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আমরা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ইত্যাদি মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকি। উল্লিখিত মূল্যবোধগুলো কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিকের

মূল্যবোধকেন্দ্রিক আলোচনা। যেমন নান্দনিক মূল্যবোধ কেবল সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অর্থ সম্বন্ধীয় লেনদেনকে নির্দেশ করে, ধর্মীয় মূল্যবোধ আধ্যাত্মিকতাকে নিদের্শ করে। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ উল্লিখিত মূল্যবোধের ন্যায় এককেন্দ্রিক নয় যা আমি প্রথম অধ্যায়েও আলোচনা করেছি। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনায় নেয়। (ক) নৈতিক মূল্যবোধ মানব কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন স্বাধীনতা নিশ্চিকরণের মাধ্যমে মানব কল্যাণ হতে পারে। এছাড়া সুখ, স্বাস্থ্য, সমগ্রতা, শ্রদ্ধা, সাহচার্য, স্বশাসন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেও মানব কল্যাণ হতে পারে। (খ) মানব কল্যাণ অবশ্যই নিরপেক্ষ ও সার্বিক হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্যাণ অধিকাংশ মানুষের কল্যাণকে নিরুৎসাহিত করে।[১] এ কারণে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভূত সমস্যার দায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কখনো এড়াতে পারে না যা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও জননীতির বিষয়গুলো যেমন আমাদের জীবিকা নির্বাহ, কর্মসংস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা সর্বোপরি জনগণের মৌলিক চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে নিরপেক্ষভাবে মানব কল্যাণ সাধিত হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ (অংশিজন, শেয়ারমালিক ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত অন্যকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) রক্ষা করে যৌক্তিকভাবে যখন কোন কাজ সম্পাদিত হয় তখনই তা নিরপেক্ষ এবং নৈতিক বলে বিবেচিত হতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নৈতিকতার ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালিত হওয়া উচিত বলে যেমন অনেকে মনে করেন তেমনি ব্যবসায়ের সঙ্গে নৈতিকতার কোন সম্পৃক্ততা বা সম্পর্ক নেই বলেও অনেকে মনে করেন। ব্যবসায় ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিষয়ক ব্যাখ্যায় তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

প্রথমত: ব্যবসায়ের সাথে নৈতিকতাকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। কারণ এ মতের প্রবক্তাগণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন ব্যতীত নৈতিকতা বা অন্যকোন চিন্তাকে অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বলে মনে করেন। এ মতের ধারক ও বাহকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আলবার্ট কার। তিনি তাঁর "Is Business Bluffing Ethical?" প্রবন্ধে বলেন, ব্যবসায়ের সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই এবং নৈতিকতা হলো ব্যক্তিগত বিষয়। ব্যবসায় ও নৈতিকতা অনুশীলনে যদি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যবসায় নীতিকে অনুশীলনের পক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ এ মতের প্রবর্তকগণ নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত বিষয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখতে চান। নিম্নে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করা হলোঃ

ব্যবসায় ও নৈতিকতার মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ মতের ধারকরা মনে করেন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো শুধু মুনাফা অর্জন করা। তাঁরা কটাক্ষ করে আরও বলেন, যাঁরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে প্রয়োগ করতে চান তাঁরা যেন কোন সন্ন্যাসী বা আশ্রমে বসেন অথবা নিজেকে যেন শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত করেন। কেউ যদি ব্যবসায় করতে চান তাহলে নৈতিকতা অনুসরণ করা অসম্ভব। কারণ এখানে একটি কুকুর অন্য কুকুরের মাংস খায়। অর্থাৎ 'Dog-eat-dog' বচনটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় হৃদয়বান বা অন্যের কষ্টে নিজের রক্তক্ষরণ হবে এমন মানুষের কোন স্থান নেই। এই মতের প্রবক্তরা আরও বলেন যে, 'When in Rome do as the Romans do.' এখানে রোমকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বসবাস করি আমাদেরকে সে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে চলতে হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য বিঘ্নিত হবে এমন নীতি চর্চা করা যাবে না। এক কথায় কেউ যখন ব্যবসায় নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন তখন ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভাববেন এবং কেউ যখন বাড়িতে অবস্থান করবেন তখন অতিথি বা বন্ধুর প্রতি আনুগত্য বা নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভাববেন। কারণ ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্যই হলো মুনাফা অর্জন করা এবং মুনাফা ব্যতীত নৈতিকতার বিষয়টি এখানে বিবেচনায় আনা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। এ মতের প্রবক্তারা বলতে চান যে, ব্যবসায় ও নৈতিকতা হলো পারস্পরিক বিরোধাত্মক (Oxymoron)। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী অর্থপূর্ণ দু'টি ধারণা সমন্বিত করা যেমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি ব্যবসায়ের সঙ্গে নৈতিকতাকে সমন্বয় করাও বিরোধাত্মক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ 'Jumbo shrimp'। এখানে 'Jumbo' অর্থ হলো বড় ও 'Shrimp' অর্থ হলো ছোট চিংড়ি মাছ।[২] অর্থাৎ চিংড়ি মাছ যেমন বড় হতে পারে না তেমনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও নৈতিকতা থাকতে পারে না। অন্য কথায় বলতে গেলে চিংড়ি মাছ ও বড় যেমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি ব্যবসায়ে নৈতিকতা অনুশীলনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরোধাত্মক। আবার, 'deafening silence', 'cheerful pessimist'। এখানে, 'Deafening silence' বা বধির করে দেয়ার সঙ্গে নিরবতা যেমন বিরোধপূর্ণ তেমনি ব্যবসায়ের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কও বিরোধপূর্ণ।[৩] বন্ধ্যা মহিলার বাচ্চা, 'Mr. y is a shrew' ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। আমরা জানি, বন্ধ্যা অর্থই হলো যে মহিলার বচ্চা হয় না। বন্ধ্যা মহিলার বাচ্চার কথা বলা যেমন হাস্যকর তেমনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুশীলনও বন্ধ্যা মহিলার বাচ্চার কথা বলারই ন্যায়। আবার 'Mr. y is a shrew'। এখানে 'Mr. y' বলতে পুরুষকে বুঝানো হচ্ছে এবং 'Shrew' বলতে বদমেজাজি রমণীকে বুঝানো হচ্ছে। অর্থগত দিক থেকে বাস্তবে এ দু'টি বিষয়ের সংমিশ্রণ যেমন অসম্ভব তেমনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সংমিশ্রণও অসম্ভব। এসব বচনের দ্বারা এ মতের প্রবক্তাগণ এটাই

দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ব্যবসায় ও নৈতিকতা পারস্পরিক বিরোধাত্মক অথবা বর্জনীয়। দু'টিকে এক সাথে প্রয়োগ অথবা চর্চা করা সম্ভব নয়। যদি সেটা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে ব্যবসায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ব্যবসায় হলো সামাজিক বা জনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত একটি বিষয় এবং নৈতিকতা হলো ব্যক্তিগত বিষয়। আবার, ব্যবসায়ের সঙ্গে পেশাগত নৈতিকতার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কেননা ব্যক্তিগত বিষয়কে পেশাগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। তাই পেশাগত নৈতিকতায় ব্যক্তিগত বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়কে প্রয়োগ বা ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কারণ ব্যবসায় হলো অত্যন্ত জটিল খেলা। আলবার্ট কার তাঁর "Is Business Bluffing Ethical?" প্রবন্ধে এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন যা আমি পূর্বেই বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। নিম্নে তাঁর যুক্তিগুলো প্রদত্ত হলো:[৪]

- আলবার্ট কার তাঁর প্রবন্ধে ব্যবসায়কে পোকার খেলার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, প্রতিটি খেলাই সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। পোকার খেলার মূল লক্ষ্য হলো নিজে জয়ী হয়ে প্রতিপক্ষ কাউকে দেউলিয়া করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা। অর্থাৎ আলবার্ট কার মনে করেন, কোন একজনকে সর্বনাশ করে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার নামই হলো ব্যবসায়িক খেলা। এ অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য ব্যবসায় সহকর্মীর সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের দাবিকে অস্বীকার করে। তাই আলবার্ট কার বলেন, খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসরণ করে একজন খেলোয়াড় যতক্ষণ তার খেলা পরিচালনা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত খেলোয়াড়ের আচরণ যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে তিনি আরও মনে করেন যে, পোকার খেলার খারাপ দিক নিয়ে যেমন মানুষ ভাবে না তেমনি ব্যবসায় সংক্রান্ত খারাপ দিক নিয়ে মানুষের ভাবা উচিত নয়। কারণ সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা থেকে ব্যবসায়ের নৈতিকতা ভিন্ন। ফলে ব্যবসায়ের এরূপ মূল্যবোধ ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্য ও বিরোধপূর্ণ। এমনকি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার সম্পৃক্তার বিষয়টিও অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর।
- আলবার্ট কার বলেন, আমরা বিশ্বের সভ্য সমাজের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় বসবাস করি এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সফলতার সর্বোচ্চ সংগ্রামের আগ্রাসানকে সমর্থন করে। তাই ব্যবসায়ের ন্যায় প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রকে একজন ব্যবসায়ী নিজের সুবিধা অন্বেষণ করতে গিয়ে কখনো কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান, ক্রেতা, বিক্রেতা, সরকার অথবা জনগণের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করবে না। এরূপ

ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত হবে কৌশলের উপর ভিত্তি করে – মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নয়। তাঁর মতে, ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করার জন্য যেমন এক ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে তেমনি পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, এবং সামাজিকভাবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দায়িত্ব পালনেরও এক ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে। আবার, ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্যও ভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে এবং তা হলো কিভাবে ব্যবসায়ে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। যদি উক্ত মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহলে ব্যবসায় মূলবোধকে অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ ব্যবসায়ের জন্য যা করা কল্যাণকর তা অনুসরণ করাই হলো উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আলবার্ট কার নৈতিকতাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমাদের পরিবার ও ধর্ম আমাদেরকে একগুচ্ছ নৈতিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে যা আমরা ব্যবসায় বা অন্যান্য শ্রেণি গোষ্ঠীতে যোগদানের সময় প্রয়োগ বা ব্যবহার করি না এবং তা উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টও নয়। আলবার্ট কারের উক্ত মতটি প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদকেই ইঙ্গিত করে। কারণ আপেক্ষিকতাবাদীরা যেসব সমস্যা মোকাবেলা করেন তিনিও সেসব সমস্যা মোকাবেলা করেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে কার হলেন একজন অন্তর্নিহিত আপেক্ষিকতাবাদী এবং আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, নৈতিক আপেক্ষিতাবাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই এই আঙ্গিকে আলবার্ট কার কর্তৃক প্রণীত মতটিও ত্রুটিযুক্ত বলে বিবেচিত। তাছাড়া কার তাঁর এই মতটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যবসায়ের সঙ্গে পোকার খেলার সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন যে, ব্যবসায়ের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাঁর এই সাদৃশ্যমূলক যুক্তিটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। যেমন

প্রথমত: আমরা যদি পোকার খেলা ও ব্যবসায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখি যে, পশুপালন ও কৃষিকাজ আবিষ্কারের পর মানুষ বুঝতে পারে যে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি তার নিকট নেই। ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অভাববোধ মিটানোর জন্য পারস্পরিক আদান প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু পোকার খেলার বিষয়ে ইতিহাস ভিন্ন রকম। অর্থাৎ কেউ মনে করেন দশম শতাব্দীতে চীনা সম্রাটদের মাধ্যমে পোকার খেলার প্রচলন হয়, কেউ কেউ দাবি করেন পার্সীয়ান "As Nas" থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে উক্ত খেলার প্রচলন হয়, কেউ কেউ দাবি করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে উক্ত খেলার প্রচলন হয়। তবে উনিশ শতকের শুরুতে আমেরিকার স্মৃতিশক্তি প্রশিক্ষণের প্রবর্তক ও পঞ্চাশেরও অধিক প্রকৃত তথ্যভিত্তিক সাহিত্যের লেখক রবার্ট ফ্রেডরিক ফস্টার দাবি করেন যে, ১৯৫০ সালের দিকে আমেরিকায় উক্ত খেলার প্রচলন হয় যার

উদ্ভব হয়েছিল মানুষকে বিনোদন দেয়ার জন্য। তাছাড়া পোকার খেলার বিষয়টি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত অথবা গৃহীত নয়। অর্থাৎ উক্ত খেলা সম্পর্কে মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ধারণাই রয়েছে। কেননা এই খেলার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে পরাজিত করে অর্থ উপার্জন করা এবং যে কোন সময় যে কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গ বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে খেলা থেকে নিজেকে বিরত রাখার বা প্রত্যাহার করার বা গুটিয়ে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এমনটি সম্ভব নয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পোকার খেলায় এক জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে অন্য খেলোয়াড়ের (One to one) সম্পর্ক হলো বৈরিতাপূর্ণ। কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের (One to many) বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একে অপরের সহিত (many to many) সম্পর্ক অটুট থাকে বলে তা পোকার খেলা থেকে একটু ভিন্ন। কারণ ব্যবসায় পরিচালিত হয় অনেকাংশে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যা অনেকটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া একটি ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয় যা পোকার খেলায় সম্ভব। তাই পোকার খেলার ন্যায় নিজেকে বিরত রাখার সুযোগ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নেই। সুতরাং পোকার খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মনীতি ব্যবসায় অনুশীলন বা প্রয়োগ করা হলে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি গোষ্ঠির পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে যাবে যা ব্যবসায়কে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকেও যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, উভয়ের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস ভিন্ন। সাধারণতঃ সাদৃশ্য দেখানো হয় একই প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আলবার্ট কার ব্যবসায় ও পোকার খেলার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন তা প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাংঘর্ষিক। তাই টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখা ও নৈতিকতার চর্চা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, কার প্রদত্ত মতটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

দ্বিতীয়ত: ব্যবসায়ের প্রধান বা অন্যতম লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ মতের সমর্থকরা মনে করেন, রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক রীতি নীতির দিক বিবেচনায় রেখে ব্যবসায় পরিচালনা করাই শ্রেয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন মেনে ব্যবসায় পরিচালন করাই শ্রেয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা মনে করেন, উত্তম ব্যবসায়ই হলো উত্তম নৈতিকতা। এক্ষেত্রে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য আমি এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আইনি বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে উঠে নৈতিক অবস্থান থেকে

ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই লাভবান হবেন। এ প্রসঙ্গে আমি গুলশান অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করার উদ্দেশে নাভানা গ্রুপের রোড ম্যাপিংয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছি যা নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে। নাভানা গ্রুপের এ কাজটি আইনি বাধ্যবাধকতার চেয়েও বেশী। অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবেই এ কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আইন ও নৈতিকতা উভয়কেই অগ্রাহ্য করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হয় যা প্রশ্নাতীত নয়। এ বক্তব্যকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক্, একদল ডাকাত ছিল। তাদের একজন দলনেতা ছিল এবং ডাকাত দলের সদস্যরা প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলত। কারণ প্রতিজ্ঞার বরখেলাপ হলে তারা ভাল ডাকাত দলে পরিণত হতে পারতো না। কিন্তু এখানে ভাল ডাকাত দল দ্বারা তাদের কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হচ্ছে না। কারণ ডাকাতির অভ্যাসকে এটির নিজস্ব গতি-প্রকৃতিতে বিবেচনা করতে হবে এবং অধিকাংশ ডাকাতই খারাপ কাজ করে। আমরা এক্ষেত্রে কেবল ডাকাত রবিন হুডের কাজের মধ্যে ভিন্নতা পাই এবং যার কাজকে অনেকেই ভাল কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছে।[৫] আমরা জানি, ব্যবসায়ের মাধ্যমে সমাজের জন্য ভাল কিছু করার সুযোগ রয়েছে। উপযোগবাদী দৃষ্টিতে, রবিন হুড গরিব ও হত দরিদ্র সম্প্রদায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য যে ডাকাতি করেছিল তা আপাতঃদৃষ্টিতে অনৈতিক মনে হলেও পরিণতি ভাল হওয়ায় তা সমাজের অনেকের নিকট প্রংশসনীয়। কারণ রবিন হুড যদি এরূপ কাজ না করতো তাহলে হয়তো ডাকাতির সম্পদ থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত অনেকে না খেয়েই জীবন যাপন করে একটা সময় প্রাণে বেঁচে থাকাই কঠিন হতো। তাই এ মতের সমর্থকরা মনে করেন, অর্থ কীভাবে উপার্জিত হয়েছে তা মুখ্য বিষয় নয় বরং সমাজের প্রতি অবদান রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এ মতের সমর্থকগণ বলবেন যে রবিন হুড গরিব ও হত দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। যদিও তার কাজটির প্রকৃতি বিবেচনা করলে অনৈতিক মনে হবে তা সত্ত্বেও সমাজের উন্নতিতে অবদান রেখেছে। কিন্তু উক্ত ধারার উপযোগবাদকে গ্রহণ করা হলে নৈতিকতা উপেক্ষিত হয়। তাই আমি এ অভিসন্দর্ভে উপযোগবাদী মানদণ্ডকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তথা উপযোগবাদের সঙ্গে অধিকার তত্ত্ব ও ন্যায়পরতার ধারণাকে যুক্ত করে নৈতিকতার আলোকে গ্রহণ করেছি যা আমি এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন জায়গায় দেখানোর চেষ্টা করেছি।

তৃতীয়ত: ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন সর্বদা ব্যবসায় সফলতার যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুশীলন ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায় সফলতা আসে এটি সত্য কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন ব্যতিরেকে পরোক্ষভাবে টেকসই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘকালীন

মুনাফা অর্জন সম্ভব হতে পারে। যেমন বিশ্বের খ্যাতনামা ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মার্ক এন্ড কোম্পানির উদাহরণ দেয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৫ বছর ৩২টি দেশের ৩০ মিলিয়ন লোককে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে আসছিল।[৬] উক্ত প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে গৌণ মনে করে নৈতিকতা ও মানবিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে সুনামের সাথে দীর্ঘকালীন ব্যবসায় করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা আজও চলমান। আশির দশকের দিকে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কিছু অঞ্চলের নদী সমূহে কালো মাছির ন্যায় এক ধরনের ক্ষুদ্র পতঙ্গ ছিল। এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ মানুষের শরীরের কামড় দেয়ার কারণে চামড়ার নিচে এক ধরনের জীবাণু তৈরি হয়েছিল যা চুলকানির প্রদাহ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি করত। এক পর্যায়ে তা মানুষের চোখেও সংক্রমিত হত এবং চোখ অন্ধ করে দিত যা 'River Blindness' রোগ নামে পরিচিত। এসব অঞ্চলের প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত রোগের এরূপ প্রাদুর্ভাবের কারণে ঐসব এলাকায় বসবাসরত জনগণের একটি বড় অংশ তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে অভিবাসী হতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি অনেকে অসহনীয় যন্ত্রনার কারণে আত্মহত্যাও করেছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মার্ক এন্ড কোম্পানির একজন গবেষক ও বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আবিষ্কার করলেন যে তাদের কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রাণীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইভারম্যাকটিন নামক ঔষধটির যদি কিছু গুণগত মান সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তাহলে এর মাধ্যমে 'River Blindness' নামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেয়া সম্ভব। উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এবং তাঁর গবেষকদল উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. পি. রয় ভেইজলসকে বর্তমানে প্রাণীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত টীকা বা ভেকসীনটিকে মানব সংস্করণ উপযোগী করে প্রস্তুত করার অনুমতি দেয়ার অনুরোধ করেন। শত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ সাত বছর গবেষণা করে ইভারম্যাকটিন নামক ঔষধটিকে ম্যাকটিজান নামক ঔষধে রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বিস্তৃত 'River Blindness' নামক রোগের সমস্যা দূরীকরণের জন্য উক্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ঔষধ তৈরী করে এবং সেখানে তা বিনামূল্যে বিতরণ করে। জনগণকে এ সেবা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিরও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ড. পি. রয় ভেইজলসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি এত বড় ব্যবসায়িক ঝুঁকি কেন নিয়েছিলেন? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ যখন আবিষ্কার করলেন যে বর্তমানে প্রাণীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেকসীনটিকে মানব সংস্করণে রূপান্তর করে ঐ এলাকার মানুষকে 'River Blindness' নামক রোগ থেকে মুক্তি দেয়া

সম্ভব তখন আমরা নৈতিকভাবে সেটা করতেই বাধ্য হয়েছিলাম এবং এক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকিটা ছিল গৌণ। পরবর্তীতে উক্ত প্রধান নির্বাহী তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে জাপানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে দেখতে পান যে, মার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানটি জাপানের বাজারে সর্বোচ্চ ঔষধ বিক্রয়কারী জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে বিস্তার লাভ করা যক্ষা রোগ থেকে সেখানকার মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বিনা মূল্যে স্ট্রেপটোমাইসিন ঔষধ সরবরাহ করে উক্ত রোগ নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সেটা করা হয়েছিল নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই। এতক্ষণ আমরা আমেরিকার বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মার্ক এন্ড কোম্পানির বিষয়টি উল্লেখ করেছি যারা ব্যবসায় মুনাফা অর্জনকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা না করে নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে 'River Blindness' নামক রোগটি দূরীকরণের জন্য ঔষধ তৈরী করে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়কে মুনাফাকেন্দ্রিক কার্যক্রমের গণ্ডির বাহিরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।[৭] ইতিপূর্বে আমি এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়েও এ উদাহরণটি আলোচনা করেছি। ব্যবসায় মুনাফা অর্জন ছাড়াও ব্যবসায়ীদের পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন পণ্য উৎপাদন করছে এবং অন্যদিকে সেই পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনগণকে সেবাও প্রদান করছে। আবার ব্যবসায়ীরা জনগণের জন্য চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টা করছে এবং রাষ্ট্রকেও কর প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে সহায়তা করছে। তাই জনগণ কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে ব্যবসায় পরিচালনা করলে সে ব্যবসায় যেমন নৈতিক হবে তেমনি টেকসইও হবে যা আমি এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

ব্যবসায় ও নৈতিকতা সম্পর্ক বিষয়ক উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম মতটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কারণ তা ব্যক্তি বিশেষকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মাধ্যমে মূলতঃ আপেক্ষিকতাবাদকেই উৎসাহিত করেছে যা সমাজের একজন সচেতন মানুষ ও সামাজিক জীব হিসেবে মেনে নেয়া যায় না যা আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি ও ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় মতটি অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সমাজের প্রতি অবদান রাখার বিষয়টির উপর অধিক মনোযোগ দেয়ায় নৈতিকতার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে বলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তৃতীয় মতটি অধিক মাত্রায় মানবিকতা ও মানবকল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে মানবিকতা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থও প্রয়োজন সে দিকটি কিছুটা উপেক্ষিত হলেও ব্যবসায়কে টেকসই করার ক্ষেত্রে এ মতের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। তাই আমি মনে করি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতের

সংমিশ্রণের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হলে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় যেমন টেকসই হবে তেমনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় মত থেকে আইনগত দিকটিকে এবং তৃতীয় মত থেকে নৈতিক ও মানবিকবোধকে গ্রহণ করে উপযোগবাদ, অধিকার তত্ত্ব ও ন্যায়পরতার ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে আইন, যৌক্তিকতা ও নৈতিকতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আমি এই অভিসন্দর্ভের ছয়টি অধ্যায়ের বিভিন্ন জায়গায় দেখানোর চেষ্টা করেছি।

- প্রথম অধ্যায়ে আমরা ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ডের আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আপেক্ষিকতাবাদ কোন কাজের নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সার্বজনীন কোন নীতি বা আইনকে অস্বীকার করে বলে এই মতটিকে প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না। আবার আমরা এটিও দেখেছি যে, অনেকেই স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকেন যা নীতিবিদ্যায় আত্মস্বার্থবাদ নামে পরিচিত। এই মানদণ্ডটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা যদি সবাই স্বীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করি তাহলে চূড়ান্তভাবে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হই। অর্থাৎ ব্যক্তি উদ্যোগে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা সমষ্টিগত ক্ষতির তুলনায় খুবই নগন্য। তাই ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থবাদকে কোন আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আবার উপযোগবাদ, অধিকার তত্ত্ব, ন্যায়পরতার ধারণা – এসব নৈতিক মানদণ্ডের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা আমি উল্লেখ করেছি। এতদসত্ত্বেও ব্যবসায়কে টেকসই করা ও নৈতিক ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা আমি ইতোমধ্যে এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিএসআর সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের উন্মেষ ঘটে। অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করছে। অর্থাৎ মূলধন, সংগঠন, ভূমি, শ্রম, বাজার ব্যবস্থা, প্রশাসনিক সহায়তা, সড়ক, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, দক্ষ জনবল প্রভৃতি ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদান ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করছে। এভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা উদ্যোক্তা ও শেয়ারমালিকগণ লাভবান হন এবং অংশিজনদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে সহযোগিতা, দেশের বেকার জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি,

সরকারকে যথাসময়ে যথাযথ আয়কর প্রদান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করা সম্ভব। এতদসত্ত্বেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত সকল পণ্য সমাজের সকল সদস্য ব্যবহার না করলেও এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির দায় সকলকে বহন করতে হয়। এমতাবস্থায় ব্যবসায়কে টেকসই করার নিমিত্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সৃষ্ট ক্ষতির দায় হ্রাসকল্পে নৈতিক, যৌক্তিক ও মানবিকদৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বীয় স্বার্থ (মুনাফা অর্জন) এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ (সৃষ্ট ক্ষতির দায় হ্রাসকল্পে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী) সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে যাকে আমরা বিচারমূলক আত্মস্বার্থ বা সচেতন আত্মস্বার্থ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আবার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পাশাপাশি অংশিজনদের তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক অবস্থা (Win-win situation) তৈরি করাই টেকসই ব্যবসায়ের নৈতিক ভিত্তি যা আমি এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাছাড়া এ অধ্যায়ে আর্চি বি. ক্যারলের পিরামিড সদৃশ বা চতুষ্টয় মডেল ও মিল্টন ফ্রিডম্যানের বক্তব্য পর্যালোচনা করে সিএসআর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সিএসআর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কেবল নৈতিক কারণে নয় – সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণেও করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমি এটাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে, সিএসআর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে কোম্পানির অংশিজন আপাতঃদৃষ্টিতে প্রত্যাশিত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উক্ত কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট সুনামের পরিবর্তে ব্যবসায়কে টেকসই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মুনাফা লাভে সক্ষম হয়। প্রকৃত অর্থে সিএসআর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার কারণে উদ্যোক্তা, ভোক্তা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলেই লাভজনক অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

- তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মচারী ও নিয়োগকারীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকার ও কর্তব্য যে পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক প্রথমে সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অধিকারের বিভিন্ন প্রকারভেদও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কর্মচারী ও নিয়োগকারীর অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচলনা করার জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ থাকে এবং এসব পক্ষের মধ্যে কর্মচারী ও নিয়োগকারীর সম্পর্কই সরাসরিভাবে

দৃশ্যমান ও অধিকতর কার্যকরী। কারণ তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলে তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালনের প্রকৃতির উপরই নির্ভর করছে ব্যবসায়ের সফলতা। এক কথায় কর্মচারীর জন্য যেটি অধিকার হিসেবে বিবেচিত তা পূরণ করা নিয়োগকর্তার কর্তব্যেরই অংশ এবং তা বিপরীতভাবে নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ এক পক্ষের যেটি অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় – অন্য পক্ষের কর্তব্য হলো তা যথাযথভাবে পূরণ করা। এরূপ সম্পর্কের ভিত্তিকেই আমরা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। উপযোগবাদ, অধিকার তত্ত্ব ও ন্যায়পরতার ধারণার উপর ভিত্তি করে এ অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কর্মচারী ও নিয়োগকারীর পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কের বিষয়টি যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে সম্পন্ন হলে তা থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিজনদের উপকৃত হবার সুযোগ রয়েছে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই যদি তাদের অধিকার ও কত্যব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টেকসই হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মালিক, শ্রমিক, নিয়োগকারী, নিয়োগকৃত ব্যক্তি, উৎপাদক-ভোক্তা, প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যাশিত ফল লাভে সক্ষম হবে এবং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সকল পক্ষই উপকৃত হবে।

- চতুর্থ অধ্যায়ে হুইসল্ ব্লোয়িং সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা হুইসল্ ব্লোয়িং করাকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব লঙ্ঘনের শামিল বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যদি জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় কিংবা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম যদি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোন কিছু না করে বরং অভ্যন্তরীণ চ্যানেলে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যায়ের মাত্রাগত দিকটি বেশী হলে কিংবা অভ্যন্তরীণ উপায়ে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নৈতিক দায়িত্ব যা কোনভাবেই দায়িত্ব লঙ্ঘনের শামিল বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, হুইসল্ ব্লোয়িং হলো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত নৈতিক কর্মকাণ্ড। কিন্তু নৈতিকতা ব্যতীত অন্যান্য কারণেও হুইসল্ ব্লোয়িং সংঘটিত হতে পারে। যেমন প্রতিশোধপরয়ণতা, আত্মপ্রচার, পত্রিকার শিরোনাম,

আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি। তাই হুইসল্ ব্লোয়িংকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে কতগুলো শর্ত পালনীয় যা এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হুইসল্ ব্লোয়িং সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেটি হলো – হুইসল্ ব্লোয়ারদের কি তথ্য প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত? কেউ কেউ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বিরোধিতা করেছেন। যেমন জেনারেল মটরসের চেয়ারম্যান জেমস এম রচি মনে করেন, হুইসল্ ব্লোয়িং কোনভাবেই প্রতিষ্ঠান কিংবা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের নামে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, অমিল ও শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। তাছাড়া কোন কোন সময় মালিক ও কর্মচারীর মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা তিনি শিল্পের গুপ্তচর বৃত্তি হিসেবে অভিহিত করেন। তাই তাঁর মতে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে জনগণ অথবা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে বিপরীতটিই লক্ষণীয়। তিনি হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সমর্থনকারীগণকে ব্যবসায়ের শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা পেশাজীবীদেরকে যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে অনৈতিক তথ্য প্রকাশ অবশ্যই অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কারণ অধিকার ও দায়িত্ব হলো পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক যা আমি তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। হুইসল্ ব্লোয়িংকে যদি একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পেশাজীবীর অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো হুইসল্ ব্লোয়ারদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়া। এখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে আমি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, ও বিচার ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছি। অর্থাৎ একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি জনগণের কল্যাণে হুইসল্ ব্লোয়িং করেন তাহলে সম্ভাব্য ঋণাত্মক পরিণতি থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। নতুবা স্বীয় জীবনকে বিপদাপন্ন করে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী হুইসল্ ব্লোয়িং করতে আগ্রহী হবে না। আমি পূর্বে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অধিকাংশ হুইসল্ ব্লোয়ারগণ ঋণাত্মক পরিণতির শিকার হয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর ব্যক্তিগত, পারস্পরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক বিপর্যয় পলিরক্ষিত হয়। সুতরাং ঋণাত্মক পরিণতি থেকে নিজেকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা না পেলে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার প্রয়াসে হুইসল্ ব্লোয়িং করতে উৎসাহী হবে না। তাই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অন্যায্য, অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক – এরূপ কর্মকাণ্ড যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদির জন্য হুমকিস্বরূপ তা প্রকাশের অধিকার

হুইসল্ ব্লোয়ারদেরকে দেয়া উচিত। কারণ হুইসল্ ব্লোয়ারদের যদি তা প্রকাশের অধিকার দেয়া হয় তাহলে তারা তাদের স্বীয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষার্থে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে দ্বিধান্বিত হবে না। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হুইসল্ ব্লোয়ারদের কর্মকাণ্ডকে নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় এবং তাদের আইনি সুরক্ষা দেয়া উচিত যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাই হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য পেশাগত দায়িত্ব পালনে শিল্পের গুপ্তচরবৃত্তিতো নয়ই বরং হুইসল্ ব্লোয়ারদের কর্মকাণ্ড সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকদের সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিক যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেন ঠিক তেমনিভাবে হুইসল্ ব্লোয়াররা সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় সিপাহসালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠানকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবে যার পরিণতিতে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টেকসই হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে যা আমি এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

- পঞ্চম অধ্যায়ে চাকুরি বৈষম্য ও প্রতিকার সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রেও চাকুরি বৈষম্য বিদ্যমান। কিন্তু চাকুরি ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য দীর্ঘকালীন ধরে বিদ্যমান থাকলে তা সামগ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দীর্ঘ সময় ধরে প্রবাহমান থাকলে মেধাবীরা বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা অনৈতিকও বটে। তাছাড়া বঞ্চনা একজন ব্যক্তিকে হতাশাগ্রস্ত করে এবং তার কর্মস্পৃহাকে নিষ্প্রভ করে ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই টেকসই ব্যবসায়ের নৈতিক লক্ষ্য ও অনুশীলনই পারে চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধ নিশ্চিত করতে যা আমি এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়ে চাকুরি বৈষম্যকরণের কারণ ও তার ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৈষম্যকরণের ধারণাটি অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত সকল জাতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈষম্যের কারণও বহুমাত্রিক যেমন ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিধা ও অসুবিধা দু'টোই আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে অতিমাত্রায় ইতিবাচক পদক্ষেপ অন্যকে প্রাপ্য অধিকার থেকে অতিমাত্রায় বঞ্চিত করে। আমরা মনে করি কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি নির্ভর বৈষম্য দূর করে প্রত্যেকের

প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করলে প্রতিষ্ঠান তার প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যেকেই লাভবান হবে এবং চূড়ান্ত বিচারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টেকসই করার মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তা, শেয়ারমালিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমাজ, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র প্রত্যেকেই – তার কাম্য ফল লাভে সক্ষম হবে।

- ষষ্ঠ অধ্যায়ে টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ব্যবসায় হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা অজর্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। একটি সফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার ক্রেতা বা ভোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অংশিজন, শেয়ারমালিক, সম্প্রদায় এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নই হলো টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন। কিন্তু ব্যবসায়কে টেকসই করতে হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় না তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সম্ভব হয় না। এরূপ অনুধাবন থেকে ব্যবসায়কে টেকসই করার নিমিত্তে ত্রয়ী রেখার আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ ‘পরিবেশ+অর্থনীতি+সমাজ’ – এই ত্রয়ী উপাদানের উপর ভিত্তি করে ভারসাম্যমূলক কৌশল অবলম্বনে মানুষের চাহিদা ও সেবা পূরণে স্বল্পকালীন সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে দীর্ঘকালীন সময় ধরে ব্যবসায় পরিচালনা করাই হলো টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন। তাই ব্যবসায়ীদের নৈতিক দায়িত্ব হলো ত্রয়ী উপাদানকে সমন্বয় করে ব্যবসায় টিকে থাকা। এরূপ নৈতিক, যৌক্তিক ও সংবেদনশীল অবস্থা থেকে ব্যবসায় পরিচালিত হলে ব্যবসায় টেকসই হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে যা আমি এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ অধ্যায়ে এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য প্রয়োজন হলো সিএসআর কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া, হুইসল্ ব্লোয়ারদের অধিকার প্রদান করা, চাকুরি ক্ষেত্রে তথা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য দূর করা এবং নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। এসব বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি, সমাজ, জাতি তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের অবদান রেখে সকলের জন্য প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে, ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একক কোন একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ড অনসুরণ করে ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আচরণকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা

সম্ভব নয়। যেমন ইমানুয়েল কান্টের পরিণতিমুক্ত নীতিতত্ত্বে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফলভোগের বিষয়টিকে বর্জন করে যেভাবে দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে তা অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব কি না সেটা প্রশ্নাতীত নয়। কেননা যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয় এবং এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হলো মুনাফা অর্জন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় উপযোগবাদী নৈতিক মানদণ্ডই ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য একটি আদর্শ নৈতিক মানদণ্ড যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, নির্দিষ্ট কোন একটি একক মানদণ্ড ব্যবসায়কে টেকসই করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করতে পারে না। সুতরাং ব্যবসায়কে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়। এ কারণে উপযোগবাদের সঙ্গে অধিকার ও ন্যায়পরতার সমন্বয় ঘটানো অপরিহার্য। ব্যবসায়কে টেকসই করা ও নৈতিক ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমি ইতোমধ্যে এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার গৃহীত উপযোগবাদী নৈতিক মানদণ্ড প্রচলিত উপযোগবাদ থেকে একটু ভিন্ন। অর্থাৎ প্রচলিত উপযোগবাদের সঙ্গে অধিকার তত্ত্ব ও ন্যায়পরতার ধারণাকে যুক্ত করে ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ (যেমন শেয়ার মালিক, বিভিন্ন প্রকার অংশিজন যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাজারের রাজা ক্রেতা বা ভোক্তা) প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন উপাদান (যেমন পরিবেশ, ভূমি, জলবায়ু, সমুদ্র ইত্যাদি), আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ত্রি ভিত্তি রেখা বা ত্রয়ী রেখা (পরিবেশ+সমাজ+অর্থনীতি) ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসায় পরিচালিত হলে ব্যবসায় নৈতিক ও টেকসই হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য নৈতিকতার একটি অনন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা আমি "টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা: একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের ছয়টি অধ্যায়ের বিভিন্ন জায়াগায় দেখানোর চেষ্টা করেছি। একথা ঠিক যে, নৈতিকতা চর্চা ব্যতীত ব্যবসায় পরিচালিত হলে স্বল্পকালীন সাফল্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু টেকসই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ টেকসই ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত অনবায়নযোগ্য সম্পদকে যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে ব্যবহার করা। কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমানে বিদ্যমান সম্পদসমূহ শুধু বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হবে না। ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে আরো প্রজন্ম আসবে। তাদেরও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অধিকার রয়েছে যা আমি টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় দেখিয়েছি। তাই ব্যবসায়কে টেকসই করার মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করা সম্ভব যার

মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হবে। মনে রাখতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সম্পদ নিঃশেষকরণ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্লোগান হলো টেকসই উন্নয়ন এবং এই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই ব্যবসায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বণ্টন, যৌক্তিক ও নৈতিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করার দায়িত্ব অনেকাংশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাউন্সিলের টেকসই উন্নয়নের কো-চেয়ার রে এণ্ডারসনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Business is the largest, most powerful and pervasive, wealthiest, most influential institution on earth and the one doing the most damage. It's incumbent on business to take the leadership and begin to undo the damage to restore the earth."[৮] অর্থাৎ ব্যবসায় হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্যাপক, সমৃদ্ধশালী এবং প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। তাই ব্যবসায় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ের অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হলো সমূহ ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব পরিহার করা। তাছাড়া বাসযোগ্য একটি পৃথিবী গড়ে তোলার নেতৃত্বও ব্যবসায়কে গ্রহণ করতে হবে যার ইঙ্গিত রে এণ্ডারসনের বক্তব্যে রয়েছে। তাই ক্ষীণ দৃষ্ট সম্পন্ন মনোভাব, স্বার্থপরতার দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বল্পকালীন লাভের প্রবণতাকে পরিহার করে সকলের (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম) জন্য বাসযোগ্য একটি পৃথিবী উপহার দেয়া আমাদের সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব যার সিংহভাগ পালন করতে পারে নৈতিক ব্যবসায়।

---

১. Desjardins, J. (2009), *An Introduction to Business Ethics*, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, pp. 5-6.

২. Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), *Business Ethics*, 2nd ed., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, pp. 17-18.

৩. Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press, p. 4.

৪. Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), op. cit., pp. 18-21.

৫. *Ibid.,* p. 23.

৬. Mason, C. (2003), *The 2030 Spike: Countdown to Global Catastrophe*, London: Earthscan Publications Ltd., pp. 105-106.

৭. Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases*, 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited, pp. 4-5.

৮. Mason, C., op. cit., p. 107.

গ্রন্থপঞ্জি

Agyeman, J., Bullard, R. D. and Evans, B. (2003), "Joined-up Thinking: Bringing Together Sustainability, Environmental Justice and Equity." in Agyeman, J., Bullard, R. D. and Evans, B. (eds.), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, London: Earthscan Publications Ltd.

Annual Report, The Ibn Sina Pharmaceutical Industry Ltd., 2018-19.

Attfield, R. (2003), *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century*, Cambridge, UK: Polity Press.

Bangladesh Gazette, Additional issue, 22 June, 2011.

Barry, V. (1986), *Moral Issues in Business,* 3rd ed., California, USA: Wadsworth Publishing Company.

Bayard O. W. (1968), *Business: An Introductory Analysis,* 6th ed., US: Jonna Cotler Books.

Bhaduri, S.N. and Selarka (2016), "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies" in *Springer*, Vol. xv.

Bhuiyan, Md. Nazim Uddin (2015), *Introduction to Business and Business Administration: Concepts and Text*, 3rd ed., Bangladesh: NaSyPeC Publications.

Boatright, J. R. and Patra, B. P. (2011), *Ethics and the Conduct of Business*, 6th ed., India: Dorling Kindersley Pvt. Ltd.

Bowie, N. E. and Duska, R. F. (1990), *Business Ethics*, 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Bowie, N. E. (1999), "A Kantian approach to business ethics", in Robert E. F. (ed.), *A Companion to Business Ethics*, UK: Blackwell Publishers.

Bowie, N. E. and Schneider, M. (2011), *Business Ethics for Dummies*, Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc.

Carvell, F. J. (1975), *Human Relations in Business*, 2nd ed., New York, USA: Macmillan Publishing Co., Inc.

Christopher, A. (1975), "Justice as Equality", in *Philosophy & Public Affairs*, John Wiley & Sons, Volume 5, No.1.

Collins J.W. (1994), Is business ethics an oxymoron?, in *Business Horizons,* Volume- 37, Issue-5.

Crane, A. and Matten, D. (2011), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 3rd ed., UK: Oxford University Press.

Crowther, D., Seifi, S. and Moyeen, A. (2018), "Responsibility and Governance in Achieving Sustainability" in Crowther, D., Seifi, S. and Moyeen, A. (eds.), *The Goals of Sustainable Development: Responsibility and Governance*, Singapore: Springer Nature Pte Ltd.

Davis, K. (1960), "Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?" in *California Management Review.*

Davis, K. and Blomstrom L. R. (1975), *Business and Society: Environment and Responsibility,* USA: McGraw-Hill.

DeGeorge, R. T. (2011), *Business Ethics*, 7th ed., India: Batra Art Press.

DesJardins, J. R. (1999), "Business's environmental responsibility" in Robert E. Frederick (ed.), *A Companion to Business Ethics*, USA: Blackwell Publishers.

Desjardins, J. (2009), *An Introduction to Business Ethics,* 3rd ed., New York: McGraw-Hill.

— (2011), *An Introduction to Business Ethics,* 4th ed., New York: McGraw-Hill.

Duska, R. (1999), "Employee Rights" in Robert E. F. (ed.), *A Companion to Business Ethics*, Malden, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc.

Dyllick, T. and Hockerts, K. (2002), "Beyond the Business Case for Corporate Sustainability", in *Business Strategy and the Environment*.

Freeman, R.E. (1994), "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation" in Bowie N. E. and Beauchamp, T. L. (eds.), *Ethical Theory and Business*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Fernando, A.C. (2012), *Business Ethics and Corporate Governance*, 2nd ed., India: Pearson.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J. P. and Ferrell, L. (2009), *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases*, 6th ed., New Jersey, USA: Houghton Mifflin Company.

Frankena, W. K. (1997), *Ethics*, New Delhi: Prentice Hall of India.

Friedman, Milton (1970), "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits," in *The New York Times Magazine*.

Furxhi, G. (2016), “Job Discrimination and Ethics in the Workplace” in *European Journal of Multidisciplinary Studies,* Vol. 1, Nr. 2.

Garvey, J. (2008), *The Ethics of Climate Change,* Continuum, New York.

Giovannoni, E. and Fabietti, G. (2014), “What is Sustainability? A Review of the Concept and its Applications” in Busco, C., Frigo, M.L., Riccaboni, A., (eds.), *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, Switzerland: Springer International Publishing.

Golding, M. P. (1972), “Obligations of Future Generations” in *The Monist*, Vol. 56, No. 1.

Green Banking and CSR Department (2015), Bangladesh Bank.

Gudmundsson, H., Hall, R. P., Marsden, G. and Zietsman, J. (2016), *Sustainable Transportation: Indicators, Frameworks, and Performance Management*, London: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Gupta, S. (2018), “Glass Ceiling in 21st Century: Women in Management” in *International Journal of Management Studies,* Vol.-V, Issue-3(5).

Harris, Jr. C. E., Pritchard M. S. and Rabins M. J. (2005), *Engineering Ethics: Concepts and Cases,* 2nd ed. Bangalore: Eastern Press Pvt. Ltd.

Hart, H. I. A. (1955), “Are these Any Natural Rights”, in *Philosophical Review*, Volume 64.

Hartman L. P. and Desjardins J. (2011), *Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility,* 2nd ed., Irwin: McGraw –Hill.

Hay, R., and Gray, E. (1974), “Social Responsibilities of Business Manager” in *Academy of Management Journal*.

Hirschman, A. O. (1970), *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*, Cambridge, London: Harvard University Press.

Hobbes, T. (1971), *Leviathan: OR The Matter, Forme and Power of A Commonwealth Ecclesiaticall and Civil,* Edited by Michael O., London: Coller-Macmillan Ltd.

Jardins, J. R.D. (2011), *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy,* Australia: Wadsworth.

Jesus G. M. and Fernando R. R. C. (2010), “Corporate Social Responsibility and the Classical Theory of the Firm: Are Both Theories Irreconcilable?” in *Rev. Innovar* Vol. 20, Num 37.

Johari, J. C. (1995), *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends,* New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.

Kapsos, S. (2008), “The Gender Wage Gap in Bangladesh” in ILO Asia-Pacific Paper Series.

Khan, A. R. (2000), *Business Ethics*, Bangladesh: Rubi Publications.

Khan, A. R. (2009), *Business Ethics*, 2nd ed., Dhaka: Brothers Publication.

Kibert, C. J., Monroe, C. M., Peterson, A. L., Plate, R. R. and Thiele, L. P. (2012), Working *Toward Sustainability: Ethical Decision Making in a Technological World*, New Jersey: John Willey & Sons, Inc.

Laski, Harold J. (1992), *A Grammar of Politics*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Lawrence, A. T. and Weber, J. (2014), *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*, 14th ed., Irwin: McGraw –Hill.

Lillie, W. (1996), *An Introduction to Ethics*, London: University Paperbacks.

Mackenzie, J. S., *A Manual of Ethics*, 6th ed., London: University Tutorial Press Ltd.

Mason, C. (2003), *The 2030 Spike: Countdown to Global Catastrophe*, London: Earthscan Publications Ltd.

Marx, K. (1938), *Critique of the Gotha Program.*, London: Lawrence and Wishart Ltd.

McDonald, Gael (2015), *Business Ethics: A Contemporary Approach*, Australia: Cambridge University Press.

Mill, J. S. (1964), *Utilitarianism*, Liberty, Representative Government, London: Everyman’s Library.

Moore, G. E. (1992), “The Conception of Intrinsic Value”, in *Philosophical Studies*, London: Routledge.

Mukharji, P.B. (1972), *Three Elemental Problems of the Indian Constitution*, Delhi: National Pub. House.

Murray, J. A. H. (ed.), (1961), *The Oxford English Dictionary,* USA: Oxford.

Nozick, R. (1974), *Anarchy, State, and Utopia,* New York: Basic Books, Inc., Publishers.

O’Neill, J. (2004), *Ecology, Policy and Politics,* London : Routledge.

Patridge, E. (2001), “Future Generations” in Dale J. (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy,* USA: Blackwell Publishers.

Petersen, J. C. and Ferrell, D. (1986), *Whistleblowing Ethical and Legal Issues in Expressing Dissent*, Dubuque, Lowa: Kendall-Hunt Publishing Company.

Pojman, Louis P. (1998), *Global Environmental Ethics*, Belmont Wordsworth Publishing Co.

Post, J. E., Lawrence, A. T., and Weber, J. (1999), *Business and Society*, 9th ed., New York, USA: McGraw-Hill.

Quinnell, K., (2017), “150 Workers Die Each Day From Hazardous Work Conditions: The Working People Weekly List” in American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)

Rachels, J. (2003), *The Elements of Moral Philosophy*, 4th ed., New York: McGraw-Hill Companies.

Rainey, D. L. (2006), *Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation, and Leadership,* UK: Cambridge University Press.

Rahman, M. Ataur, and Islam, Md. Rabiul (2013), *Introduction to Business*, Bangladesh: University Publications.

Rahman, Md. Lutfor (2012), On the Shift from Egoism to Utilitarianism, in *Jibon Darshon,* Vol.2, Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka.

Rahman, Saidur, “Food adulteration poses too serious a threat to public health”, in *The Daily Independent*, 24 February, 2014.

Raphael, D. D. (1970), *Problems of Political Philosophy*, London, Basingstoke: Macmillan and Co. Ltd.

Rawls, J. (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Redish, M. H. (1974), “Preferential Law School Admissions and the equal Protection Clause: An Analysis of the Competing Arguments” in *UCLA Law Review*, Vol. 22.

Regan, T. (1983), *The Case for Animal Rights*, Berkeley: University of California Press.

Regan, T. (1985), “The Case for Animal Rights,” in Peter Singer (ed.), *In Defence of Animals*, Oxford, England: Basil Blackwell.

Robert, E. (1996), "Environmental Ethics", in Peter Singer (ed.), *A Companion to Ethics*, Oxford, UK: Blackwell Publishers.

Robert, H. and Gray, E. (1974), "Social Responsibilities of Business Manager" in *Academy of Management Journal*.

Roger W. B. (1923), *Business Fundamentals: How to Become a Successful Businessman,* New York: B.C. Forbes Publishing Company.

Rowan, J. R. (2000), "The Moral Foundation of Employee Rights", in *Journal of Business Ethics*, Vol. 24, No. 4.

Sagoff, M. (1988), "Some Problems with Environmental Ethics", in *Environmental Ethics,* Volume 10, Issue 1, Virginia.

Salehi M., Saeidinia, M. and Aghaei M. (2012), "Business Ethics" in *International journal of Scientific and Research Publications*, Volume 2, Issue .

Samuel O. I. and Céline L. (2011), "Corporate Social Responsibility: Concluding Remarks"in Samuel O. I. and Céline L. (eds.), *Theory and Practice of Corporate Social Responsibility*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: New York.

Schwarts M. S. and Carroll A. B. (2003), "Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach" in Business Ethics Quarterly, Vol. 13, No 4.

Seay, S. S. (2015), "Sustainability is Applied Ethics" in *Journal of Legal,Ethical and Regulatory Issues*, Volume 18.

Shaw, W. H. (2011), *Business Ethics*, 7th ed., USA: Cengage Learning.

Shaw, W. H., and Barry, V. (2014), *Moral Issues in Business*, 13th ed., Canada: Cengage Learning.

Singer, P. (1975), *Animal Liberation*, New York: Avon Books.

— (2011), *Practical Ethics,* 3rd ed., New York: Cambridge University Press.

Stace, W. T. (1967), *A Critical History of Greek Philosophy*, London.

Sterba, J. P., *Morality in Practice*, (ed.), Wadsworth, California, 1991

Stewart, D. (1996), *Business Ethics*, Singapore: The McGraw Hill Companies.

Taylor, P. W. (2011), *Respect for Nature*, 25th Anniversary Edition, New Jersey, London Princeton University Press.

The Pure Food Ordinance, Ordinance No. LXVIII of 1959, Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs, Bangladesh

The Republic of Plato (1945), tr. by Conford, F. M., New York: Oxford University Press.

Thomson, J. J. (1973), "Preferential Hiring" in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 2, No. 4.

Thorne, D. M., Ferreii, O. C. and Ferrell, L. (2008), *Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility,* 3rd ed., New York: Houghton Mifflin Company.

Uddin, Jasim (2005), "Our Ethical Responsibilities to Future Generations" in *The Dhaka University Studies*, Dhaka.

United Nations Declaration on the Right to Development, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, Preamble.

Vandekerckhove, W. and Lewis, D. (2012), "The Content of Whistleblowing Procedures: A Crtical Review of Recent Official Guidelines", *Journal of Business Ethics*, Vol. 108, No. 2.

Velasquez, M. G. (2010), *Business Ethics: Concepts and Cases,* 6th ed., New Delhi: PHI Learning Private Limited.

Weiss, J. W. (2003), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach,* 3rd ed., Australia: Thomson South-Western.

—, (2014), *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach,* 6th ed., San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Witherick, M., Ross, S. and Small, J. (2001), *A Modern Dictionary of Geography*, 4th ed., London: ARNOLD.

Weiss, E. B. (1992), "In Fairness To Future Generations and Sustainable Development" in *American University International Law Review*, Volume 8, Issue 1, Washington.

Werhane, P. H. and Freeman, R. E. (2005), *The Blackwell Encyclopedia of Management: Business Ethics*, (eds.), 2nd eds., USA: Blackwell Publishing.

Williams, O. F. (2014), "CSR: Will it Change the World? Hope for the Future: An Emerging Logic in Business Practice" in Journal of Corporate Citizenship, Volume 2014, Number 53.

World Commission on Environment and Development, UN, *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, UK, 1987

অর্থ মন্ত্রণালয়, স্মারক নং-অম/অবি(বাস্ত-১) ভাতা-১৬/৯৫-১৭৬, ১২.০৭.২০৯৯।

আলম, মাহবুবুল (২০০৩), "জনসংযোগ", ইসলাম, সিরাজুল (সম.) *বাংলাপেডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, নিমতলী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড-৩।

আলীম, মীর আব্দুল (২০১৬),"কোনটা চাই, সুন্দরবন না রামপাল?", *দৈনিক ইনকিলাব*, শুক্রবার, ১২ আগস্ট।

আহম্মেদ, আবু নোমান ফারুক (২০১৩), "কৃষিতে বালাইনাশকের ব্যবহার : সংকটে মানবস্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্য", *মাসিক কৃষিবার্তা*, ঢাকা।

ইউনূস, মুহাম্মদ (২০১৫), *সামাজিক ব্যবসা*, বাংলাবাজার, ঢাকা: অনন্যা।

ইসলাম, মোহাম্মদ হাফিজুল (২০০৯), "দার্শনিক দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ", *দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ ২৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, মোঃ তোফাজ্জল (২০১২), "জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি গবেষণা", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, বৃহস্পতিবার, ৩১ মে।

– (২০১২), "ব্যবসায় নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা : যৌক্তিকতা অন্বেষণ", *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস*, ভলিউম ২, সংখ্যা ১, কলা অনুষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, মো. শহীদুল এবং হোসেন, মো. মুকবিল (২০০৩), "জনসংযোগ", ইসলাম, সিরাজুল (সম.) *বাংলাপেডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, নিমতলী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড-৪।

উদ্দিন, জসীম এবং দাস, কালী প্রসন্ন (২০০৬), "পরিবেশ নীতিবিদ্যার মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও স্বতঃমূল্য : একটি বিভ্রান্তি নিরসন", *দর্শন ও প্রগতি*, ২৩শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর): ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র", বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স, বাড়ি ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯।

করিম, সরদার ফজলুল (২০১৫), *এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্‌স*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

খান, আখতার সোবহান (২০০৮), *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি প্রেস।

খান, গালিব আহসান (২০১৭), *প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

খাঁন, মোহাম্মদ দাউদ (২০০৭), "ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা সম্পর্কে পিটার সিঙ্গার : একটি পর্যালোচনা", *দর্শন ও প্রগতি*, ২৪শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

– (২০১৪), "ব্যবসায় নীতিবিদ্যার মূলনীতি ও প্রয়োজনীয়তা : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ", *Jibon Darshon,* A Journal of philosophy, Vol. 4.

– (২০১৬), "ন্যায়পরতার ধারণা : একটি রাষ্ট্র-দার্শনিক বিশ্লেষণ", *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড : ৮, সংখ্যা : ১০-১১, বর্ষ : জুলাই ২০১৪ - জুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খানম, রাশিদা আখতার (২০০৯), *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

–,(২০১৯),"রাজনৈতিক ও সামাজিক উদারনৈতিকতাবাদ প্রসঙ্গে জন রলস্", *অনুসন্ধিৎসা*, দর্শন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়, রাজশাহী।

খালেক, এ. এস. এম. (২০০৩), আবদুল, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, বাংলাবাজার, ঢাকা: অনন্যা।

চক্রবর্তী নির্মাল্য নারায়ণ (২০০২), *পরিবেশ ও নৈতিকতা*, কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম।

চাকমা, নীরু কুমার (২০১২), ''মানবাধিকার ও নৈতিকতা", *বিশ্ব দর্শন দিবস* ২০১২, দর্শন বিভাগ ও গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০০৪), *বাংলাপেডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, নিমতলী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

"জরিমানার বিধানসহ গণমাধ্যম কর্মী আইন অনুমোদিত" (২০১৮), *দৈনিক জনকণ্ঠ*, মঙ্গলবার, ১৬ অক্টোবর।

ঢালী, আব্দুল হাই (১৩৯২ বঙ্গাব্দ), *নীতিবিদ্যা: আদর্শনিষ্ঠ ও পরানীতিবিদ্যা*, ঢাকা, বাংলাদেশ: পুথিঘর লিঃ।

"নেপালে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উড়োজাহাজ" (২০১৮), *দৈনিক প্রথম আলো*, মঙ্গলবার, ১৩ মার্চ।

পরিপত্র-১ (আয়কর)/২০১১।

পারভীন, ফারহানা (২০১৬), "বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে?", *BBC News*, বাংলা, মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টম্বর।

পেট্রোবাংলার তদন্তেও তিতাসের দুর্নীতির চিত্র" (২০১৮), *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ২৩ সেপ্টেম্বর।

ফরাসউদ্দিন, মোহাম্মদ (২০১২), "হলমার্ক কেলেঙ্কারিঃ তারপর?", *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ৯ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন),-এর সংশোধিত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ২১ অক্টোবর, ২০১৮।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, *বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত)*, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বেগম, হাসনা (১৯৯০), *নৈতিকতা, নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী প্রেস।

(২০০৬), *এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ন এথিক্স* (অনুদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা।

মজুমদার, বদিউল আলম (২০১৪), "একজন শ্রমিকের জীবনের মূল্য কত?", *দৈনিক প্রথম আলো*, বৃহস্পতিবার, ১ মে।

মুনতাকিম, আব্দুল্লাহ-হিল (২০১৮), "কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার নারী", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, শুক্রবার, ২০ এপ্রিল।

শাইন, আলম (২০২০), "মরুকরণের সঙ্গে তলিয়েও যাচ্ছে বাংলাদেশ", *বাংলা ট্রিবিউন*, ১৭ জানুয়ারি।

শামস, আলম (২০১৬), "আজও নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার", *দৈনিক ইনকিলাব*, মঙ্গলবার, ৩ মে।

শাহ, জাহাঙ্গীর (২০১৯), "উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা বাড়ছে", *দৈনিক প্রথম আলো*, শুক্রবার, ৮ মার্চ।

রশিদ, হারুন-আর (২০১৩), *বৃক্ষ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে*, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ পার্ল পাবলিকেশন্স।

– (২০১৪), *নদী বাঁচাও মানুষ বাঁচাও বাঁচাও বাংলাদেশ*, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ পার্ল পাবলিকেশন্স।

–(২০১৫), *মানবসৃষ্ট জলবায়ুর ঝুঁকিতে বাংলাদেশ*, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ পার্ল পাবলিকেশন্স।

"রাসেলকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিল গ্রিন লাইন পরিবহন কর্তৃপক্ষ" (২০১৯), *দৈনিক যুগান্তর*, বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল।

রায়, ড. প্রদীপ (২০১২), *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (অনুদিত), ঢাকাঃ অবসর।

রুশদী, আলী আহমাদ (২০১৫), "অ্যাডাম স্মিথের অদৃশ্য হাত", *দৈনিক বণিক বার্তা*, মঙ্গলবার, ৭ জুলাই।

হাই, সাইয়েদ আবদুল (১৯৮২), *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি* (অনুদিত), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী প্রেস।

"২৫১৮ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির টাকা দিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক" (২০১৪), *দৈনিক প্রথম আলো*, রোববার, ২ ফেব্রুয়ারি।

"৮৩% নারী শ্রমিক যৌন হয়রানির শিকার" (২০১৮), *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, মঙ্গলবার, ২৮ আগস্ট।

Website

https://www.academia.edu/1235634/Thinking_ethically Accessed on 10.20 p.m., Dated on 10.11.2019

দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক প্রথম আলো

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক কালেরকণ্ঠ

দৈনিক সংগ্রাম

দৈনিক জনকণ্ঠ

দৈনিক আমাদের সময়.কম

দৈনিক বণিক বার্তা

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

দৈনিক যুগান্তর

দৈনিক সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের দর্শন বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের

সারসংক্ষেপ

উপস্থাপিত গবেষণার শিরোনাম : টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা : একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ (Role of Morality in Sustainable Business: An Ethico-philosophical Analysis)

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, কোন একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বা চালিকা শক্তি হলো অর্থনীতি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করেই কোন একটি সমাজ বা রাষ্ট্র উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ অনেকাংশে পরিচালিত হয়ে থাকে ব্যবসায়ের মাধ্যমে। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে ব্যবসায়ের উপর। ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক বা কর্মচারী জড়িত থাকলেও পরোক্ষভাবে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশ এবং প্রাণী জগত সকলেই জড়িত। তাই ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এসব আচরণ নিয়ে ব্যবসায় নীতিবিদ্যায় নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। যেমন ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিলো সেটির কারণ হিসেবে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ও নামী দামী কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দায়ী করেন। এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো এনরন (Enron), ওয়ার্ল্ডকম (WorldCom), টাইকো (Tyco), গ্লোবাল ক্রসিং (Global Crossing), আলডেলফিয়া (Aldelphia), মার্শ ও ম্যাকক্লিনেন (Marsh and McClenen), ক্রেডিট সুইস ফার্স্ট বস্টন (Credit Suisse First Boston), নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেইন্জ (New York Stock Exchange) ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল ছাড়াও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে যে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয় সেটির সঙ্গেও ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের নৈতিক কর্মকাণ্ডকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়

যেটির ধারাবাহিকতায় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে এরূপ আরও উদাহরণ দেয়া যাবে। যেমন হলমার্ক, ডেসটিনি ২০০০, যুবক, বিডি ফুডস, বিসমিল্লাহ গ্রুপ প্রভৃতি। এখানে আমার বক্তব্য হলো এরূপ অনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় কখনো টেকসই ও লাভজনক হয় না এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য কল্যাণকর হয় না । তাই আমি এই অভিসন্ধর্ভে এটিই দেখানোর চেষ্টা করবো যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং যার পরিপালন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকলের জন্যই কল্যাণকর ও অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে "টেকসই ব্যবসায় নৈতিকতার ভূমিকা : একটি নীতি-দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক আমার এই অভিসন্দর্ভের ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি।

এক. "ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ডঃ একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে আমরা ১.১ ভূমিকা, ১.২ নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা, ১.৩ বিভিন্ন প্রকার নৈতিক মানদণ্ড যেমন আপেক্ষিকতাবাদ, আত্মবাদ, উপযোগবাদ, অধিকার, কান্টের নীতিতত্ত্ব, ও ন্যায়পরতা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

দুই. "কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাঃ ভোক্তা ও উদ্যোক্তা উভয়ের জন্যই লাভজনক" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২.১ ভূমিকা, ২.২ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২.৩ আন্তার্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে সিএসআর, ২.৪ সিএসআর-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, ২.৫ কর্পোরেশনের মূল বৈশিষ্ট্য, ২.৬ সিএসআর-এর আদর্শনিষ্ঠ ধারণা, ২.৭ সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ, ২.৮ ব্যবসায়ের নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

তিন. "কর্মচারী ও নিয়োগকারীর অধিকার ও কর্তব্য: পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক" শীর্ষক অধ্যায়ে ৩.১ ভূমিকা, ৩.২ অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পারিক, ৩.৩ কর্মচারী ও নিয়োগকর্তার অধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ৩.৪ কর্মচারীর অধিকারের নৈতিক ভিত্তি, ৩.৫ কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার পারস্পারিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি।

চার. "হুইসল্ ব্লোয়িং: পেশাগত দায়িত্ব ও অধিকার" নামক অধ্যায়ে ৪.১ ভূমিকা, ৪.২ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, ৪.৩ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের বৈশিষ্ট্য, ৪.৪ হুইসল্ ব্লোয়ার, ৪.৫ হুইসল ব্লোয়িংয়ের উপায়সমূহ, ৪.৬ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের শর্তসমূহ, ৪.৭ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত, ৪.৮ হুইসল্ ব্লোয়িংয়ের ন্যায্যতা, ৪.৯ হুইসল্ ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন কি?, ৪.১০ বিশ্বজুড়ে হুইসল্ ব্লোয়ারদের জন্য বিদ্যমান আইনি সুরক্ষা, ৪.১১ হুইসল্ ব্লোয়ারদের কখন সুরক্ষা দেয়া উচিত নয় বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছি।

পঞ্চম. "চাকুরী বৈষম্য ও প্রতিকার" শীর্ষক অধ্যায়ে ৫.১ ভূমিকা, ৫.২ চাকুরি বৈষম্য, ৫.৩ আন্তর্জাতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে বৈষম্য, ৫.৪ বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিধি, ৫.৫ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি, ৫.৬ চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য অনুশীলন, ৫.৭ ইতিবাচক পদক্ষেপ, ৫.৮ ইতিবাচক পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ, ৫.৯ ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

ষষ্ঠ. "টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন: একটি ব্যবহারিক বিশ্লেষণ" নামক অধ্যায়ে ৬.১ ভূমিকা, ৬.২ টেকসই ধারণার যৌক্তিক ভিত্তি, ৬.৩ টেকসই ধারণার নৈতিক ভিত্তি, ৬.৪ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি, ৬.৫ টেকসই ব্যবসায় অনুশীলন এবং কৌশল বাস্তবায়ন, ৬.৬ ত্রি ভিত্তি রেখা, ৬.৭ টেকসই ব্যবসায় উন্নয়ন হলো একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণ করেছি।

উপসংহারে ব্যবসায়ের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক বিষয়ক যে প্রধান তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ক) ব্যবসায়ের সাথে নৈতিকতাকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়; খ) ব্যবসায়ের প্রধান বা অন্যতম লক্ষ্য মুনাফা অর্জন কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নয় এবং গ) ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন সর্বদা যথাযথ প্রক্রিয়া নয় – এই তিনটি মত সবিস্তারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি এবং টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা উপস্থাপন করেছি।

সবশেষে গ্রন্থপঞ্জী শিরোনামে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক তথ্যসূত্র-গ্রন্থ, প্রবন্ধের নাম, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও ইন্টারনেটের কিছু ওয়েভ ঠিকানা প্রদান করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. জসীম উদ্দিন)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

(মোহাম্মদ দাউদ খাঁন)
পিএইচ. ডি. গবেষক
এবং
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং: ১ এবং
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬